জেগে আছে একজন

শক্তিপদ রাজগুরু

পরিবেশক :
দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর । ১৯৬২

প্রকাশক ঃ
রেখা বিশ্বাস
'মাঙ্গলিক'
উত্তরায়ণ । মধ্যমগ্রাম
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
দীননাথ সেন।

মুদ্রক ঃ
পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা-৯।

বাবা, তোমার জন্যে কখনও কিছু করতে পারিনি। মা, দুঃখে শোকে তোমার জন্যে সন্তান হিসেবে যা করার ছিল, তার কিছুই করা হয়নি। স্বার্থপর, অযোগ্য সন্তান ছিলাম। তোমাদের কাছ থেকে ক্রমাগত পেতে পেতে আমার ধারণা হয়েছিল, পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমার কিছু দেওয়ার নেই। তোমাদের প্রতি দায়িত্বপালন দূরে থাক, তোমাদের ক্ষতি করে দিয়েছিলাম। তোমাদের মধ্যে প্রায় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলাম। এক বাড়িতে বাস করেও তোমাদের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মুখ দেখাদেখি ছিল না। চল্লিশ বছর সুখী দাম্পত্যজীবন কাটানোর পরে, তোমাদের সম্পর্ক এভাবে পাল্টে যেতে আত্মীয়স্বজন অবাক হয়েছিল। তারা পছন্দ করত তোমাদের। শ্রদ্ধা, ভক্তি করত। মা, আপদবিপদে তুমি ছিলে গুষ্টিবর্গের আশ্রয়। আত্মীয়স্বজনের দরকারে-অদরকারে বাবাও তাদের কম সাহায্য করত না।

ষাটোর্ধ্ব সেই দম্পতির সম্পর্ক হঠাৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও ঘটনাটা তখনই জানা যায়নি। চন্দ্রনাথ সেন আর তার স্ত্রী দয়াময়ীর সম্পর্ক যে আগের মত নেই, আত্মীয়কুটুমরা ধীরে ধীরে জেনেছিল। জেনেও তাদের কিছু করার ছিল না। সে সুযোগ দয়াময়ী দেয়নি। আগের মত দয়াময়ী অতিথিবৎসল ছিল। আত্মীয়কুটুম বাড়িতে এলে না খাইয়ে তাদের ছাড়ত না। শুধু স্বামীর কথা উঠলে গম্ভীর হয়ে যেত। তার মুখ দেখে বিষয়টা নিয়ে কেউ এগোত না। চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর সম্পর্ক, বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার কারণ আত্মীয়কুটুমরা তাদের কাছে জানতে চেয়েছিল কিনা, আমি জানি না। মা-বাবার সম্পর্ক যে ঘুলিয়ে গেছে, বাড়িতে থেকেও সেটা বুঝতে তাদের সময় লেগেছিল। ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে যে একজন কারণটা জানত, সে আমি। চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি ছিলাম পঞ্চম, ছেলেদের মধ্যে তৃতীয়, মানে সেজ ছেলে। সংসারে জট পাকানোর ঘটনাটা আমি ছাড়া, জানত চন্দ্রনাথ সেন, আমার বাবা। কারণটা চন্দ্রনাথ কাউকে বলেনি। দয়াময়ীকেও নয়। কেন বলেনি, আমি জানি না। না, ভুল বললাম। দয়াময়ীকে না বলার কারণ আমি জানতাম। আরও জানতাম যে, কারণটা দয়াময়ীরও অজানা নয়। দয়াময়ীর জানায় বড় একটা গলদ ছিল। গলদটা দয়াময়ী জানত না। গলদ যে ধরিয়ে দিতে পারত, সেই চন্দ্রনাথও চুপ করে থাকল। দয়াময়ীর গলদ শোধরাতে গিয়ে আর একজনকে চন্দ্রনাথ বিপদে ফেলতে চায়নি। সেই একজন, তার সন্তান, সে আমি। চন্দ্রনাথ হয়ত জানত, দয়াময়ীর ভুল শোধরানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। দয়াময়ীর সঙ্গে বিয়াল্লিশ বছর সংসার করে এ ধারণা তার কেন হয়েছিল, আমি জানি না। তবে হওয়া যে অসম্ভব ছিল না, এ কথা বলতে পারি। দয়াময়ী যতটা স্নেহপ্রবণ, উদার ছিল, ততটা ছিল জেদি, একরোখা। সহজে নিজের বিশ্বাস থেকে সরে যেত না। ভুল একটা ধারণাকে সত্য ভেবে আঁকড়ে ধরলে

সহজে সেটা ছাড়ত না। চন্দ্রনাথকে নিয়ে তাই ঘটল। চন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন এক অবিশ্বাস মনে গেঁথে গেল, যে কোনও স্বর্গীয় ঝাড়ু দিয়ে তা সাফ করা সম্ভব ছিল না। চন্দ্রনাথ তা চায়-ওনি। বুঝে অথবা না বুঝে, কিছু অনুমান করে, আমাকে আড়াল করতে চেয়েছিল। ঘটনার কারচুপিতে ফেঁসে গিয়ে চন্দ্রনাথ বোবা হয়ে গেল। চন্দ্রনাথের ওপর অকারণ রাগে ফুঁসতে থাকল দয়াময়ী।

বাড়িতে চার ছেলে, তিন পুত্রবধূ, ছোট ছেলে কিশলয়ের জন্য মেয়ে খোঁজা চলছে। মেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনি, আত্মীয়কুটুম আসার কামাই নেই। দয়াময়ীর কাছে তারা আগের মত আদরযত্ন পেলেও কিছু একটা অনুভব করতে থাকল। মানুষটা যে আগের মত নেই, কোথাও একটা গোলমাল ঘটেছে, এ কথাটা মুখেমুখে ছড়াল। ঠিক কী ঘটেছে, কেউ জানল না। তাদের কাছে দয়াময়ী মুখ না খুললেও আভাসে-ইঙ্গিতে যা বোঝাতে চাইত, তা চন্দ্রনাথের পক্ষে সম্মানজনক ছিল না। পরিবারের গায়েও কালি লাগত। চন্দ্রনাথকে ঘা দিয়ে দয়াময়ী কথা বলতে শুরু করলে, মানুষটা অসহায়ের মত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাত। কখনও ফ্যাকাসে হয়ে যেত মুখ। পরিবারের অসম্মানের ছিটে যে নিজের গায়েও লাগছে, আমার বুদ্ধিমতী মা তা খেয়াল করত না। কখনও-সখনও চন্দ্রনাথ রেগে ওঠে দু-চারটে কড়া কথা ব'লে দয়াময়ীকে থামাতে চাইলে উল্টো ফল হত। দয়াময়ীর কথাবার্তা আরও ঝাঁঝাল, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠত। আমি সেখানে থাকলে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতাম। যত নষ্টের গোড়া যে আমি, আমি জানতাম। আর জানত চন্দ্রনাথ সেন। সব জেনেও ছেলের ওপর স্নেহে চন্দ্রনাথ মুখে কুলুপ এঁটেছিল।

আমার ভাইবোনরা ভাবত, দেবু বোসের পাপের সম্পত্তি পেয়ে মায়ের মাথা বিগড়ে গেছে। মা-বাবাতে ঝগড়ার কারণও দেবু বোসের বিষয়-আশয়। দয়াময়ীর মাসতুতো ভাই দেবু বোস, আমাদের দেবুমামা, বছর দেড়েক আগে হঠাৎ মারা যায়। দেবুমামা বিয়ে করেনি। আমাদের সংসার ছিল দেবুমামার ঘরবাড়ি। সপ্তাহে চারদিন আমাদের বাড়িতে আসত, অন্তত চারবেলা খেত, পরিবারের যে কোনও দরকারে ঝাঁপিয়ে পড়ত। উকিল না হলেও সম্পত্তি-আইন গুলে খেয়েছিল। হাইকোর্ট পাড়ায়, আইনজীবী, গণেশচন্দ্র গুহঠাকুরতার অ্যাটর্নি অফিসে চাকরি করত এবং নিয়োগকর্তার প্রায় সমান রোজগার করত। নিন্দুকে বলত, বিধবার সম্পত্তি মেরে দেবু বোস বড়লোক হয়েছে। তখন কলকাতার অ্যাটর্নিদের নামে এরকম কুখ্যাতি রটনা করার রেওয়াজ ছিল। বিস্তর টাকা, ভূসম্পত্তি দেবুমামা বানিয়েছিল এবং কাগজে-কলমে নব্বইভাগ সম্পদ দয়াময়ীর নামে করা ছিল। সহোদর দাদা কানাই বোস, তার বৌ, ভাইপো, ভাইঝিরা থাকতে তাদের বাদ দিয়ে সর্বস্ব দয়াময়ীর নামে দেবুমামা কেন রেখেছিল, এ প্রশ্নের জবাব সকলের জানা ছিল। দয়াময়ী ছাড়া আত্মীয়স্বজনের কাউকে দেবুমামা বিশ্বাস করত না। দেবুমামা কোনও উইল না করে অগাধ সম্পদের জিম্মা দয়াময়ীকে দিয়ে হঠাৎ মারা যেতে আমার ভাইবোনরা বলল, লোকটা সম্পত্তির মায়া কাটাতে না পেরে ভূত হয়ে দয়াময়ীর ঘাড়ে চেপেছে এবং আমাদের সংসারে অশান্তি, মা-বাবাতে গোলমাল, সে-ই ঘটাচ্ছে। বলা হল, লোকটা মরেও আমাদের জ্বালাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের কথা,

মা কানে তুলল না। দেবু বোসের সব সম্পত্তি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার দাদা কানাই বোসের পরিবারকে হস্তান্তর করতে দয়াময়ী আইনি ব্যবস্থা নিল। দয়াময়ীকে সবরকমভাবে চন্দ্রনাথ এবং দুই ছেলে দেবপ্রতিম আর কিশলয় সাহায্য করেছিল। বেহালার পাঁচ কাঠা জমি, দয়াময়ীর নামে রাখা ব্যাঙ্কের দেড় লাখ টাকা উদ্ধার করে মাসতুতো দাদা কানাই বোসের হাতে দয়াময়ী তুলে দিয়েছিল। তারপরেও কানাই বোসকে হস্তান্তর করার মত জমি, টাকা কম থাকল না। দেবু বোসের সম্পত্তি ঘাড় থেকে নামাতে দয়াময়ীর যত তাড়া ছিল, চন্দ্রনাথের ছিল না। দেবপ্রতিম, কিশলয়ও দায়িত্বপালনে কিছুটা ঢিলে দিয়েছিল। নিজের ব্যবসা সামলাতে চন্দ্রনাথ যেমন সারাদিন হিমশিম খেত, দেবপ্রতিম, কিশলয়ের কাজের চাপও কম ছিল না। দেবু বোসের সম্পত্তি উদ্ধারে দয়াময়ীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে রোজ সময় দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। সেখান থেকে শুরু হল খিটিমিটি ঝগড়া, মন কষাকষি। দয়াময়ী সন্দেহ করল দেবু বোসের সম্পত্তি গায়েব করতে দুই ছেলেকে নিয়ে চন্দ্রনাথ মতলব ভাঁজছে। সেটা জেনে অপমানিত চন্দ্রনাথ এমন কিছু কথা বলল, যা শুনে দয়াময়ী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। মা বাবার কাণ্ড দেখে ছেলেমেয়েরা আড়ালে বলল, বুড়ো বয়সে দুজনের ভিমরতি ধরেছে।

কথাটা যে ঠিক নয়, আমি জানতাম। দয়াময়ী তখনও বিগড়োয়নি, তার মাথা স্বাভাবিকভাবে যে কাজ করছিল, আমার চেয়ে ভাল কেউ জানত না। দয়াময়ীকে তখনও ঘিরে ছিল তার স্বামী, ছেলেমেয়ে, তার সুখের সংসার। সেখানে চিড় ধরেনি। দয়াময়ীর পায়ের তলার মাটি আরও কয়েক মাস পরে সরে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে তার সুখের সংসার ভেঙে পড়েছিল। ঘটনাস্রোত থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছিলাম। আমি জানতাম, চন্দ্রনাথ সেনের সংসার ছিন্নভিন্ন হওয়ার আসল কারণ আমি বললে ভাইবোনরা কেউ শুনবে না। শুনলে বিশ্বাস করবে না। পরিস্থিতি আমার হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। আমার কিছু করার ছিল না। সব ঘটনা এভাবে আমার হাতের বাইরে চলে যায়। হাসপাতালে যে অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে 'আজ যাব কাল যাব' করে, যাওয়ার সময় করে উঠতে পারি না, সাতদিন পরে হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারি, চব্বিশ ঘণ্টা আগে পৃথিবী ছেড়ে সে চলে গেছে। তার সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে না। কিছু সময়ের জন্যে আমার মগজ ফাঁকা হয়ে যায়। এরকম ঘটনা আরও আছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যে চন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে একত্রিশ বছর আর দয়াময়ী সেনের সঙ্গে ছত্রিশ বছর কাটালাম, বাবা-মা বলে যাদের ডাকলাম, তাদের মৃত্যুর পরে কিছুতেই তাদের জন্মের সন-তারিখ উদ্ধার করতে পারলাম না। তারা বেঁচে থাকতে একবারের জন্য তারিখ দুটো তাদের কাছে জানতে চাইনি।

ত্রিশ বছর বয়স হওয়ার আগে বৌবাজারের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে চেতলায় ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছিলাম। চুমকি তখন দশ মাসের মেয়ে হলেও প্রথমবার মৃত ছেলে প্রসবের পরে আবার এক ফুটফুটে কন্যাসন্তান নিয়ে নতুন জায়গায় সংসার পাতার সুযোগ পেয়ে আমার বৌ, নবনীতা স্বস্তি পেয়েছিল। বৌবাজারের বাড়িকে আমার হতবুদ্ধি মা তখন 'পাপপুরী' বলতে শুরু করায় আবাস পরিবর্তনে নবনীতা খুশি

হয়েছিল। আমার বড়দাদা অরিন্দম, বছরখানেক আগে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনের কোম্পানি ফ্ল্যাটে সপরিবারে চলে গিয়েছিল। আমি চলে যেতে অর্ধেক বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেলেও মা অখুশি হয়নি। পাপের কবল থেকে আমি বেরিয়ে যেতে পেরেছি, ভেবে বরং খুশি হয়েছিল। আমি খুশি হইনি। অখুশি হওয়ার কারণ আমার অবশ্য ছিল না। গোপন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেতলার ফ্ল্যাটে আমি চলে এসেছিলাম। ফ্ল্যাট কিনতে অর্ধেকের বেশি টাকা যে চন্দ্রনাথ সেন দিয়েছে, কাকপক্ষী জানতে পারেনি।

বাবা চন্দ্রনাথ সেন, মা দয়াময়ী সেন, কেউ আজ পৃথিবীতে নেই। পনের বছর আগে তাদের সুখের সংসার যে কারণে ভেঙে গিয়েছিল আজও কারণটা কেউ জানে না। পনের বছরে কারণটা এত ভোঁতা হয়ে গেছে যে জানার আগ্রহ কারও থাকার কথা নয়। হয়ত নেই-ও। প্রত্যেকটা নতুন দিন, সকাল থেকে সূর্যাস্ত, ফেলে আসা পনের বছর কেন, একশ বছরের চেয়ে বেশি দামি হয়ে উঠেছে। তারপর নতুন একটা দিনের জন্ম দিয়ে পুরনো হয়ে গেছে। পুরনোকে কেউ মনে রাখেনি। তবু পুরনো কথাগুলো আমাকে বলতে হবে। কেউ না শুনলেও বলে যেতে হবে। আমি বক্তা, আমিই শ্রোতা। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' পুরনো হয়ে গেলেও কি আমরা দেখতে যাই না? ছবি দেখতে বসে আমরা কি শুধুই ছবি দেখি? নিজের সঙ্গে তখন কি কথা বলি না? 'ওথেলো' দেখতে বসে আমরা কি গোঁয়ার প্রেমিক ওথেলোর পক্ষে-বিপক্ষে নিঃশব্দে হাজারটা কথা বলি না? ছুরিবিদ্ধ ডেসডিমোনার সঙ্গে যন্ত্রণায় তার মত করে কাঁদি না? কাঁদি। মঞ্চের কান্না শোনা যায়। সে কান্না শোনানোর জন্যে অভিনেতা কাঁদে। কান্নার জন্যে তাকে টাকা দিতে হয়। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে দর্শককে চুপচাপ কাঁদতে হয়। তাকে কাঁদতে দেখলে পাশের বোদ্ধা দর্শক হাসতে পারে। মুখে হাসি নিয়ে অ্যারিস্টটলের নাট্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা সে শোনালেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে, মৃত বাবা-মায়ের সামনে আমাকে, অ্যারিস্টটল নয়, দাঁড় করিয়ে দিল, বিকাশ। আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

দুই

বাবা, আজ দশ বছর পৃথিবী থেকে তুমি চলে গেছ। মা, তুমিও পাঁচ বছর পৃথিবীতে নেই। তোমাদের জীবদ্দশায় সংসারে যে আলোড়ন উঠেছিল, তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। চন্দ্রনাথ সেন-দয়াময়ীর সংসারের যত ভুল বোঝাবুঝি, মান-অভিমান, হাসিকান্না বাতাসে মিলিয়ে গেছে। যা যায়, তা কি পুরোপুরি চলে যায়, চিরতরে যায়? তাহলে, আশ্বিনের এই সোনালি সকালে কেন তোমাদের মনে পড়ছে? বাতাসে তোমাদের উপস্থিতি এত প্রবলভাবে কেন টের পাচ্ছি? সবটা কি মনের ভুল? হতে পারে। আমার এই ভ্রান্তির জন্যে বিকাশ দায়ী। বিকাশকে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। আমার স্কুলের বন্ধু। মিত্র ইনস্টিটিউশনে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। স্কট লেনে থাকত। প্রায়ই আসত আমাদের বাড়িতে। বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে আমাদের

ছাতে ঘুড়ি ওড়াতে এসে, দুপুরে আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে বসে অরন্ধনের পান্তাভাত, ডালচচ্চড়ি, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুশাকের তরকারি, ইলিশ মাছের ঝাল খেয়ে বারবার হাতের আঙুল চাটত আর বলত, কী ভাল যে লাগল! হ্যাঁ, সেই বিকাশ। বিকাশের বাবাকে চন্দ্রনাথ সেন চিনত। কোলে মার্কেটে বাজার করতে গিয়ে দুজনের কখনও-সখনও দেখা হত। বিকাশের পাল্লায় পড়ে আজ মহালয়ায়, পিতৃপক্ষের সকালে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলাম। বিকাশ গিয়েছিল তর্পণ করতে, আমি দেখতে গিয়েছিলাম। স্কট লেন ছেড়ে বিকাশ এখন প্রতাপাদিত্য রোডে থাকে। সত্যিকার সফল ব্যবসায়ী সে। ত্রিশ বছর পরেও আমাদের বন্ধুত্ব বজায় আছে। প্রতি বছর মহালয়ার সকালে বিকাশ তর্পণ করতে যায় শুনে, মাস দুই-তিন আগে কোনও এক বিকেলে তার সঙ্গে আমিও যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলাম। পিতৃপক্ষের নির্দিষ্ট সকালে, সাড়ে সাতটার কিছু আগে ফ্ল্যাটের কলিংবেল বাজতে বন্ধ দরজা খুলে সামনে বিকাশকে দেখে সামান্য থতমত খেয়ে কী বলব যখন ভাবছি, একগাল হেসে বিকাশ বলল, তোমায় নিতে এলাম, চল।

বিকাশকে এড়াতে পারলাম না। চাইলামও না এড়াতে। পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে বিকাশের সঙ্গে তার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। চেনা গাড়ি, চেনা ড্রাইভার, নাম বাদল। বাদল গাড়িতে স্টার্ট দিতে গাড়ির জানলা থেকে মুখ বার করে দেখলাম, ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে নবনীতা, চুমকি। আমি এবং আমার দেখাদেখি, বিকাশ হাত নাড়ল। আগেই বলেছি, নবনীতা আমার সহধর্মিনী, আর মেয়ে, চুমকি। তার বয়স এগারো। দশ মিনিটের মধ্যে আমরা আউট্রাম ঘাটে পৌঁছে গেলাম। ঘাটে ভিড়। পা ফেলার জায়গা নেই। ঘাটের কাছাকাছি গঙ্গার গলা জল, বুক জল, কোমর জল পর্যন্ত থিকথিক করছে মানুষ। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে অনেকে পিতৃতর্পণ করছে। সকলে পুরুষ। দু-চারজন বৌ, মেয়ে যারা এসেছে, তাদের তর্পণের অধিকার নেই। তাদের কয়েকজন ঘাটে, কিছু গঙ্গার ধারে গাছের ছায়ায় বসে তর্পণকারী পুরুষদের ছেড়ে রাখা জামাকাপড়, থলি, ব্যাগ পাহারা দিচ্ছে। তর্পণ করতে যারা জলে নেমেছে, তাদের বেশিরভাগের বয়স চল্লিশের বেশি। কমবয়সীও কিছু আছে। তর্পণের পাশাপাশি তারা ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করছে। গঙ্গায় তর্পণকারীর ভিড় দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত মানুষ বছরে একদিন, এত তন্ময় হয়ে পিতৃপুরুষকে স্মরণ করে, আমি জানতাম না।

ফোর্ট উইলিয়ামের গা ঘেঁষে গাড়ি রেখে, নতুন ধুতি পরে, কাঁধে নতুন গামছাটা রেখে, মৃত পূর্বপুরুষদের ফুল, ফল, ভুজ্জি দিতে বিকাশ গঙ্গার দিকে এগোল। বিকাশের পাশে আমি। বিকাশের গাড়িচালক বাদল, চাবি দিয়ে গাড়ি বন্ধ করে ফুল, ধানদূর্বা, বেলপাতা সাজানো পেতলের একটা থালা নিয়ে বিকাশের পাশাপাশি এগোচ্ছে। সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত গিয়ে সে দাঁড়াতে বিকাশ জলে নামল। থালা থেকে মুঠো মুঠো অর্ঘ্য তুলে দু'হাতে নিয়ে চোখ বুজে পিতৃপুরুষকে নিবেদন করার সময়ে 'ওঁ পিতা নোহসি' এরকম একটা শ্লোক বিড়বিড় করে সে বলছিল। বাদলের দু'ধাপ পেছনে দাঁড়িয়ে আমি বিকাশের পিতৃতর্পণ দেখছিলাম। বাবার পরে মাকে স্মরণ করে সে অঞ্জলি দিল।

গঙ্গায় ভরা জোয়ার। বাতাসে জলের গুঁড়ো এসে লাগছিল আমার মুখে। গঙ্গার ঘোলা জল থেকে উঠে আসা মাটির গন্ধ পাচ্ছিলাম। অবাক হচ্ছিলাম বিকাশকে দেখে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত, টাকা কামানো ছাড়া যার কোনও চিন্তা নেই, সে-ও যে এত নিষ্ঠার সঙ্গে তর্পণ করতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। বিকাশের মা-বাবাকে আমি চিনতাম। মাসিমা, মেসোমশাই বলতাম। নিরীহ, ভালমানুষ ছিলেন তাঁরা। বিকাশের বাবা মারা গেছেন দশ বছর, মা পাঁচ বছর। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ফি বছর পিতৃপক্ষে তর্পণ করতে বিকাশ গঙ্গায় আসছে। ছাত্রজীবনে যে বিকাশ নিজেকে গোঁড়া নাস্তিক পরিচয় দিত, সে কবে থেকে শাস্ত্রীয় আচার মানতে শুরু করল, আমি জানি না। আজ নিয়ে একটানা ছ বছর সে তর্পণ করছে।

পেতলের থালা বোঝাই ফুল, বেলপাতার অর্ঘ খালি করে বিকাশ সিঁড়ি ছেড়ে গলা জলে নেমে যেতে আমি রাস্তায় উঠে এলাম। পেতলের খালি থালা হাতে নিয়ে বাদলও এল আমার সঙ্গে। ঘাট থেকে গাড়িতে চলে গেল সে। দু'হাত জুড়ে কপালে রেখে, চোখ বুজে গঙ্গায় গলা ডুবিয়ে বিকাশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। আমি নাস্তিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আত্মা অথবা পরলোকে আমার আস্থা নেই। আমি কেন এখানে এলাম? দু'হাতের আঁজলা ভরে জল তুলে, চোখ বুজে মন্ত্র উচ্চারণ করে পরম শ্রদ্ধায় বিকাশ সেই জল গঙ্গার স্রোতে মিশিয়ে দিচ্ছে। ঘেঁষাঘেঁষি কয়েকশো মানুষ দাঁড়িয়ে একই ভঙ্গিতে তর্পণ করছে। জল দিচ্ছে পিতৃপুরুষকে। তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছে। গঙ্গার পাড়ে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎছল আওয়াজ শুনতে পেলাম। পুব দিক থেকে ভেসে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। নীল আকাশে ধবধবে সাদা তুলোর মত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ উড়ে যাচ্ছে। আকাশের অনেক উঁচুতে বাঁকা, কালো রেখার মত আটকে রয়েছে কয়েকটা চিল। গঙ্গার উল্টো দিকে আরও সবুজ গাছপালার আড়ালে তিন-চারটে লম্বা চিমনি, গুদোম ঘরের ঢেউ খেলানো চাল, ভাঙাভাঙা ভাবে আমি দেখতে পেলাম। গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্ছে ফুল, বেলপাতা, পুজোর নানা উপাচার। মৃত মানুষকে পাঠানো জীবন্ত মানুষের ভেট। কমবয়সী কয়েকটা ছেলে সাঁতার কেটে গঙ্গার অনেকটা ভেতর থেকে ভেসে যাওয়া ডাব তুলে আনছে। মৃতরা বারণ করছে না। তর্পণকারীরা তাকাচ্ছে না। আকাশের ধার ছেড়ে সূর্য কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে। সকালের নরম রোদ পড়েছে গঙ্গার জলে। ঘাটে ভিড় বেড়েছে। তর্পণে মগ্ন মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি নিজের ভেতরে ছলাৎছল আওয়াজ শুনতে পেলাম। সামান্য চমকে গিয়ে কান পেতে আওয়াজটা আবার শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনলাম না। গঙ্গার জলে ছলাৎছল শব্দ হচ্ছে। আমার বুকের ভেতরে কোনো আওয়াজ ভাঙছে না। ভুল শুনেছিলাম।

বাবা, সেই মুহূর্তে তোমাকে মনে পড়ল। মা, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল তোমার মুখ। চন্দ্রনাথ সেনের নাস্তিক সন্তান চন্দন সেনেব মনে অচেনা অপরাধবোধ ঘনিয়ে উঠল। আমি দিশেহারা হয়ে গেল্াম। দশ বছর আগে, চন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি একবারও পিতৃতর্পণ করতে আসিনি। 'পিতৃতর্পণ' কথাটার সঙ্গে পরিচয় থাকলেও তর্পণ করার কথা কখনও ভাবিনি। মা, দয়াময়ী সেন মারা

গেছে পাঁচ বছর আগে। মাকে তর্পণ করার চিন্তাও কখনও করিনি। শুধু আমি কেন, আমার দুই দাদা, এক ভাই, কেউ কখনও পিতৃপক্ষে গঙ্গায় এসে তর্পণ করেছে, আমি শুনিনি। আমি নাস্তিক হলেও আমার ভাইদের বিরুদ্ধে এ অপবাদ নেই। তারা অল্পবিস্তর ধর্মভীরু। তিনজনের সংসারে দেবদেবীর প্রতিমা, নিদেনপক্ষে ফ্রেমে বাঁধানো কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রীর ছবি আছে। গঙ্গাজলের শিশি আর পঞ্জিকা আছে। তাদের গৃহিণীরা মাঝে মাঝে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেয়। নবনীতাকে যেতে বলে। সুযোগ থাকলে চুমকিকে নিয়ে নবনীতা যায়। আমার সংসারে এ সবের বালাই নেই। থাকলেও আমি জানি না। চন্দ্রনাথ সেন মারা যেতে অর্ধেক অশৌচ পালন করেছিলাম। নিরামিষ খেলেও হবিষ্যি করিনি। মাথা কামানোর প্রশ্ন ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পরে আরও সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছিলাম অশৌচপর্ব। আমাকে দেখে আত্মীয়স্বজন বুঝতে পারেনি, আমার অশৌচ চলছে। আমার সম্পর্কে আড়ালে তারা যেসব কথা বলেছিল, তার কিছু কানে এলেও আমি মাথা ঘামাইনি। তের বছর আগে, নিজের সপিণ্ডীকরণ সেরে বৌবাজারের বাড়ি থেকে চেতলার ফ্ল্যাটে পালিয়ে এসেছিলাম, এ কথা আমি বলব কাকে? কেনই বা বলব? যাদের বলা যেত, তারা, চন্দ্রনাথ আর দয়াময়ী সেন পৃথিবীতে নেই। তারা জানত, আমার শোক, আমার স্মরণের ছাঁদ আলাদা। আমার পাপও তাই, তার আদলও অন্য, আমারই মাপসই, তা জানত শুধু চন্দ্রনাথ সেন।

প্রথমে বাবা, তারপর মা চলে যেতে দু'দফায় পৃথিবীর মাত্র একুশ বর্গফুট জমি খালি হলেও আমার বুকের ভেতরটা ভীষণ ফাঁকা হয়ে গেল। পিতৃমাতৃহীন হওয়ার কষ্টটা এখনও অনুভব করি। সেই শোক নিয়ে কী করব, ভেবে পাই না। আমার শোকের ভেতরে যে আরও একটা গোপন শোকের হুল ফোটানো যন্ত্রণা রয়েছে, যা শুধু চন্দ্রনাথ সেন জানত, আর চন্দ্রনাথের সঙ্গে দয়াময়ী কিছুটা জানত এবং পৃথিবী ছেড়ে তারা চলে যেতে এখন আমি ছাড়া কেউ জানে না, সেই শোক কোথায় রাখব? তিনজনের যন্ত্রণা কতদিন আমি একা বইব? কেন বইব? পিতৃপুরুষের সঙ্গে শোক, তাপ, যন্ত্রণা—সব কিছু ভুলে যেতে চাই। তা কি সম্ভব? জানি না। বোধহয় ঠিক বলা হল না। মানুষ সব ভুলে যায়। সময় ভুলিয়ে দেয়। তরল বিস্মৃতির নাম সময়। ভুলে না গেলে, মাসে মাত্র একটা করে, বছরে দুদিন বাবা-মায়ের মৃত্যুর দুটো তারিখ, এগারই এপ্রিল, আর পাঁচিশে অক্টোবর — নিঃশব্দে চলে যাওয়ার পরে কেন খেয়াল হয়, দিনদুটোতে বাবা-মাকে একবার স্মরণ করা হয়নি? তারিখ দুটো কীভাবে ভুলে থাকি? নাস্তিকতা মানে মা-বাবাকে ভুলে যাওয়া নয়। মানুষ হিসেবে আমার কিছু ঘাটতি আছে। নাস্তিকতার আবরণে তাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা, আমার নিজের কাছে সকলের আগে ধরা পড়ে যায়। সেটাই স্বাভাবিক। এত বিশদ আত্মসমীক্ষার পরে, বছর ঘুরলে আবার সেই ভুল করি। বছরের দুটো তারিখে বাবা-মায়ের ছবিতে দুটো মালা দিতে খেয়াল থাকে না। ক্ষমাহীন গ্লানিতে মন ধূসর হয়ে থাকে। নিজেকে দেওয়ার মত শাস্তি খুঁজে পাই না।

আমার ধর্মভীরু ভাইরাও বাবা-মাকে মনে রাখেনি। মা-বাবার মৃত্যুর তারিখ দুটো তাদের স্মৃতিকেও পাশ কাটিয়ে চলে যায়। মেজদি, বিপাশা ছাড়া মা-বাবাকে নিয়ম

করে কেউ স্মরণ করে না। বছরে দুটো দিন মা-বাবার ছবিতে মেজদি মালা দেয়। থালায় সন্দেশ, গ্লাসে জল, তাদের ছবির সামনে রাখে। এই মেজদি, বিপাশার সঙ্গে পাঁচ বছর আমাদের পরিবারের কোনও সম্পর্ক ছিল না। পছন্দের প্রেমিকের সঙ্গে একুশ বছর বয়সে বিপাশা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। বিপাশা তখন বি এ ক্লাসের ছাত্রী। বেজাতের প্রেমিকের সঙ্গে উধাও হতে দয়াময়ীর অভিমানে ঘা লেগেছিল। বিপাশা নামে যে একজন মেয়ে ছিল, এ কথাও দয়াময়ী ভুলে যায়। নতুন পরিচিতদের কাছে দয়াময়ী তখন নিজেকে চার ছেলে এক মেয়ে, মোট পাঁচ সন্তানের মা হিসেবে পরিচয় দিত। পারিবারিক এই খবর দেওয়ার সময়ে দয়াময়ীর গলা সামান্য কাঁপত না। কপালে একটা রেখা জাগত না। দয়াময়ীর কাছে তখন আমি থাকলে আমার বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করত। বিপাশা নামে গৃহত্যাগিনী দিদির নামটা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ার ভয়ে ঠোঁট টিপে পাথরের মত বসে থাকতাম। স্কুল শেষ করে কলেজে ঢুকে তখন আমি খানিকটা লায়েক হয়েছি। লুকিয়ে সিগারেট টানি। সহপাঠিনীদের সঙ্গে আমি নিজে মাখামাখি না করলেও বিপাশার গোপন প্রণয়ে আমার সমর্থন ছিল। তাদের চিঠি চালাচালিতে আমি কয়েকবার সাহায্য করেছিলাম। প্রেমিকের যে চিঠি পাওয়ার পরের দিন দুপুরে কাউকে না জানিয়ে, বিপাশা প্রায় এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই চিঠির বাহক ছিলাম আমি। বিপাশার প্রেমিক, লোকনাথের চিঠিটা মেজদির হাতে আমিই তুলে দিয়েছিলাম। বাড়ির কেউ সে ঘটনা কখনও জানতে পারেনি। সবচেয়ে বড় কথা, দয়াময়ীর কাছে চিরকাল খবরটা গোপন ছিল। মা, বাবা, ভাইবোনের সঙ্গে যে মেয়েটা একুশ বছর ধরে জল-হাওয়ার মত মিশে ছিল, সে বাড়ি থেকে হঠাৎ উবে যাওয়ার পরেও সংসারে বড় কোনও ঢেউ উঠল না। দয়াময়ীর শান্ত, গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে, যার যা বলার ছিল, গিলে নিল। কথা সরল না কারও মুখে। বিপাশা নামে সংসারে কেউ ছিল, ভুলে গেল। আমি ভুলতে পারলাম না। গোপনে মেজদির খবর রাখতাম। ঠিকানা খুঁজে এক দুপুরে মেজদির সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে দেখে আনন্দে মেজদি আত্মহারা হয়ে গেল। বাড়ির সকলের খবর নিল। তার কথা যেন ফুরোচ্ছিল না। এক কামরার বাড়ি। লাগোয়া রান্নাঘর, কলঘর। বাড়িতে তখন লোকনাথ ছিল না। মেজদির সংসার, যতটা সম্ভব আমি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম। ভরদুপুরে ঘরে বসিয়ে মেজদি রসগোল্লা খাইয়েছিল আমাকে। লোকনাথই নাকি সকালে রসগোল্লা কিনে এনেছিল। বিকেলের আগে মেজদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে, সদর দরজা ছেড়ে দু'পা এগোতে চন্দ্রনাথ সেনের মুখোমুখি হলাম। খোলা ছাতা মাথার ওপর ধরে বিপাশার বাড়িতেই চন্দ্রনাথ আসছিল। আমাকে সামনে দেখে চমকে উঠেছিল। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, বিপাশার কাছে গিয়েছিলি?

হ্যাঁ।

বাবার মুখে প্রথমে প্রসন্নতা, তারপর সামান্য বিষাদ ছড়িয়ে গেল। বলল, আমিও যাচ্ছি।

এক সেকেন্ড থেমে ছাতার নিচে আমাকে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল,

আমার এখানে আসাটা কেউ যেন না জানে!

বাবা কী বলতে চায়, বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। বাবার ছাতার ছায়া, ঘরপালানো মেয়ের সংসার পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে জেনে স্বস্তি পেয়েছিলাম। লোকনাথের যে চিঠি পেয়ে বিপাশা বাড়ি ছেড়েছিল, সে চিঠিটা বয়ে আনার জন্য একটা চাপা অপরাধবোধ প্রায়ই আমার মাথায় জেগে উঠত। দয়াময়ীর মুখের দিকে তাকাতে কষ্ট হত। লোকনাথের চিঠিটা এনে মেজদিকে দেওয়া ঠিক হয়নি। অন্যায় করেছি। বিপাশার বাড়ির দরজায় বাবাকে দেখে আমার মনের ভার অনেক হালকা হয়েছিল। বাবার এই স্নেহময় মুখ ছ মাস পরে আরও একবার দেখলাম। দুপুর বারোটা নাগাদ বৌবাজারের রাস্তায় আমাকে দাঁড় করিয়ে, আমার হাতে বাবা একটা খাম দিল। খামের মুখটা আটকানো। খামের ওপরে লেখা লোকনাথ মল্লিক। আমাকে কলেজে যাওয়ার পথে ধরার জন্যে চন্দ্রনাথ সেন ভরদুপুরে, হিসেব করে যে এখানে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরে অবাক হলাম। আরও অবাক হলাম লোকনাথ মল্লিক লেখা খাম দেখে। খোলা ছাতার তলায় আমাকে ডেকে নিয়ে, কলকাতার একটা হাসপাতালের নাম করে বাবা বলল, আজ সকালে ওখানে বিপাশার একটা মেয়ে হয়েছে। সাড়ে বারোটায় হাসপাতালের গেটে লোকনাথকে এই খামটা পৌঁছে দিবি। ভেতরে এক হাজার টাকা আছে। সাবধান, পকেট থেকে পড়ে না যায়!

খামটা যত্ন করে আমি পকেটে রাখতে বাবা বলেছিল, উল্টোডাঙার গোলায় কাঠের একটা চালান এসে পৌঁছেছে। এখনই যেতে হবে আমাকে। টাকাটা তাই তোর হাতে পাঠালাম, লোকনাথকে বলিস, আমি বিকেলে যাব।

আমি ঘাড় নাড়লাম। ছ মাস আগে এক বিকেলে বিপাশার বাড়ির দরজার কাছে চন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আমার যে ধারণা হয়েছিল, ছ মাস পরে তা মিলে যেতে খুশি হলাম। হঠকারির মত একটা চিঠি বয়ে এনে বিপাশাকে সাময়িকভাবে আমি বিপথগামী করে দিলেও চন্দ্রনাথের ছাতার ছায়ায় সে পথ সুগম হয়ে উঠছে। বিপাশাকে কোনও বিপদ ছুঁতে পারবে না। আমার খুশি হওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। আমি অনুভব করছিলাম বাবার খুব কাছে আমি পৌঁছে গেছি। আমার ওপর বাবার আস্থা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। বাবার সঙ্গে আমি বন্ধুর মত কথা বলতে পারি। আরও পাঁচ বছর পরে, বিপাশার মেয়ে স্বাতীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ত্যাজ্য মেয়ে, বিপাশাকে নিঃশর্তে ক্ষমা করে, পাঁচ বছরের নাতনি স্বাতীকে দয়াময়ী বুকে টেনে নিয়েছিল। তারপর বাকি জীবনটা বিপাশার বাড়ি হয়ে উঠেছিল দয়াময়ীর দ্বিতীয় সংসার। সময়ে, অসময়ে বিপাশার কাছে দয়াময়ী চলে যেত। কখনও সঙ্গে করে নিয়ে যেত মা অঘোরবালাকে। আমার দিদিমা অঘোরবালা তখন আশির মাঝামাঝি। দয়াময়ীর স্নেহ বড় মেয়ে বীথিকাও কম পায়নি। অল্প বয়সে বীথিকার বিয়ে দেওয়ার জন্যে দয়াময়ীর মনে বোধহয় চাপা দুঃখ ছিল। চোদ্দ বছরের উচ্ছল বীথিকা বিয়ের পরে কিছুটা জবুথবু হয়ে যায়। সংসারে সুখের অভাব ছিল না। তিন পুরুষ ধরে চিকিৎসক পরিবারে বীথিকার স্বামী অরূপও ছিল এম বি বি এস পাশ করা ডাক্তার। রোগী, টাকা, কোনওটার অভাব তার ছিল না। বীথিকা তবু বালিকা

থেকে গেল। দয়াময়ীর ধারণা হয়েছিল, কচি বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিলে, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তারা আর বাড়ে না। বয়স বাড়লেও বুদ্ধিতে তারা খাটো থেকে যায়। যে বয়সে বিয়ে হয়, আজীবন সেখানে থেকে যায়। দু'ছেলের মা বীথিকাকে কাছে বসিয়ে দয়াময়ী 'হাবলি' বলে ডাকত। হাবলি মানে, সরল, আলাভোলা মেয়ে। বিপাশার ওপর দয়াময়ীর টান ছিল অন্যরকম। বিপদের সময়ে সেরা বুদ্ধি যে বিপাশা ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না, ছোট মেয়ে সম্পর্কে এই বিশ্বাস দয়াময়ীর ছিল। বছরে এক সপ্তাহ ব্যারাকপুরে বড় মেয়ে বীথিকার বাড়িতে কাটালে বিপাশার বাড়িতে থাকত একমাস। বিপাশার ওপর একইরকম নির্ভরতা ছিল চন্দ্রনাথের। বাবা-মায়ের মৃত্যুদিনে, তাদের ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া, মিষ্টি আর জল নিবেদন করা, তাই বিপাশাকেই মানায়। বিপাশার মত করে কে মনে রাখবে দয়াময়ী, চন্দ্রনাথকে? মা-বাবাকে ভালবাসার সে জোর অন্য ছেলেমেয়েদের আছে কিনা, জানি না। আমার নেই। তাদের দাম্পত্যজীবনে আমি দূষণ ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। দূষণ দূর করার ক্ষমতা আমার ছিল না।

তিন

তর্পণ শেষ করে জল থেকে যত মানুষ উঠে আসছে, সিঁড়ি দিয়ে গঙ্গায় নামছে তার বেশি। ভিড় বাড়লেও ঠেলাঠেলি, হইচই নেই। বাতাসে গাম্ভীর্য থমথম করছে। মন্ত্রের টুকরো শুনতে পেলাম, 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।' মুখভর্তি সাদা দাড়িগোঁফ, তর্পণকারীর বয়স সত্তর-পঁচাত্তর। গমগমে গলা। তার পাশে মা-বাবার স্মৃতিতে আপ্লুত বিকাশ গঙ্গার জলে গলা ডুবিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা আর মায়ের মৃত্যুদিন বিকাশ মনে রেখেছে। পিতৃপক্ষে দুজনের তর্পণ করছে। কথাটা বলায় ভুল হল। তর্পণ অনুষ্ঠানকে পারিবারক গণ্ডীর মধ্যে আটকে না রাখতে কিছুদিন আগে বিকাশ অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছিল। আমার বাড়িতে বসে এক ছুটির সন্ধেতে বিকাশের কোনও কথার মাঝখানে নবনীতা জিজ্ঞেস করেছিল, গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া ফল, ফুল, নানা উপাচার, কোন রাস্তা দিয়ে মৃত পূর্বপুরুষের কাছে পৌঁছয়?

গম্ভীর মুখে প্রশ্নটা করলেও নবনীতার গলায় কৌতুক ছিল। বিকাশ বুঝেছিল। সে মজা করতে জানে। বলেছিল, রাস্তাটা জানলে ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে পর্যটক নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করে লাল হয়ে যেতাম।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বিকাশ বলেছিল, মন্ত্রপাঠ, ফুল, বেলপাতা, ভুজ্জি, উৎসর্গ, এ সব করতে হয়, করি। ভেতরের মানে নিয়ে মাথা ঘামাই না। বছরে একদিন গঙ্গায় স্নান করে, সাঁতার কেটে মজা পাই। সেই সঙ্গে পিতৃপক্ষ উপলক্ষ করে বাবা-মাকে বছরে একবার স্মরণ করা হয়। সেটাও কম নয়। তারপর সারা বছর তাদের ভুলে থাকলেও একবার যে স্মরণ করেছিলাম, এ কথাটা বলতে পারি।

কাকে বলবেন?

নবনীতা প্রশ্ন করতে একটু ভেবে বিকাশ বলেছিল, নিজেকে।

বিকাশের কথার ভঙ্গিতে আমার মনে হয়েছিল, সে বানিয়ে বলছে না। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে চুমকি নেই দেখে বিকাশ ফের বলেছিল, আরও একটা কথা ভেবে বছরে একবার গঙ্গায় যাই। আমাকে পিতৃতর্পণ করতে দেখে আমার ছেলে আর মেয়েও আমি যখন থাকব না, তখন হয়ত বছরে একবার হলেও আমাকে স্মরণ করবে।

লাভ কী?

আমার প্রশ্নে সামান্য বিব্রত হয়ে বিকাশ বলেছিল, লাভ-লোকসানের হিসেব করে তো সব কাজ আমরা করি না। বেঁচে থাকার দিনগুলোতে ভাবতে ভাল লাগে যে, আমি মারা যাওয়ার পরেও আমাকে কয়েকজন মনে রাখবে, স্মরণ করবে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিকাশ বলেছিল, আমরা না চাইলেও, যখন আমরা থাকব না, ছেলেমেয়েরা আমাদের কথা ভাববে। কখনও-সখনও আমাদের কথা তাদের মনে পড়বে। গঙ্গায় তর্পণ করতে না গেলেও পড়বে।

শেষ কথাটার লক্ষ্য যে আমি, বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। বিকাশ এক সময়ে আমার চেয়ে বেশি নাস্তিক ছিল। পাঁচজনকে উঁচু গলায় কথাটা জানাত। সাদামাঠা চাকরিতে খুশি থাকতে না পেরে ব্যবসা শুরু করেছিল। ভাগ্য ভাল ছিল তার। প্রথম ব্যবসাতে দাঁড়িয়ে গেল। দশ বছরে এমন ফুলেফেঁপে উঠল যে, বন্ধুরাও কেউ কেউ সেটা পছন্দ করল না। সফল মানুষ এসব নিয়ে ভাবে না। বিকাশও ভাবেনি। সে সময় তার ছিল না। পেটরোগা বাঙালির জন্যে দেশি গাছগাছড়া থেকে লোহা হজম করার মত ওষুধ তৈরি করেছিল সে। একরকম নয়, দু'রকম, সালসা আর বড়ি। দুটোই দেশের ক্রেতাদের সমাদর পেল। বিদেশে পাঠাতে সাহেবরা যে ভাষায় প্রশংসা করল, তার তুলনা নেই। প্রশংসার তোড়ে ওষুধ দুটো রপ্তানির দরজা খুলে গেল। ভোজবাজি ঘটে গেল বিকাশের জীবনে। তবু সে আগের মত ধীর, শান্ত থাকল। শুধু নিজেকে নাস্তিক বলা ছেড়ে দিল। আস্তিকও বলত না। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা বন্ধ করে দিল। তার দু'হাতের আঙুলে রত্ন লাগানো আংটির সংখ্যা বাড়তে থাকল। হীরে, মুক্তো, গোমেদ, পোখরাজ লাগানো চারটে আংটি এই মুহূর্তে তার দু'হাতে আছে। আংটির সংখ্যা বেড়ে গিয়ে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমার চোখের সামনে বিকাশ বদলে যেতে থাকল এবং সেই বদলের যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে থাকল। সহজ, সরল ভানহীন তার ব্যাখ্যা শুনতে আমার খারাপ লাগত না। সব যে অবিশ্বাস করতাম, এমন নয়। বিকাশের ব্যাখ্যা নবনীতা অনেকটা বিশ্বাস করত। তর্পণ প্রসঙ্গে সেই সন্ধেতে বিকাশ যখন বলল, পিতৃপক্ষে গঙ্গায় গিয়ে তর্পণ করলে মনটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়, নিজেকে খুব হালকা লাগে, রাতে দারুণ ঘুম হয়, নবনীতা তখন আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমিও তো যেতে পার।

নবনীতার কথায় কান না দিয়ে বিকাশ ফের বলেছিল, সবটা হয়ত সংস্কার, তবু বেশ লাগে।

মৃত পূর্বপুরুষের ঠিকানা জানতে গিয়ে, হালকাভাবে নবনীতা, যে প্রসঙ্গ পেড়েছিল, ক্রমশ তার ওজন; রঙ বদলে যাচ্ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বিকাশ বলল, তুমি তো জানো, আমার বাবাকে নিমতলা শ্মশানে, মাকে ক্যাওড়াতলায় দাহ করা হয়।

তাদের নাভি, ছাই গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জলে, মাটিতে সে সব মিশে গেছে। কোথাও তার চিহ্ন নেই। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় আছে, কিছু রয়ে গেছে।

ক্লাইভ স্ট্রিটের পোড়খাওয়া ব্যবসায়ী বিকাশের কানে নিজের কথাগুলো সামান্য বেখাপ্পা ঠেকতে সে পদার্থবিজ্ঞানে চলে গেল। বলল, পদার্থবিজ্ঞানও তো বস্তুকে সনাতন আর অমর বলেছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, বস্তুর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শুধু তার চেহারা বদলায়।

আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ঠিক কিনা?

প্রশ্নের জবাব সে-ই দিয়েছিল। বলেছিল, বস্তু আদি আর অক্ষয় হলে আমার বাবা-মাও তাই। তারা মাটি, জলের চেহারা নিয়েছে। গলা পর্যন্ত গঙ্গায় ডুব দিয়ে আমি যদি তাদের স্পর্শ পাই, তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে?

তার প্রশ্নে সায় দিয়ে নবনীতা বলেছিল, সে তো বটেই।

আমি সাড়া করিনি। বিকাশের প্রশ্নটা খারিজ করার ক্ষমতাও আমার ছিল না। জল, মাটি ছুঁয়ে কেউ যদি বাপ-ঠাকুর্দার স্পর্শ পায়, আমি কেন আপত্তি করব?

বিকাশের কথা তখনও ফুরোয়নি। সে বলেছিল, জল, মাটি ছুঁয়ে আমি শুধু আমার বাবা, মা, পূর্বপুরুষের ছোঁয়া নয়, হাজার হাজার বছর ধরে মাটি, জল, আলো, বাতাসে যারা মিশে গেছে তাদেরও স্পর্শ করি। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে, বস্তু হিসেবে যদি আমার বাবা, মা, পূর্বপুরুষ অক্ষয় হয়, তাহলে সকলের জন্যে এই নিয়ম খাটবে। শুধু মানুষ কেন, জীব আর জড়পৃথিবীর কিছুই বিনাশ হয় না।

হজমের ওষুধ ব্যবসায়ী বিকাশ একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, আমাদের বাড়ির যিনি পুরোহিত, ভাল সংস্কৃত জানেন। তর্পণের শুরুতে নান্দীমুখের যে মন্ত্র, তার ব্যাখ্যা তিনি শুনিয়েছেন আমাকে। মন্ত্র উচ্চারণ করে, পিতৃপুরুষের সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, পশুপাখি, পাছপালা, সমুদ্র, পাহাড়, আকাশ, মাটি, জীব, জড়, জীবিত, মৃত, বস্তু, অবস্তু সবাইকে অর্ঘ্যের ভাগ গ্রহণ করতে তর্পণকারী অনুরোধ জানায়। শুধু তর্পণকারীর পরিবারের কল্যাণের জন্যে পিতৃপক্ষে তর্পণ করা হয় না। কোনও তর্পণকারী তা করে না। সে সুযোগ তার নেই। শাস্ত্র দেয়নি।

আরো কিছু কথা বিকাশ বলেছিল। বিকাশের কথা শুনে নবনীতা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। আমি কী বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। তারপর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। তর্পণ নিয়ে বিকাশের ব্যাখ্যা সেই মুহূর্তে মনে দাগ কাটলেও আবছা হয়ে যেতে সময় লাগেনি। চন্দ্রনাথ আর দয়াময়ী কিন্তু আমার মগজ ছেড়ে নড়েনি। আগের চেয়ে সজীব হয়েছে। পিতৃপক্ষের সকালে বিকাশের ডাক পেয়ে বাড়ি থেকে তখনই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

জলে টইটম্বুর গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আমার দু'চোখ হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেল। জীবনে আমি কাঁদিনি, তবু আমার কান্না পেল। টের পেলাম, চোখের পাতা জলে ভিজে উঠেছে। ঘাট থেকে সামান্য দূরে, ইংরেজ আমলে তৈরি ছাতার মত ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলাম। রোদ, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে গঙ্গার ধারে তখন এরকম অনেক ঘর বানানো হয়েছিল। দু-একটা আজও থেকে গেছে। গোলাকার ফাঁকা ঘর। সিমেন্টের মেঝে। অপরিচ্ছন্ন বলা যায়না। গোল ঘরে ঢুকে, মেঝের সঙ্গে আটকানো সিমেন্টের বেঞ্চে

বসলাম। মাঝগঙ্গা দিয়ে একটা পালতোলা নৌকো বাগবাজারের দিকে চলেছে। হাওয়ায় ফুলে ওঠা আধময়লা সাদা পালটা, সকালের আলো লেগে ঝকঝক করছে। গঙ্গার ধার জুড়ে সবুজ বনবাদাড়। কাছে একটা ঝোপের ভেতরে কী এক পোকা একনাগাড়ে ডেকে চলেছে। আগে শুনিনি এ ডাক। গঙ্গার জল থেকে উঠে আসছে ফিসফিস ধ্বনি। অনেক মানুষ যেন কথা বলছে। আমার মনে হল, টিপু সুলতানের শিরস্ত্রাণের মত গঠন, এই ঘরটার ভেতরে বহুকাল আমি বসে আছি। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বিকাশকে দেখতে পেলাম না। স্নানার্থীর ভিড়ে আলাদা করে কাউকে চেনার উপায় নেই। গাড়িতে আসার সময়ে তর্পণ সম্পর্কে বিকাশ যা বলেছে, তা শুনে মনে হয়েছে, তার তর্পণ পুরো শেষ হতে সময় লাগবে। স্নানের পরে পুজো, তারপর হোম, দানধ্যান, পাঁচ-ছটা পর্যায় রয়েছে। সবটা মিলে পিতৃতর্পণ। তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার কথা নয়। পুরো তর্পণ সকলে করে না। স্নান করে, পিতৃপুরুষকে আঁজলা ভরে জল দিয়ে বেশিরভাগ মানুষ বাড়ি ফিরে যায়। নিষ্ঠাবান তর্পণকারীরা বাড়ি থেকে পুরোহিত নিয়ে আসে। বিকাশ এনেছিল দু'বছর। এখন সে নিজে, প্রতিটা পর্ব নিয়মমাফিক পালন করে। দরকার হলে ঘাট থেকে পুরোহিত ধরে নেয়। তর্পণের সকালে ঘাটেও পুরোহিত মেলে।

তর্পণের প্রথম পর্যায়, স্নানে বিকাশ বেশি আরাম পায়। অনেকটা সময় গঙ্গার জলে তার কেটে যায়। ভাল সাঁতারু সে। ঘণ্টাখানেক সাঁতার কাটে। জোয়ারের গঙ্গায় আজ সে নিশ্চয় মনের সাধ মিটিয়ে সাঁতার কাটবে। কূল ছাপানো গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে ছেলেবেলার কথা আমার মনে পড়ল। মনে পড়ল বাবাকে, মাকে। মনে করার মত জীবনের প্রথম ঘটনাটা স্মৃতি হাতড়ে তুলে আনতে চাইলাম। বাবা-মাকে সেখানে নিশ্চয়ই পাব।

চার

বাবা, জীবনে তোমার অনেক কথা শুনিনি, বহু উপদেশ অগ্রাহ্য করে চলে গেছি, আজ তোমার মৃত্যুর দশ বছর পরে, পিতৃপক্ষের সকালে শেষবারের মত তোমার অবাধ্য হতে চাই। তুমি বারণ কর না, ভুল বুঝো না আমাকে। জীবনের প্রথম স্মরণীয় ঘটনা দিয়ে শুরু করে আজ পর্যন্ত না বলা এক গোপন খবরে গিয়ে যে আমি পৌঁছতে চাই, তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ। ঠিকই বুঝেছ। গোপন খবরটা আজ পোকায় কাটা পুরনো সংবাদপত্রের মত গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। খবরের গোপনীয়তা নিয়ে আজ কারও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমার আছে। আমি আজও সেই গোপন কথার ভারে হাঁসফাঁস করছি। কথাটা কাউকে বলে হালকা হতে চাই। কাকে বলব? সবচেয়ে বেশি করে যে দুজনকে শোনাতে চাই, সেই চন্দ্রনাথ আর দয়াময়ী সেন, তুমি আর মা, পৃথিবীতে নেই। মাটি, জল, বাতাসে, কোথাও নেই। বিকাশের ধারণা, তোমরা আছ। তার বাবা, মা, পূর্বপুরুষের মত তোমরাও গঙ্গার স্রোতে, তার দু'ধারের পলিমাটিতে, বাতাসে মিশে আছ। ইচ্ছে থাকলে তোমাদের স্পর্শ করা যায়। তোমরাই নাকি সেই 'ইচ্ছে'।

অহরহ আমাদের ইচ্ছেকে তোমরা ছুঁয়ে আছ। গোপন কথাটা তোমাদের কাছে আর গোপন নেই। আমার কাছেও নেই। তবু আমি বলত চাই। তোমাদের শোনাতে চাই। নিজেকে শোনাতে চাই। বেশি করে শোনাতে চাই নিজেকে।

ছেলেবেলার প্রথম স্মরণীয় ঘটনাটা ছিল উনিশশ সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের সকাল, প্রথম স্বাধীনতা দিবস। ঘন কুয়াশার আড়ালে দাঁড়ানো গাছপালার মত চেতন-অবচেতনের ফাঁক দিয়ে সেই সকালটা দেখতে পাই। খুব সকালে আমাদের লেবুতলার বাড়ির সামনে থেকে প্রভাতফেরি বেরনোর আয়োজন হয়েছিল। পাড়ার অনেক মানুষ এসেছিল প্রভাতফেরিতে পা মেলাতে। উদ্যোক্তাদের একজন ছিল চন্দ্রনাথ সেন। আবছাভাবে মনে পড়ে, পনেরই আগস্টের কয়েকদিন আগে থেকে আমাদের বাড়ির একতলার বৈঠকখানায় গানের মহড়া চলছিল। মহড়াতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসত বাবার বন্ধু যতীন সামন্ত। মাঝারি হাইট, শ্যামলা রঙ, পাকানো শরীর, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, যতীনের সুরেলা গলা ছিল। গাইত ভাল। স্বদেশি গানে ওস্তাদ ছিল সে। প্রভাতফেরির গায়কদের তালিম দিয়ে তৈরি করে নিয়েছিল যতীন। পনেরই আগস্ট সকালে গানের দল নিয়ে প্রভাতফেরি শুরুর আগে, হারমোনিয়াম গলায় ঝোলানোর জন্যে যতীন এবং কয়েকজন একটা মজবুত দড়ি খুঁজছে শুনে, দয়াময়ী, তার পুজো করার লালপাড় গরদের শাড়িটা এনে যতীনকে বলেছিল, এটা নিন, হারমোনিয়াম বাঁধতে সুবিধে হবে।

শাড়িটা দেখেই আমি চিনেছিলাম। রোজ সকালে স্নান সেরে এই শাড়ি পরে ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীর পুজো করত দয়াময়ী। পুজো শেষ হলে শাড়িটা সযত্নে পাট করে ঠাকুরঘরের দেওয়াল আলমারিতে রেখে দিত। আমার কাছে ভোরের আলো, পাখির ডাক, গাছগাছালির সবুজ, ঘাসের ডগা থেকে জমানো শিশিরের জলে ঘষা চন্দন, আর ধূপের সুবাসের মত দয়াময়ীর শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে লেগে থাকা গন্ধও সমান প্রিয় ছিল।

যতীনকে গলায় হারমোনিয়াম ঝোলাতে সেই শাড়ি দয়াময়ী দিতে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম কিনা আজ মনে নেই। শাড়িটা যতীন নিতে চাইল না। দয়াময়ী বলল, নিন।

যদি ছিঁড়ে যায়?

সেলাই করে, কেচে তুলে রাখব। প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমার শাড়িটা যে কাজে লেগেছিল, মনে থাকবে। বলব সবাইকে।

মা, স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল তোমার মুখে। সেই হাসি আজও আমার চোখে লেগে আছে। মনে রাখার মত এরকম কিছু ঘটনা, জুড়ে জুড়েই তো জীবন তৈরি হয়। শিশু হয়ে ওঠে সাবালক। এরকম ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। কদাচিৎ ঘটে, এবং বোধহীন শিশুর স্মৃতিতে পাকা দাগ রেখে যায়। আমার জীবনে, মনে রাখার মত প্রথম ঘটনা হিসেবে সেই সকালটার কথা উল্লেখ করলে, মনে হয়, তা মিথ্যাচার হবে না। আজও সেই সকাল, স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ, তোমার হাসি, প্রভাতফেরির সামনে উদ্ভাসিত মুখ চন্দ্রনাথ, আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। সম্ভবত সেই বছরের শেষ দিকে, কিংবা আরও পরে চন্দ্রনাথ আর দয়াময়ীর সঙ্গে 'কার পাপে' নামে

একটা চলচ্চিত্র দেখতে গিয়েছিলাম। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে ছবিটা দেখতে কীভাবে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার সুযোগ পেয়েছিলাম, জানি না। দর্শক-আইন তখন হয়ত আলাদা ছিল। মা-বাবার সঙ্গে তিন-চার বছরের শিশুকে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে দেওয়া হত। ধরে নেওয়া হত, ছবিটা সে বুঝবে না। সত্যি, আমি ছবিটা বুঝিনি। বুঝব কী করে? প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বয়সের তফাত জানতাম না। দু'বয়সের বিধিনিষেধ জানলেও মূল পার্থক্যটা আজও জানি কিনা সন্দেহ! বসার আলাদা চেয়ার সম্ভবত আমার ছিল না। ছবির কিছুই বুঝতে না পেরে, কখনও বাবার কোলে, কখনও মায়ের কোলে বসে অস্বস্তিতে ছটফট করেছিলাম। ছবিটা আদৌ শেষ হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। ছবির যে ঘটনাটা আজও মনে আছে, তা হল, নায়কের একটা সাঙ্ঘাতিক রোগ হয়েছিল। ছবি দেখার পনের দিনের মধ্যে দয়াময়ীর শেষ সন্তান, আমার ছোট ভাই, কিশলয়ের জন্ম হয়। চন্দ্রনাথ তখন উত্তর বাংলার কোনও একটা জেলায় নিলামে জঙ্গল কিনতে গিয়েছিল। নির্ধারিত তারিখের এক মাস আগে পৃথিবীতে কিশলয় এঁসে যাওয়ায়, সেই মুহূর্তে ছেলের মুখ দেখার সুযোগ চন্দ্রনাথ পায়নি। স্বামীকে, নবজাত সন্তান দেখাতে দয়াময়ীকে সাতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিশলয়ের জন্মের পরে, সংসারে আমাদের প্রজন্মের নতুন কেউ আসেনি। ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে চন্দ্রনাথ দয়াময়ীর সংসার ভরে ওঠার পরের বছর থেকে ডালপালা মেলার কাজ শুরু হল। বড় মেয়ে চোদ্দ বছরের বীথিকার বিয়ে পাকা হল। বীথিকা তখন ক্লাস এইটে পড়ে। দু'বিনুনি বাঁধা বালিকা শাড়ি পরতে শুরু করেছে। অসম্ভব জাঁকজমক করে গড়ের বাদ্যি বাজিয়ে সদ্য ডাক্তারি পাস করা ব্যারাকপুরের অরূপ গুহর সঙ্গে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রনাথ। প্রায় এক হাজার মানুষ নিমন্ত্রিত ছিল। আমার বয়স তখন পাঁচ। বিয়ের হইহল্লা, আলোর রোশনাইয়ের চেয়ে বেশি করে মনে আছে তিন বুড়িকে। তারা হল আমার ঠাকুমার মা, বয়স বিরানব্বই, দিদিমার মা, বয়স নব্বই, আর সুজিত দাদুর মা, বয়স নিরানব্বই। বীথিকার বিয়ের সাত দিন আগে সংসারের এই তিন প্রাচীনতমাকে শ্যামবাজার, ভবানীপুর আর বেহালা থেকে চন্দ্রনাথ ভাড়া গাড়িতে সযত্নে তুলে বৌবাজারের বাড়িতে নিয়ে এল। প্রায় শতায়ু তিন বৃদ্ধাকে দোতলার পাশাপাশি দুটো ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে রাখার ব্যবস্থা হল। দূরসম্পর্কের আত্মীয় হলেও দয়াময়ীর কাকিমার বাবা সুজিত দাদুর মাকে বীথিকার কল্যাণের কথা ভেবে আনা হয়েছিল। নতুন সংসার জীবন শুরু করার আগে নিরানব্বই বছরের প্রমাতামহী সম্পর্কের একজনের আশীর্বাদ পাওয়া কম কথা নয়। বিয়ের আগে ক'জন মেয়ে তার দাদামশাইয়ের মায়ের হাতের স্পর্শ পায়? তিন বুড়িকে দেখার জন্যে আমাদের বাড়িতে ভিড় লেগে গিয়েছিল। আমিও লুকিয়ে তাদের দেখছিলাম। থান জড়ানো তিন বুড়িকে সপ্তমী পুজোর কলাবৌয়ের মত দেখাচ্ছিল। প্রথম দিনে, মায়ের সঙ্গে তাদের কাছাকাছি একবার গিয়ে এমন ভয় ধরে গিয়েছিল যে, পরে কয়েকদিন সে পথ মাড়াচ্ছিলাম না। সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলাম সুজিতদাদুর মাকে দেখে। শণের নুড়ির মত চুল, চোখের পাতা ভারি হয়ে ঢেকে দিয়েছে দুটো চোখ, মাথা আর দুটো হাঁটু, এক হয়ে গেছে। তাদের দেখে আমার আদ্যিকালের কোনও প্রাণী মনে হচ্ছিল। তিন বুড়ির

মধ্যে আমার দিদিমা অঘোরবালার মাকে যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ লেগেছিল। দিব্যি হাঁটাহাঁটি করছিল, কলঘরে যাচ্ছিল। বয়সে বড় দুই বুড়িকে দেখে নব্বই বছরের বুড়ি শরীরে বাড়তি জোর পেয়েছিল। পুরুষের মত গলায় মাঝে মাঝে দয়াময়ীকে 'নাতনি কোথায় গেলি' বলে ডাকাডাকি করছিল। তিন বুড়ির কাছাকাছি যতটা সম্ভব দয়াময়ী থাকার চেষ্টা করছিল। আমি তাদের এড়িয়ে যাচ্ছি টের পেয়ে দ্বিতীয় দিন দয়াময়ী বলেছিল, তোর দিদিদের মত এরাও একদিন তরুণী ছিল। তারপর তোর মায়ের বয়সী, দিদিমা, ঠাকুমার বয়সী হয়ে আজ এই বয়সে এসে পৌঁছেছে। বেঁচে থাকলে আমারও এদের মত বয়স হবে। তখন আমাকে দেখে তোর নাতি-নাতনিরা ভয়ে পালিয়ে গেলে, আমার কী হবে? তাদের নাতি-নাতনিরা আবার তোকে দেখে গা ঢাকা দিলে তোর কেমন লাগবে? মায়ের কথায় আমার ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। পাঁচ বছরের বালকের পক্ষে সময়ের লীলাখেলা বোঝা সহজ ছিল না। তবু মুহূর্তের জন্যে মহাসময়ের ঢেউকে যেন অনুভব করেছিলাম। বুড়িদের কাছে না ঘেঁষার আর একটা কারণ ছিল। বিয়েবাড়িতে আমার সমবয়সী মেয়েরাও কম ছিল না। পাঁচ বছরের বালকও সমবয়সিনীকে খুঁজে বেড়ায়। কাছাকাছি না গেলেও দূর থেকে তাকে দেখে। সমবয়সিনীদের চেয়ে বয়সে কিছু বড় দিদিদের মধ্যে রূপকথার রাজকন্যার আভাস পায়। সব বিয়েবাড়িতেই অনেক রাজকন্যা আসে। বীথিকার বিয়েতেও এসেছিল। তাদের ছেড়ে তিন বুড়ির কাছাকাছি কোন দুঃখে পড়ে থাকতে যাব? বাড়ির দোতলার দক্ষিণের দুটো ঘরে তিন বুড়িতে, তবু যে জাদুজগৎ তৈরি করেছিল, তার টান এড়াতে পারিনি। ভরদুপুরে অথবা শেষ বিকেলে, হঠাৎ তাদের দেখতে ইচ্ছে করত। দূর থেকে লুকিয়ে দেখতাম। গা ছমছম করত। তিন বুড়ির কাছে সবচেয়ে বেশি সময় কাটাত দেবু বোস, আমাদের দেবুমামা। দেবুমামাকে দেখে তারাও হেঁড়ে গলায় অভ্যর্থনা করতো। অনেক বছর পরে, দেবুমামা মারা যাওয়ার পরে, কানাঘুষোয়, বিধবার সম্পত্তি মেরে তার বড়লোক হওয়ার কথা শুনে এই তিন বিধবা বুড়িকে আমার মনে পড়েছিল। বিয়েবাড়িতে তিন বুড়ির সবচেয়ে বেশি স্নেহ পেয়েছিল দেবুমামা। দেবুমামার বয়স তখন চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, বলতে গেলে বুড়িদের হাঁটুর বয়সী। আমার বাবা চন্দ্রনাথ সেন ছিল একজনের নাতি আর দুজনের নাতজামাই। বাবা ঘরে এলে তাকে দখল করে নিত বাবার দিদিমা নিস্তারিণী দাসী। শরীরে জড়ানো থান, নিস্তারিণী দাসী ঠিকমত রাখতে পারত না। থানের তলায় তাকে সেমিজ পরানো হত। বেশিরভাগ সময়ে সেমিজ পরা বুড়ির থেকে কয়েক হাত দূরে থানটা পড়ে থাকত। চন্দ্রনাথ ঘরে এসে পুঁটলি পাকানো থানটা আলাদা পড়ে থাকতে দেখলে সেটা তুলে, বিরানব্বই বছরের দিদিমার শরীরে যত্ন করে জড়িয়ে দিত। নাতির গলা জড়িয়ে বুড়ি খিলখিল করে হাসত। বাকি দুজন বুড়ি নাতজামাইকে দেখে গলা পর্যন্ত ঘোমটা টেনে কলাবৌ সেজে বসে থাকত। বাবাকে দেখলে সুজিতদাদুর নিরানব্বই বছরের মা নববধূর মত আচরণ করত। তা দেখে মায়ের দিদিমা বিড়বিড় করত, ঢঙি! বীথিকার বিয়ে চুকে যেতে তিন বুড়িকে যার যার ঠিকানায় দেবুমামা পৌঁছে দিল। যে অঘ্রানে বীথিকার বিয়ে হল, তার পরের অঘ্রানে দিদিমার মা মারা গেল। সুজিতদাদুর মা একশো এক বছর বেঁচেছিল। ঠাকুমার

মা ঠিক কবে মারা গেল, জানতে না পারলেও একশো বছর বাঁচেনি।

এসব তথ্য জেনেছিলাম পরে। তখন আমি স্কুলে পড়ি। পাঁচ বছর বয়সে প্রায় শতায়ু তিন বুড়িকে দেখতে পাওয়া যে কম সৌভাগ্য ছিল না, আজ বুঝতে পারি। আমার কপালে সময় যেন হাত রেখেছিল।

পাঁচ

গঙ্গার জলে চিকচিক করছে তিন বুড়ির হাসি। তাদের ছাই, নাভি জলে, দু'তীরের মাটিতে মিশে আছে। বিকাশের মতে বস্তু মানুষের বিনাশ নেই। রক্ত, হাড়, মাংস, মজ্জাতে তৈরি বস্তু মানুষের শরীরের বিনাশ ঘটলে তার ভেতরের অবস্তু প্রাণের কি ঘটে? প্রাণের কি বিনাশ হয়? বাতাস থেকে শেষবারের মত মানুষ যে শ্বাস টেনে নেয় এবং বাতাসকে ফিরিয়ে দেয়, গৃহীত আর ত্যক্ত সেই দুটো বাতাস কি স্বভাবে এক? জল, মাটি, আলোর মত বাতাসের বিনাশ নেই। মানুষের শেষ নিঃশ্বাসও সেই মানুষের স্বভাবধর্ম নিয়ে বাতাসে মিশে যায়। মাটি থেকে মহাকাশ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। বাতাসও অবস্তু নয়, ধ্বংস হয় না। মানুষ হয়ত একদিন বায়ুমণ্ডলের প্রতিটা স্তর, প্রতিটা অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশ্বাসত্যাগকারীকে শনাক্ত করতে পারবে। তারপর? আমার আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না। তিন বুড়িকে আজ তাদের নাতি, প্রপৌত্রদের কেউ কি তর্পণ করতে এসেছে? নিশ্চয়ই এসেছে। তা না হলে, গঙ্গার জলে তাদের ফোকলা মুখের হাসি কীভাবে আমি দেখতে পেলাম?

ঘাটের ভিড়ের মধ্যে নজর করে বিকাশকে দেখতে পেলাম না। দুশো গজ দূর থেকে তর্পণকারীকে মুখ দেখে চেনার উপায় নেই। মালকোঁচা বেঁধে বিকাশ সাঁতার শুরু করতে পারে। ধুতি, গামছা দান করে সাঁতারের পোশাক পরে সে সাঁতার কাটলেও আমি আশ্চর্য হব না। জলের সঙ্গে মৃত পূর্বপুরুষের স্নেহের হাসি তাকেও নিশ্চয়ই ঘিরে আছে। স্নান শেষ হলেও তার তর্পণের আরও কাজ বাকি থাকবে। বাড়ি ফিরতে তার বেলা হবে।

বাবা, মা, চন্দ্রনাথ আর দয়াময়ী সেনের কথায় আমি ফিরে যাই। মা-বাবার মধ্যে যে বিচ্ছেদ আমি ঘটিয়ে দিয়েছিলাম, তা বাড়ির সকলের টের পেতে সময় লাগল। মা-বাবার নিশ্চুপ হয়ে যাওয়াকে প্রথমে তারা ভেবেছিল দাম্পত্যকলহ। চন্দ্রনাথ, দয়াময়ীর মধ্যে এরকম ঠাণ্ডা এবং উষ্ণ কলহ মাঝে মাঝে হত। কিছুদিন বন্ধ থাকত কথা, ভাববাচ্যে তাদের কথা চলত। সন্ধের পরে উল্টোডাঙার কাঠের গোলা থেকে চন্দ্রনাথ ফিরলে, কখনও তার রাতের খাওয়া চুকলে, তার শোয়ার ঘরে, আধ ঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্যে দয়াময়ীর সঙ্গে যে বৈঠক বসত, তা বন্ধ থাকত। দয়াময়ীর মুখ তখন থমথম করত, কথা কমে যেত, চন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকত না। বছরে এক-দুবার এরকম ঘটত। দয়াময়ীর গোঁসা কাটতে সাত থেকে পনের দিনের বেশি লাগত না। সময়টা নির্ভর করত গোঁসার কারণের ওপর। আমার মনে আছে, অরিন্দমের

ফুলশয্যার দু'দিন পরে, এমন ঘটনা ঘটেছিল, যার জের পরিবারে অনেকদিন ছিল। বীথিকার যখন বিয়ে হয়, তখন আমি শিশু ছিলাম। অরিন্দমের বিয়ে হয় তার দশ বছর পরে। তখন স্কুলের শেষ ক্লাসে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম। বীথিকা দুই ছেলেমেয়ের মা। বড়দার বিয়েতে আমার বন্ধুরাও এসেছিল। বাবার নামে ছাপানো বিয়ের কার্ড দিয়ে তাদের আমি নেমন্তন্ন করেছিলাম। অরিন্দমের বিয়েতেও লোক কম হয়নি। এক হাজারের কাছাকাছি। সে বিয়েতেও মায়ের সই-এর বৌ-এর বকুল ফুলের ভাগ্নী জামাই থেকে বিনা খবরে হঠাৎ চলে আসা, বাৎসরিক অতিথি ভাঁটুমামা পর্যন্ত হাজির ছিল। মেঝেতে আসন পেতে জলে ধোয়া সবুজ কলাপাতায় নিমন্ত্রিতদের তখনও খাওয়ানো হত। বোঁটা সমেত লম্বা করে কাটা বেগুনভাজা, শাকভাজা, কিসমিস গরমমশলা দেওয়া ছোলার ডাল, কুমড়োর ছক্কা, দুটো গরম লুচি, পাতায় সাজিয়ে অতিথিদের পঙ্‌ক্তি ভোজে বসানো হত। পাতার বাঁদিকে থাকত নুন, আধখানা পাতিলেবু আর আদা কুচো। অনুষ্ঠানে তখনও পাঁঠার মাংস খাওয়ানো হত। মুরগী ছিল খানদানি খাবার তালিকার অঙ্গ। মধ্যবিত্ত বাড়ির অনুষ্ঠানে মুরগী ঢুকত না। অতিথিদের পরিবেশন করা হত বাড়িতে তৈরি রাজভোগ আর পান্তুয়া। ভিয়েন বসতো অনুষ্ঠানের চব্বিশ ঘন্টা আগে। চেনা হালুইকর, গৌর পানিগ্রাহী, তার দু-তিনজন জোগাড়েকে নিয়ে ভিয়েনের ভার বুঝে নিত। খাদ্যরসিক হলেও চন্দ্রনাথ খেত কম, খাওয়াতে ভালবাসত। কোলেবাজারের মাছওলা, সবজি ব্যপারিরা তাকে চিনত। মান্য করত। বাজারের সেরা মাছ, মাংস সবজি চন্দ্রনাথের ভিয়েনে পৌঁছে যেত। রাজভোগ, পান্তুয়ার ছানা আসত বউবাজারের সৃষ্টিধর ঘোষের দোকান থেকে। সে এক এলাহী কাণ্ড! ভেনঘরে চেয়ারে বসে সারারাত ধরে চন্দ্রনাথ মিষ্টি তৈরি করাত। পাশে আর একটা চেয়ারে বসত সমবয়সী বন্ধু যতীন সামন্ত। যতীনকে বাবা বলত, চেখে দেখ, কেমন হল!

এই তো দুটো চাখলুম।

আগের চেয়ে এ দুটো আলাদা। একটু কড়া করে ভাজা।

জহুরির মত মুখ করে দ্বিতীয় জোড়া পান্তুয়া খেয়ে যতীন তারিফ করত, চমৎকার! জগদ্ধাত্রী পুজোয় এ বছর বাড়িতে এই পাকের পান্তুয়া করব।

যতীন থাকত চোরবাগানে। চার পুরুষের বাস। সাবেক আমলের বাড়িতে ফি বছর ধুমধাম করে জগদ্ধাত্রী পূজো হত। যতীনকাকাই পুজো শুরু করেছিল। যতীনকাকার বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর সন্ধেতে কতবার যে পাত পেতে খেয়েছি, বলতে পারব না। পুজোর প্রসাদ, বারকোস বোঝাই মিষ্টি আসত আমাদের বাড়িতে, বিসর্জনের পরের দিন। চন্দ্রনাথের মত আত্মীয়বন্ধুদের খাওয়াতে যতীনকাকাও ভালবাসত। খাইয়ে তৃপ্তি পেত। আমার ধারণা, যতীনকাকার জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করার কারণও তাই। বাবার মত যতীনকাকাও ভিয়েনে আগাগোড়া দাঁড়িয়ে থেকে রান্না করাত। তার পাশে থাকত চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথকে দেখলে হালুইকর গৌর আর তার সঙ্গীদের কাজের উৎসাহ বেড়ে যেত। চন্দ্রনাথকে ভেনঘরে আটকে রাখতে ঘন্টায় ঘন্টায় চা বানিয়ে দিত। মানুষটা যে চা খেতে ভালবাসে, গৌর ঠাকুর জানত। আর জানত, রান্না করানো এবং তা দেখা মানুষটার শখ।

ভেনঘর সামলাতে চৌখস, সেই চন্দ্রনাথ সেনের বড় ছেলে, অরিন্দমের বৌভাতে রাজভোগ কম পড়েছিল। হিসেবের জিনিস উধাও হতে চন্দ্রনাথ অবাক হয়েছিল। তখন কিছু করার ছিল না। শেষ পঙক্তি খেতে বসার আগে ঘটনাটা চন্দ্রনাথের নজরে আসতে তখনই একশো রাজভোগ আনতে দেবু বোসকে পাঠিয়েছিল। রাত সাড়ে দশটায় একটা মিষ্টির দোকান থেকে সমান মাপের একশো রাজভোগ দেওয়া নামী দোকানির পক্ষেও মুশকিল। দেবুমামা কীভাবে কার্যোদ্ধার করেছিল কেউ জানে না। শেষ পাতে নিমন্ত্রিতদের রাজভোগ কম পড়েনি। অনেকে একাধিক খেলেও পঁচিশটা রাজভোগ বাড়তি ছিল।

বৌভাতের দুদিন পরে নববধূকে নিয়ে অরিন্দম শ্বশুরবাড়িতে রাত কাটাতে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাড়িতে ঝড় উঠল। আলমারি খুলে পাঁচভরির বিচেহারটা না পেয়ে দয়াময়ী বুঝল, কী ঘটেছে! বৌভাতের রাতে রাজভোগ বাড়ন্ত হওয়ার ঘটনা এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের বিবরণ দয়াময়ী জানলেও আসল খবরটা জানত না। রাজভোগ কেনার মত যথেষ্ট টাকা বাড়িতে না থাকায় আলমারি খুলে দয়াময়ীর বিচেহারটা পাড়ার সোনার দোকানে চারশো টাকায় চন্দ্রনাথ বন্ধক দিয়েছিল। চন্দ্রনাথ ভেবেছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হার উদ্ধার করে আলমারিতে জায়গামত রেখে দেবে। নতুন বৌ আর লৌকিকতা নিয়ে ব্যস্ত দয়াময়ী সাত দিনের আগে আলমারি খুলবে না। চন্দ্রনাথের হিসেব মিলল না। কিছু সন্দেহ করে দয়াময়ী আলমারি খুলেছিল এবং তার সন্দেহটা মিলে গিয়েছিল। ঝড় বয়ে গেল বাড়িতে। অনেক গাছপালা পড়ল, ধুলো উড়ল, নতুন বৌ নিয়ে শ্বশরবাড়ি থেকে ফিরে অবস্থা টের পেতে অরিন্দমের দেরি হল না। দয়াময়ীকে আড়ালে ডেকে তার দু'হাত ধরে নতুন বৌ সুপর্ণার সামনে কোনও অশান্তি না করতে অনুরোধ করল। মধুচন্দ্রিমা থেকে ফিরে এসে নতুন বিচেহার কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল দয়াময়ীকে। তারপর হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। দয়াময়ীও কাঁদল। স্বামীর সঙ্গে বিচেহারের জন্যে যে ঝগড়া করেনি, অরিন্দম কিনে দিলেও যে নেবে না, তার কষ্ট যে আলাদা, ছেলেমেয়েরা কেন বুঝতে চায় না, এই ছিল তার অভিযোগ। দু'দিন পরে সুপর্ণাকে নিয়ে অরিন্দম ট্রেনের বাতানুকূল কামরায় চেপে মহাবলীপুরমের সমুদ্রসৈকতে মধুচন্দ্রিমা করতে চলে গেল। আমাদের বাড়িতে থমকে থাকা ঝড় নতুন করে আছড়ে পড়ার আগে বন্ধক দেওয়া বিচেহার চন্দ্রনাথ উদ্ধার করে আনল। তারপরেও ঝড় থামল না। তবে ঝড়ের দাপট কমে গেল।

বিচেহার কেলেঙ্কারির পরে দু-তিন মাস বাড়িতে আবহাওয়া খানিকটা গুমোট হয়েছিল। সন্ধের পর অথবা রাতে চন্দ্রনাথের খাওয়া শেষ হলে তার সঙ্গে দয়াময়ীর আধঘণ্টা খোশগল্প বন্ধ থাকল। বাড়ির পরিবেশ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল। শুরু হল চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর সন্ধ্যের মজলিশ। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর দাম্পত্য কলহে খুব বেশি হইচই না হলেও এমন এক পরিবেশ তৈরি হত যে বাড়ির মেজাজ পাল্টে যেত। আমরাও নিজেদের মধ্যে ভাল করে কথা বলতাম না। কারণ না থাকলেও ঝগড়া করতাম। মা-বাবার সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকলে আমরাও হেসেখেলে বেড়াতাম। সবসময় জানতাম যে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীতে যত ঝগড়া হোক, শেষ পর্যন্ত

মিটে যাবে। তাই ঘটত। মা-বাবার মন কষাকষির মধ্যে ভাঁটুমামা এসে উদয় হলে আমরা খুশি হতাম। বুঝতে পারতাম, মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হতে দেরি নেই। ভাঁটুমামা যে কোথা থেকে আমাদের বাড়িতে আসত এবং কিছুদিন কাটিয়ে কোথায় যেত, জানতাম না। ফের কবে আসবে, সে ধারণাও কারও ছিল না। দয়াময়ী-চন্দ্রনাথও জানত না ভাঁটুমামার ঠিকানা।

কখনও ছ'মাস কখনও এক বছর পরে, ভরদুপুরে, অথবা সন্ধের মুখে আমাদের বাড়িতে ভাঁটুমামা হাজির হত। দুপুরে এলে সোজা দোতলায় উঠে দয়াময়ীকে বলত, মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাব।

বাড়িতে মাগুর মাছ না থাকলেও ভাঁটুমামাকে দেখে দয়াময়ী এত খুশি হত যে বলত, মাগুর মাছের বদলে ইলিশ মাছ হলে কি তোমার অসুবিধে হবে?

ফার্স্ট ক্লাস! কোনও অসুবিধে নেই। ইলিশ আমি ভাল খাই। ভাঁটুমামার কথায় খুশিতে জল হয়ে মা বলত, কাল মাগুর মাছের ঝোল খাওয়াব তোমাকে।

পঞ্চাশের মাঝামাঝি বয়েস, রোগা পাকানো শরীর, চাপা শ্যামবর্ণ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভাঁটুমামা খুশিতে দয়াময়ীর ঘরের সাদা পাথরের মেঝেতে বসে পড়ত। দয়াময়ী হা-হা করে উঠে বলত, দাদা মেঝেতে বসছ কেন? চেয়ারে বসো। না, বরং বিছানায় আরাম করে বসো।

মেঝেতে শরীর এলিয়ে দিয়ে ভাঁটুমামা বলত, তোর ঘরের এই মেঝেতে বসে যে কী আরাম, বলার নয়। কতদিন ধরে ভাবছি আসব, কিছুতে হয়ে ওঠে না।

ভাঁটুমামা আসার খবর পেয়ে আমরা ততক্ষণে মায়ের ঘরে এসে জুটতাম। আমাদের দেখে খুশিতে ঝিকমিক করত ভাঁটুমামার চোখ। বলত, আমার কাছে আয়। বোস।

দ্বিতীয়বার বলার দরকার হত না। দেবপ্রতিম আমি কিশলয় ভাঁটুমামাকে ঘিরে বসে পড়তাম। মানুষটাকে দেখতাম। কখনও সন্ধে নাগাদ আমাদের বাড়িতে এসে, দয়াময়ীর ঘরে গিয়ে ভাঁটুমামা বলত, আজ রাতে ফুলকো লুচি, বাদামি করে চাকা চাকা আলুভাজা আর ছোলার ডাল খাব।

হাসিমুখে তাকিয়ে দয়াময়ী জিজ্ঞেস করত, কচি পাঁঠার মাংস হয়েছে। একটু খাবে তো?

ফার্স্ট ক্লাস! বেশ কিছুদিন ধরে কচি পাঁঠার মাংস খেতে ইচ্ছে করছিল রে!

ভাঁটুমামা আমাদের কেমন মামা জানতাম না। জানার আগ্রহও ছিও না। দেবুমামা মায়ের কোন সম্পর্কের ভাই, কখনও জানতে চাইনি। আত্মীয় পরিজনেরা সংসারের পাঁচজন থেকে আলাদা নয়, এটাই ভাবতাম। বাড়িতে তাদের গাদাগাদি ভিড় হয়ে গেলেও সামান্য অসুবিধে বোধ করতাম না। তবে ভাঁটুমামাকে নিয়ে কিছু গোলমাল ছিল। ভাঁটুমামাকে দেবপ্রতিম, বিপাশা ডাকত ভাঁটুজ্যাঠা বলে। অরিন্দম বলত ভাঁটুমামা, বীথিকা ভাঁটুজ্যাঠা বলত। দু'রকম ডাক শুনেও আমি কেন ভাঁটুমামা বলতাম, জানি না। কিশলয় বলত ভাঁটুজ্যাঠা। একজন মানুষ একই সঙ্গে মামা আর জ্যাঠা হয়, জানতে আরও পনের বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যা জেনেছিলাম, তা হল ভাঁটুমামা বা ভাঁটুজ্যাঠা, চন্দ্রনাথের পিসতুতো ভাইয়ের পিসির পরিবারের সূত্রে আমাদের জ্যাঠা এবং দয়াময়ীর মামাতো বোনের মামারবাড়ির সম্পর্কে আমাদের মামা।

দুদিক দিয়েই নিকট আত্মীয়। মামা, জ্যাঠা, দুটোই বলা যায়। দয়াময়ীর সঙ্গে ভাঁটুমামার যত খাতির ছিল, চন্দ্রনাথের সঙ্গে তার চেয়ে কম ছিল না। দয়াময়ীর মত চন্দ্রনাথ বলত ভাঁটুদা। তার সঙ্গে গল্প করতে বসলে তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত। চন্দ্রনাথের ঘরে দয়াময়ী-চন্দ্রনাথের সন্ধের আড্ডায় ভাঁটুমামা অনায়াসে ঢুকে পড়ত। চন্দ্রনাথের ঘর থেকে তখন ঘনঘন ভেসে আসত হাসির আওয়াজ। রাতের খাওয়ার পরে দ্বিতীয় আসর বসত। কখন শেষ হত জানার উপায় ছিল না। আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম। চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেলে আমরা ভাঁটুমামার অপেক্ষা করতাম। ভাঁটুমামা এলে আমাদের খরাপীড়িত সংসারে বৃষ্টির মত মজা, হাসি নেমে আসত।

স্কুলে আমার শেষ বছরে, অরিন্দমের বিয়ের সময় ভাঁটুমামা এলেও বেশিদিন থাকেনি। বৌভাতের পরের দিন 'জরুরি কাজ আছে' বলে চলে গিয়েছিল।

রাজভোগের টাকা জোগাড় করতে দয়াময়ীর বিচেহার উধাও হওয়ার ঘটনা জানাজানি হলে চন্দ্রনাথের সংসারে ভাঁটুমামা হয়ত আরও কিছুদিন থেকে যেত। তিন মাস আমাদের দুর্ভোগে কাটাতে হত না। ভাঁটুমামা এল সাত মাস পরে। সংসারে তখন শান্তির হাওয়া বইছে। কোথাও কোনও গোলমাল নেই। স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে আমি তেড়েফুঁড়ে লেখাপড়া করছি। একতলায় আমাদের পড়ার ঘরে চৌকিতে ভাঁটুমামার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল সেবার। বাড়িতে তখন এত অতিথি যে দোতলার দুটো বাড়তি ঘরেও জায়গা ছিল না। তারকেশ্বর থেকে দয়াময়ীর ছেলেবেলার সখী 'ফুলের মালা' অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা করাতে আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছিল। দু'মাস আগে দোতলার একটা ঘরে বৌ-মেয়ে নিয়ে এসে উঠেছিল চন্দ্রনাথের বড় ভাগ্নে বিজিত। বিজুদা ছিল নিরীহ, শান্ত মানুষ। যাত্রা, থিয়েটার দেখার সখ ছিল, পদ্য লিখত। যাত্রাদলের সখীর মত ছোটখাটো সুন্দর চেহারা, মুখে নিষ্পাপ হাসি, কত যে মজার গল্প জানত, হিসেব নেই। আরও ছেলেবেলায়, বিজুদা বাড়িতে এলে আমাদের লেখাপড়া মাথায় উঠত। গল্প শুনতে সকলে বসে যেতাম। বিজুদাও আমাদের হতাশ করত না। অসম্ভব ভাল কথক ছিল। সব গল্পের নায়ক বিজুদা। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত সে সব গল্প! খুনি, চোর ডাকাত, পুলিস, এমনকি ভূতপেত্নীদের বোকা বানিয়ে নিজের কাজ যে হাসিল করত, চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে সেই মানুষটা ভাইবোনদের ভয়ে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে মামা চন্দ্রনাথ সেনের আশ্রয় নিয়েছিল। বিজিতের ছোট দু ভাই, ভানু আর ধানু বাড়িছাড়া করেছিল দাদাকে। তার আগে মারতে বাকি রেখেছিল। দাদাকে ভাইদের নিগ্রহে সায় ছিল তাদের মা লতিকার। সাত ছেলেমেয়ে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল চন্দ্রনাথের দিদি লতিকা। বড় ছেলে বিজিতের বয়স তখন কুড়ি, সবচেয়ে ছোট যে মেয়ে, নাম কাজরী, তার বয়স ছিল তিন। কাজরী, আমার সমবয়সী ছিল। ধনী পরিবারে চন্দ্রনাথের বোন, লতিকার বিয়ে হলেও তার স্বামী ধর্মদাস দত্তের টাকার পাহাড় ছিল না। টাকার পাহাড় থাকলে, সেটা আগলাতে পাহারাদার লাগে। বাপ ঠাকুর্দার অর্জিত টাকার পাহারাদার হওয়ার মতো এলেম ধর্মদাসের ছিল না। খরচের হাত ছিল তার। টাকাকে ফুটকড়াই ভাবত। তবু পাঁচ পুরুষের জমানো টাকা, পুরো শেষ করতে পারেনি। তার ছেলেরা খরচের ধাতটা পেলেও পাহারাদারির ঝক্কি সামলাতে পারল না। সে বয়সও তাদের ছিল না। বিজিত

তখন কলেজে পড়ে। ফুলবাবু ছিল সে। পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি ছাড়া পরত না। সবচেয়ে মিহি লাট্টুমার্কা ধুতি আর পাঞ্জাবি বানানোর জন্যে ফিনলের আদ্দি কিনত। ক্যাপস্টান সিগারেট খেত। ধর্মদাস অসময়ে মারা যেতে বিজিত অথৈ জলে পড়ে গেল। সংসারের চাপে চোখে সর্ষেফুল দেখল। আত্মীয়জন যতটা সম্ভব পাশে এসে দাঁড়ালেও আড়বুঝো লতিকার হাবভাব দেখে তাড়াতাড়ি সরে গেল। সব কিছু বাঁকাভাবে দেখা ছিল লতিকার স্বভাব। শোক জানানোর নাম করে বেশির ভাগ আত্মীয় যে ধর্মদাসের টাকাকড়ি, সম্পত্তি হাতাতে চায়, এমন সন্দেহ তার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। চন্দ্রনাথ ছাড়া কাউকে সে পাত্তা দিল না। চন্দ্রনাথের পরামর্শ যে পুরো শুনত, এমন নয়। ধর্মদাসের বেলেঘাটার বাড়িতে চন্দ্রনাথের যাতায়াত ক্রমশ কমে গেল।

টাকার পাহাড় আগলানোর মানুষটা পৃথিবী থেকে চলে গেলেও তার আমলের খরচ লতিকা বহাল রাখল। খরচের ফর্দ একটু বাড়ল। বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে কানাকড়ি জ্ঞান না থাকলেও মায়ের সঙ্গে তাল মেলাল বিজিত। পাঁচ-সাত বছর যেতে টের পেল, টাকার পাহাড়ের সঙ্গে কর্পূরের পাহাড়ের বিশেষ তফাত নেই। ভাল করে ঢেকেঢুকে না রাখলে চোখের পলকে দুটোই উবে যায়। পাঁচ পুরুষের বৈভব তলানিতে এসে ঠেকতে বিজিতের চোখ খুললেও লতিকার চোখ খুলল না। ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকল। বিজিতের কিছু করার ছিল না। বিজিতের ভাগ্য ভাল, ধর্মদাসের মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে তার দুই বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তার বিয়েও প্রায় জোর করে লতিকা দিয়েছিল। মেয়ের বাবার কাছ থেকে বিয়ের পণ হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে সেই টাকাতে সেজ মেয়ে পলার বিয়ে দেওয়ার ছক করেছিল। পলার জন্যে যোগ্য ছেলে খুঁজে বার করার আগেই পঞ্চাশ হাজার টাকা ফুটকড়াই হয়ে গেল। খরচের বেশিটা সংসারের জন্যে হলেও বিজিত আর তার বৌ কমলার ওপর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে লতিকা ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধানু আর ভানু স্বভাবে ছিল বিজিতের উল্টো। দশাসই শরীর ছিল তাদের। একজন ছিল ডাকাবুকো, আর একজন মিচকেপোড়া। গড়পাড়ের বিষ্টু ঘোষের আখড়ায় তারা ব্যায়াম করত। বিজিত, কমলাকে পরিবারের সবাই হেনস্তা করতে লাগল। কমলা ইতিমধ্যে এক কন্যাসন্তান প্রসব করতে তারা আরও চটে গেল। সবচেয়ে বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল অবিবাহিতা পলা। কমলাকে সে মারতে বাকি রাখল। তেইশ বছর বয়স হয়েছিল তার। বিয়ে না হওয়ায় সে পরপর তিন বছর তেইশে থেকে গেল। বিজিত বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে সে চব্বিশে পা দিয়েছে।

বিজিতকে সপরিবারে আশ্রয় দিয়ে দয়াময়ী বলল, যতদিন খুশি আমার এখানে থাক। দেখি আমি কী করতে পারি। সবচেয়ে আগে পলার বিয়ে দেওয়া দরকার।

বাড়িতে তখন পা ফেলার জায়গা নেই। তার মধ্যে দয়াময়ীর ছেলেবেলার সখি 'ফুলের মালা' এল অসুস্থ স্বামী নিয়ে চিকিৎসা করাতে। ফুলের মালার নাম কী ছিল, আমার মনে নেই। তাকে ফুলমাসি বলে আমরা ডাকতাম। ফুলমাসি আর তার অসুস্থ স্বামীর সঙ্গে তাদের মেজ ছেলে শোভেন এসেছিল। শোভেন ছিল আমার বড়দা অরিন্দমের সমবয়সী। দেবপ্রতিমের ঘরে শোভেনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। পনের দিন আগে ছাতের চিলেকোঠায় আর একজন অতিথি এসে উঠেছিল। তাকে 'খুড়ো'

বলত দয়াময়ী। খোঁচা খোঁচা পাকা চুল, চোখে মোটা কাচের চশমা, বয়স্ক মানুষটার আসল নাম ছিল বামাপদ সরকার। দয়াময়ীর ঠাকুর্দা যে ইংরেজ সওদাগরি অফিসে বড়বাবু ছিল, বামাপদ সেখানে কেরানির চাকরি করত। বামাপদকে চাকরিতে ঢুকিয়েছিল দয়াময়ীর ঠাকুর্দা, বিরজাকান্ত ঘোষচৌধুরি। দয়াময়ীর বাবাও বামাপদকে খুড়ো বলে ডাকত। বাবা মার যাওয়ার পরে দয়াময়ী এবং তারপর আমরাও খুড়ো বলতাম বামাপদকে। খুড়োর বয়সের গাছপাথর ছিল না। বাগবাজারে, দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ির একতলার ঘরে খুড়ো থাকত। তারাই দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিত। মাঝখানে ডান পায়ের মালাইচাকি ভেঙে হাসপাতালে তিন মাস থাকার পর যখন ছাড়া পেল, ভাল করে হাঁটতে পারত না। ল্যাংড়া পানিয়ে বাগবাজারের বাড়িতে যেতে সাহস না পেয়ে। রিকশায় চেপে দয়াময়ীর কাছে হাজির হল। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দয়াময়ী তিনতলার ঘরে খুড়োকে আশ্রয় দিল। নামে চিলেকোঠা হলেও ঘরটা বেশ বড় ছিল। পুবে দরজা ছাড়াও দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে দুটো জানালা ছিল। ঘরে বিছানা পেতে শুলে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যেত। গরমের সময়েও ভোররাতে শীত করত। চাদর দিতে হত গায়ে। সবচেয়ে বড় কথা, ঘরের সংলগ্ন কলঘর ছিল। চন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বন্ধ হলে প্রথম কিছুদিন দয়াময়ী চিলেকোঠার ঘরে এসে থাকত। মোটা গদি পাতা বড় একটা খাট ঘরে রাখা ছিল। আমরা মজা করে বলতাম মায়ের গোঁসাঘর। সদ্য প্লাস্টার খোলা ভাঙা পা নিয়ে ছাতের ঘরে খুড়ো সেঁধিয়ে গেল। মহা আরাম সেখানে। সকালের চা থেকে রাতে পরোটা, মাংস পর পর পৌঁছে যেত। সকাল সন্ধে বেতের লাঠি নিয়ে খুড়ো ছাতে পায়চারি করত। জুড়ে যাওয়া মালাইচাকিটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা বুঝতে চাইত। চোদ্দটা ঘর ছাড়াও চন্দ্রনাথের বাড়িতে দালান, উঠোন বারান্দা ছিল। তবু সেই কয়েকটা মাস বাড়িতে গিজগিজ করত মানুষ। অরিন্দমের অফিসের এক মারাঠি সহকর্মী, স্বরূপ ভাটনগরের ভাই মুম্বই থেকে কলকাতায় চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আমাদের বাড়িতে এসে উঠল। চাকরি জীবনের শুরুতে অরিন্দম যখন মুম্বইতে ছিল, তখন ভাটনগরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। ছ মাস মুম্বইতে ছিল অরিন্দম। ভাটনগরের পরিবারে আপনজন হয়ে গিয়েছিল। আমার আর কিশলয়ের সঙ্গে এক খাটে স্বরূপ ভাটনগরের ছোটভাই, রাজীবের শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড় ছিল রাজীব। কিশলয় আর রাজীবের মাঝখানে আমি শুলাম। তার সঙ্গে দু'রাত এক বিছানায় শুয়ে আমার এমন ভয় ধরে গেল যে, তৃতীয় রাতে চাদর বিছিয়ে আমি মেঝেতে বিছানা পাতলাম। মাঝরাতে ঘুম ভাঙতে দেখলাম, আমার পাশে কিশলয় শুয়ে আছে। পাঁচ রাত রাজীব ছিল আমাদের বাড়িতে। রাতে তিনজন একসঙ্গে বিছানায় শুলেও রাজীব ঘুমোলে খাট থেকে কিশলয় আর আমি নেমে এসে মেঝেতে চাদর বিছিয়ে তিন রাত ঘুমিয়েছিলাম। আমাদের খাটে রাজীব একা ঘুমত। রাজীব চলে যাওয়ার পরে ঘটনাটা আমি দেবপ্রতিমকে বলতে গম্ভীর মুখে সে বলেছিল, চেপে যা। ফুলের মালার ছেলেও এক জিনিস।

তখনই ভাঁটুমামা এল আমাদের বাড়িতে। আমাদের পড়ার ঘরে তক্তাপোশে তার

শোয়ার ব্যবস্থা হল। ভাঁটুমামাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। পড়ার ঘরে পাশাপাশি দুটো টেবিলে কিশলয় আর আমি পড়তাম। দেবপ্রতিমের পড়ার টেবিলও দু'বছর আগে এখানে ছিল। কলেজে ঢোকার পরে আলাদা ঘর পেয়েছে সে। টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে একটা খাটও আছে সেখানে। আমাদের বাড়িতে সিঙ্গল খাট ছিল না। বেশিরভাগ দুজনের খাট। অনায়াসে সেখানে চারজন শোয়া যেত। দোতলার চারটে ঘরে ছজন করে শোয়ার মত চারটে পালঙ্ক ছিল। তার একটা পালঙ্ক, দয়াময়ীকে দিয়েছিল তার ঠাকুমা। দয়াময়ীর ঠাকুর্দা আবার সেটা তার ঠাকুমার কাছ থেকে পেয়েছিল। পালঙ্কটা দয়াময়ী ব্যবহার করত। বয়স যখন আমাদের কম ছিল মাকে নিয়ে অনেক রাতে আমরা আটজনও সেই পালঙ্কে ঘুমিয়েছি। অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে নিয়ে আত্মীয়কুটুমরা এলে এরকম ঘটত। চৌকোনা চারটে কাঠের টুকরোর ওপর পালঙ্কটা বসানো থাকায় সেটার উচ্চতা ছ'ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছিল। পালঙ্কে ওঠানামা করতে ছেলেবেলায় আমাদের যথেষ্ট কসরত করতে হত। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে বাড়ির সব খাট, পালঙ্ক এরকম উঁচু করে রাখা ছিল।

ভাঁটুমামা আসতে সন্ধ্যের পরে আড্ডায় জমজমাট হয়ে উঠল চন্দ্রনাথের ঘর। বিজিত আর ফুলের মালাকেও দয়াময়ী দু-একবার ডেকে নিত। আড্ডার টানে চিলেকোঠার ঘর ছেড়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে খুড়োও সেখানে হাজির হত। ভাঁটুমামা ছিল আড্ডার মধ্যমণি। অসুস্থ স্বামীকে ডাক্তার দেখিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিয়ে দশদিন পরে 'ফুলের মালা' তারকেশ্বরে ফিরে গেল। শোভেন চলে গিয়েছিল পাঁচদিন আগে। শ্রীরামপুরে সরকারি চাকরি করত সে। বাবার চিকিৎসা করাতে তিন দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিল। আমাদের বাড়িতে ছিল। তারকেশ্বরে ফেরার দিনে শোভেনই এল, মা-বাবাকে নিতে। ফুলের মালা চলে যাওয়ার পরে শুনলাম লতিকার সেজ মেয়ে পলার সঙ্গে শোভেনের বিয়ে পাকা হয়ে গেছে। বেলেঘাটায় লতিকার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দয়াময়ী কথা বলে এসেছে। লতিকা বেজায় খুশি। পলা অরাজি নয়। ভাইঝির জন্যে তার খুব মন কেমন করছে। দাদা-বৌদিকে নিতে শুক্রবার দুপুরে আমাদের বাড়িতে পলা আসবে।

নির্ধারিত শুক্রবার বিজুদা, বৌদি আর তাদের মেয়েকে পলা এসে নিয়ে যেতে সত্যি আমাদের বাড়ি খালি হয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকে, এবং যাওয়ার সময়ে দয়াময়ীর পায়ে হাত দিয়ে পলা প্রণাম করল। দয়াময়ীকে জড়িয়ে ধরে কমলাবৌদি কেঁদে ফেলল। আমাকে আড়ালে ডেকে বিজুদা বলল, তোর পরীক্ষা শেষ হলে আমি এখানে এসে ক'দিন থাকব। সারারাত গপ্পো হবে।

সদর দরজা পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দিয়ে আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকে বিছানায় আধশোয়া ভাঁটুমামাকে দয়াময়ী বলেছিল, ধন্যি তোমার মাথা! পলার বিয়েটা শেষ পর্যন্ত দিতে পারলাম। ঘটকালি পাবে তুমি। বিয়েতে তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে।

ঘোরলাগা চোখে দয়াময়ীর দিকে তাকিয়ে ভাঁটুমামা মুখ টিপে হাসল। গত কয়েক সন্ধেতে ভাঁড়ে করে রাবড়ি এনে বিজুদা কেন ভাঁটুমামাকে খাওয়াচ্ছিল, আমি খানিকটা অনুমান করলাম।

ছয়

ছাতার মত ঘরটার ভেতরে একচিলতে রোদ এসে পড়েছে। সিমেন্টের যে বেদিতে আমি বসে রয়েছি সেখানে এখনও রোদ পৌঁছায়নি। আকাশের আরও ওপরে সূর্য উঠলে রোদ হয়ত বেদি স্পর্শ করবে আলোর তেজ বাড়তে জলের ঘোলাটে রঙ অনেকটা বদলে গিয়ে আগের চেয়ে ঝকঝকে দেখাচ্ছে। গোল ঘরের চারপাশ জুড়ে কয়েকটা ঢ্যাঙা, ঝাঁকড়া গাছ ছায়া ছড়িয়েছে। গাছের ঘন পাতায় হাওয়া ঢুকে সিরসির আওয়াজ তুলছে। পাথরের বেদিটায় বসে, সেটার সঙ্গে আমি যেন জুড়ে গেছি। আমিও একটা পাথর, একটা গাছ। সবুজ পাতায় ভরে গেছে আমার হাত, পা সারা শরীর। মাটির নিচে নেমে গেছে আমার শেকড়। এখান থেকে আমি নড়তে পারব না। মাথায় ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে ঘুমে বুজে আসছে আমার দু'চোখ। আমাকে এখন ঘুমোলে চলবে না। আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকতে হবে। অনেকবার চেষ্টা করেও বিকাশকে দেখতে পেলাম না। বিকাশ কি মাঝগঙ্গায় সাঁতার কাটছে?

আমার পড়ার ঘরে তক্তাপোশে আধশোয়া ভাঁটুমামা আফিমের নেশায় ঝিমোচ্ছে। ভাঁটুমামার মাথার কাছে জানলার তেলেঞ্চিতে রয়েছে শালপাতা ঢাকা এক ভাঁড় রাবড়ি। বিজুদা সপরিবারে বেলেঘাটার বাড়িতে ফেরার আগে ভাঁটুমামার জন্যে রাবড়ি কিনে রেখে গেছে। সন্ধের অন্ধকার ঘন হলে আরও এক পুরিয়া আফিমের সঙ্গে ভাঁড় থেকে ছোট ছোট চুমুকে ভাঁটুমামা রাবড়ি খাবে। ভাঁড় শেষ হলে ভাঁটুমামার অন্য চেহারা। নড়বড়ে দেহটা বেতের মত টানটান হয়ে উঠবে। তক্তপোশে সোজা হয়ে চোখ বুজে ভাঁটুমামা তখন ধ্যানে বসবে। কয়েক মিনিট পরে চোখ খুললে দেখা যাবে, ভাঁটুমামার দৃষ্টি পরিষ্কার। চোখে নেশার ঘোর নেই। লুঙ্গি,গেঞ্জি, ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আমাদের বলবে, আমি একটু ঘুরে আসছি। তোমরা লেখাপড়া কর।

দশদিন ধরে দেখে ভাঁটুমামার চালচলন আমাদের চেনা হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাঁটুমামা কোথায় যায়,আমরা জেনে গিয়েছিলাম। চার-পাঁচদিন আগে এক সন্ধেতে ভাঁটুমামাকে দূর থেকে কিশলয় অনুসরণ করে শশিভূষণ দে স্ট্রিটে বাঁশরী পালের মিষ্টির দোকানে পৌঁছে গিয়েছিল। আফিমের নেশা আর ধ্যানের আবেশে ভাঁটুমামা এত বুঁদ হয়েছিল যে কিশলয় অনুসরণ করছে টের পায়নি। বাঁশরী পালের রসগোল্লা কিনে, রসগোল্লার ভাঁড়টা হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে কিশলয়ের দিকে বাড়িয়ে বলেছিল, গরম রসগোল্লা খেয়ে নাও।

কিশলয় হকচকিয়ে গিয়েছিল। ভাঁটুমামার দু'হাতের মধ্যে, দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কুলকুল করে ঘামছিল। ভাঁটুমামার মাথার পেছনে দুটো চোখ আছে নাকি, মানুষটা তার উপস্থিতি জানল কীভাবে, সে ভেবেছিল। চাপা হাসি ঠোঁটে ছড়িয়ে চুকচুক করে ভাঁটুমামা রাবড়ি খাচ্ছিল। রসগোল্লা দুটো কিশলয় সদ্ব্যবহার করেছিল। ভাঁটুমামার কাছে তার ধরা পড়ে যাওয়ার বিবরণ শুনে কিশলয়ের চেয়ে আমি কম অবাক হইনি। নিজে না গিয়ে ভাঁটুমামাকে অনুসরণ করতে আমিই পাঠিয়েছিলাম কিশলয়কে। ভাগ্য ভাল আমি যাইনি। খুব বেঁচে গেছি।

ভাঁটুমামা যে আফিম খায়, এবং নেশার মৌতাত ধরে রাখতে তার রাবড়ি লাগে,

আমরা জেনে গিয়েছিলাম। বাড়তি খবর দিয়েছিল দেবুমামা। দেবুমামা জানিয়েছিল, আফিমে আজকাল ভাঁটুবাবুর নেশা হচ্ছে না। নেশা করতে সাপের ছোবল নিতে হচ্ছে। সাপের ছোবল নেওয়ার সবচেয়ে বড় ঠেক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঘুটিয়ারি শরিফ। কলকাতার চিনেপাড়াতেও দু-একটা গোপন ঠেক আছে। সবগুলো ঠেকে ভাঁটুর যাতায়াত আছে। ঠেকদাররা সকলে তাকে চেনে। কেউটে সাপের বিষে তেজ কম হওয়ার জন্যে ভাঁটুমামা গোখরোর ছোবল নেয়। কেউটের চেয়ে গোখরোর বিষ ঘন। ভাল নেশা হয়। চব্বিশ পরগনার বিষের ঠেকদাররা প্রায় সকলে বেদে সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের কার ঘরে কতগুলো হাঁড়িতে কোন জাতের কতগুলো সাপ বন্দী করা আছে, নেশাখোররা জানে। পছন্দমত জায়গায় তারা চলে যায়। ছোবল পিছু পাঁচ সিকে লাগে। এই পাঁচ সিকে, বিষের দাম নয়, বিষহরির মানত। মা মনসার নাম করে হিন্দু, মুসলমান সব সম্প্রদায়ের বেদে মানত আদায় করার পরে নেশাখোরকে সাপের হাঁড়ির কাছে নিয়ে যায়। হাঁড়ির গায়ে একটা বা দুটো ফুটো থাকে। ফুটোতে কেউ হাতের পাতা, কেউ কবজি, কেউ কনুই রাখে। ছুঁচের মত সরু, সাপের চেরা জিভ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেই ফুটো দিয়ে ছোবল বসায়। ব্যস, কাজ হয়ে যায়। পাকা নেশাখোর, জিভের ডগায় ছোবল নেয়। আফিমের লাইসেন্সধারী ছাড়া, আর কাউকে ঠেকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। লাইসেন্স থাকলেও অচেনা লোককে সচরাচর হাঁড়ির কাছে কোনও ঠেকদার ঘেঁষতে দেয় না।

দেবুমামার খবর অনুযায়ী মাঝবয়সী এক বিধবা মহিলা ঠেকদারকে ভাঁটুমামা জীবনসঙ্গিনী করেছে। ঠেকদারনীর স্বামী মরেছে সাপের কামড়ে। তার ঘরেই ভাঁটুমামা থাকে। নেশা করতে খরচ লাগে না। থাকা খাওয়া ফ্রি।

দেবু বোসের সব কথা যে দয়াময়ী বিশ্বাস করত, এমন নয়। অরিন্দমের বিয়ের আগে, তার হবু শ্বশুর মোহিনী মজুমদার সম্পর্কে দেবু বোস যে খবর দিয়েছিল, তা মেলেনি। বনেদি বড়লোক মোহিনী সম্পর্কে দেবুমামা বলেছিল, বড়লোক না ঘোড়ার ডিম। ওপরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন। বাড়িটা পর্যন্ত চালতাবাগানের মহাজন বিরিঞ্চি সাহার কাছে বাঁধা পড়ে আছে।

দেবুমামার বিবরণকে বেদবাক্য ধরে নিয়ে মোহিনী মজুমদারের মেয়ে সুপর্ণার সঙ্গে অরিন্দমের বিয়ে বাতিল করার সিদ্ধান্ত দয়াময়ী যখন প্রায় পাকা করে ফেলেছে, তখনই জানতে পেরেছিল দেবুমামার খবর ঠিক নয়। বিরিঞ্চি সাহার কাছে মোহিনী মজুমদারের নয়, তার সেজ কাকা মহাদেব মজুমদারের বাড়ি বাঁধা পড়ে আছে। মোহিনী মজুমদার তখনও কলকাতায় তিনটে বাড়ির মালিক। সিনেমা হল আছে, লোহাকল আছে।

বিধবা বেদেনিকে ভাঁটুমামার বিয়ের খবর দয়াময়ী বিশ্বাস না করলেও এক সন্ধেতে চন্দ্রনাথের ঘরে বসে ভাঁটুমামাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সাপের বিষ ছাড়া তোমার নাকি নেশা হয় না?

ভাঁটুমামা বলেছিল, বিষ কোথায়, সব ভেজাল।

জবাব শুনে দয়াময়ী খুশি হয়নি। বলেছিল বুঝতে পারছি তুমি একটা অঘটন বাঁধাবে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে ভাঁটুমামা বলেছিল, বলেছিল, টানা এক বছর

না এলে, ধরে নিবি, আমি নেই।

দয়াময়ী কথা বাড়ায়নি। ভাঁটুমামা ঘর থেকে চলে যেতে দয়াময়ীকে চন্দ্রনাথ বলেছিল, ভাঁটুদাকে নেশা নিয়ে খোঁচাখুঁচি কর না। মানুষটা লজ্জা পায়।

দয়াময়ী চুপ করেছিল। তারপর ভাঁটুমামা দু-তিনবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল। শেষ দফায় ছ-সাত দিনের বেশি থাকেনি। তারপর ছ মাস, এক বছর, দেড় বছর কেটে যাওয়ার পরে ভাঁটুমামা যখন এল না, তখন এক দুপুরে দয়াময়ী তার বালিকা বয়সের বন্ধু 'ডার'-কে বলেছিল, আমার মন বলছে মানুষটা নেই। সাপের কামড়ে হয়ত মারা গেছে।

'ডার' সাড়া করেনি। ফুলের মালার মত ছেলেবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে দয়াময়ী 'ডার্লিং' সম্পর্ক পাতিয়েছিল। সংক্ষেপে বলত, ডার। ডারকে আমরা রানীমাসিমা বলে ডাকতাম। চাকদহের জমিদার, চিরঞ্জিত কুণ্ডুচৌধুরির সঙ্গে রানীমাসিমার বিয়ে হয়। বিশাল ভূসম্পত্তি, প্রচুর টাকা, কুণ্ডুচৌধুরি পরিবারের বিত্ত বৈভবের শেষ ছিলনা। সেই সঙ্গে ছিল আভিজাত্য ক্যাডিলাক গাড়ি চেপে দয়াময়ীর সঙ্গে রানীমাসিমা দেখা করতে আসত। রানীমাসিমার ভাল নাম শ্রীধারা হলেও আমরা আড়ালে তাকে একশো চুয়াল্লিশ ধারা বলতাম। রানীমাসিমার নাম একশো চুয়াল্লিশ ধারা কে রেখেছিল, জানি না। কেউ বলে দেবু বোস, কেউ বলে চন্দ্রনাথের বন্ধু যতীন সামন্ত। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে, যখন সরকারি নিষেধ না মেনে পাঁচজন একসঙ্গে হাঁটলে একশো চুয়াল্লিশ ধারায় গ্রেপ্তার করা হত, তখনই নাকি শ্রীধারার এই নামকরণ হয়। শ্রীধারার বপু ছিল পাঁচজনের সমান। নিষিদ্ধ এলাকায় সে একা গেলেই আইন ভাঙার অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে, এই ছিল নামকরণকারীদের ব্যাখ্যা। ক্যাডিলাক গাড়ির পেছনে সে বসলে আর জায়গা থাকত না। দয়াময়ী তার প্রিয় 'ডার'কে নিয়ে রঙ্গতামাশা পছন্দ করত না। তার সামনে একশো চুয়াল্লিশ ধারা কথাটা উচ্চারণ করার সাহস কারও ছিল না। রানীমাসিমাকে আমার মনে রাখার কারণ, তার চিঠি। বছরে দয়াময়ীকে দু'বার, নববর্ষ আর বিজয়া দশমীতে রানীমাসিমা চিঠি লিখত। চিঠি লিখত পোস্টকার্ডে। ছোট্ট একটা কার্ডে, রানীমাসিমা কম করে আড়াইশো শব্দের চিঠি লিখত। মুক্তোর মত হাতের লেখা, প্রতিটি হরফ সমান, পড়তে সামান্য অসুবিধে হতনা। চিঠি শুরু হত 'ভাই ডার' সম্বোধন করে, এবং শেষ হত 'তোমার ডার' লিখে। রানীমাসিমার দুটো চিঠি অনেকদিন আমি যত্ন করে রাখার পরে কোথায় যে হারিয়ে গেল জানিনা। তবে যার অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করতাম, সে ভাঁটুমামা। চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ আমি ঘটিয়ে দিয়েছিলাম, আমার বিশ্বাস ভাঁটুমামা এলে তা মিটে যেত। লেবুতলার বাড়িতে যতদিন ছিলাম, আশা করতাম ভাঁটুমামা এলে দয়াময়ী চন্দ্রনাথের মিটমাট হয়ে যাবে। আমি পাপমুক্ত হব। ভাঁটুমামা আসেনি।

ভাঁটুমামা পৃথিবীতে নেই জানার পরেও কেন মানুষটার পথ চেয়ে আমি বসেছিলাম, জানি না। আমার ধারণা, চন্দ্রনাথও আমার মত ভাঁটুমামার কথা ভাবত। মানুষটা এলে সংসারের ঝামেলা মিটে যাবে, আশা করত। দয়াময়ীর মনে কী ছিল, জানি না। দু'বছর একটানা মানুষটা না আসায়, সে যে পৃথিবীতে নেই, দয়াময়ী ধরে নিয়েছিল। ভাঁটুমামা সেই নির্দেশ দয়াময়ীকে দিয়ে গিয়েছিল। ভাঁটুমামার কাছে দয়াময়ীর হয়ত

আর কোনও প্রত্যাশা ছিল না। চন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কের ফাটল যে এ জীবনে জোড়া লাগবে না, এমন বিশ্বাস তার হয়েছিল। ফাটল জোড়া দেওয়ার সাধ্য ভাঁটুমামারও নেই। দুজনের মধ্যে দূরত্ব রোজ বাড়ছিল। অসহায়ের মত দেখা ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না।

চন্দ্রনাথের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলত। দোতলায় প্রায় মুখোমুখি ঘর ছিল আমাদের। ঘরের দরজা বন্ধ করে রাতে আমি ঘুমোতাম। বিয়ের আগে থেকেই দরজা বন্ধ না করলে আমার ঘুম হত না। বিয়ের পরে, নববধূ নিয়ে দরজা খুলে কেউ শোয় না। ঘরের কপাট বন্ধ করে ডবল ছিটকিনি আটকায়। আমিও আটকাতাম। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে চন্দ্রনাথের ঘরের দরজা কখনও ভেতর থেকে বন্ধ দেখিনি। দয়াময়ী শলাপরামর্শ করতে এলে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিত। দরজা খোলা, অথবা ভেজানো যাই থাকুক, ঘরে আলো জ্বলত। চন্দ্রনাথ জেগে রয়েছে বুঝতে অসুবিধে হত না। খোলা দরজা দিয়ে রাত বারোটায় হিসেবের খাতা বিছানায় রেখে মন দিয়ে চন্দ্রনাথকে কাজ করতে দেখেছি। ভোর চারটেতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছি, চন্দ্রনাথের ঘরে আলো জ্বলছে। পাঁচটায় কলঘরে যাওয়ার পথে দেখেছি, খোলা জানলা দিয়ে আকাশে শুকতারার দিকে চন্দ্রনাথ তাকিয়ে রয়েছে। কিছু ভাবত। আমার পায়ের আওয়াজ তার কানে যেত না। আমিও যতটা সম্ভব শব্দ না করে কলঘরে যেতাম। কখনও মুখোমুখি হয়ে গেলে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করত, ঘুম ভেঙে গেল নাকি?

ঘুম জড়ানো গলায় কিছু বলে বিছানায় ফিরে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে ভোররাতের ঘটনা কিছুই মনে থাকত না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে চন্দ্রনাথকে কখনও ঘুমোতে দেখিনি। শেষরাতে, ভোরে, সকালে, দুপুরে রাতে, সবসময়ে চন্দ্রনাথকে জেগে থাকতে দেখে ছোটবেলায় আমার ধারণা হয়েছিল, বাবারা ঘুমোয় না। তাদের ঘুমোনোর দরকার হয় না। সংসারের দিকে তাকিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা জেগে বসে থাকাই তাদের কাজ। আমাকে দেখে চুমকিও এখন হয়ত তাই ভাবে। চুমকি ঘুমোনোর আগে আমার শোয়ার সুযোগ হয় না। জেগেও উঠি তার ঘুম ভাঙার আগে। প্রত্যেক প্রজন্মের মাথার কাছে তার পূর্বপুরুষ জেগে বসে থাকে। কেউ একজন সবসময়ে জেগে আছে। পূর্বপুরুষ মানে মা, বাবা ঠাকুরদা আর তীর্থের কাক। সময় হল তীর্থের কাক, ছেলেমেয়েদের তারা পাহারা দেয়। আগলে রাখে।

দয়াময়ীর সঙ্গে বিভেদের হাঁ মুখটা বাড়ার সঙ্গে চন্দ্রনাথের চোখের ঘুম চিরকালের জন্যে চলে গেল। তিনতলার ঘরে থাকত দয়াময়ী। দয়াময়ীও শান্তিতে ঘুমোত না। রাতে, আমার ঘুম কখনও পাতলা হয়ে এলে তিনতলায় সন্তর্পণে কারও হেঁটে চলার আওয়াজ পেতাম। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাতে তিনতলা থেকে খুটখাট শব্দ ভেসে আসত। দেবপ্রতিমের বিয়ের আগে তিনতলায় নতুন দুটো ঘর উঠেছিল। দুটো ঘরের মেঝে ছিল শ্বেতপাথরে তৈরি। একটা ঘরে দয়াময়ী থাকতে শুরু করেছিল। তিনতলায় দয়াময়ীর সামনের ঘরে বৌ-ছেলে নিয়ে থাকত দেবপ্রতিম। অসাড়ে ঘুমোত তারা। তাদের পাশের ঘরে কিশলয়ের ঘুমেও ঘাটতি ছিল না। বাড়ির দোতলা, তিনতলায় জেগে থাকত শুধু চন্দ্রনাথ আর দয়াময়ী। দুজনের কেউই ঘুমকাতুরে ছিল না। জীবনের

বেশি সময় দুজনে জেগে কাটিয়েছে। সংসার জীবনের শুরুতে আনন্দে জেগেছে, শেষ দিকে অশান্তিতে ঘুমোতে পারত না। তাদের জেগে থাকা টের পেয়ে আমার ঘুম ছুটে যেত।

আকাশের অনেকটা ওপরে সূর্য উঠে এসেছে। রোদের ফালি সিমেন্টের বেদি ছুঁয়ে ঘরের চাতালের শেষ পর্যন্ত চলেগেছে। গঙ্গার ঘাটে এখন তর্পণকারীর সংখ্যা, সারা সকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। হইচই বেড়েছে। বিকাশ ঠিক কোথায় আছে, আমি বুঝতে পারলাম না। মনে মনে বললাম, বাবা তুমি পৃথিবীতে নেই। আমি তর্পণ করলে আমার দেওয়া অর্ঘ্য, জল তোমার কাছে পৌঁছত না। তবু তোমাকে ভুলিনি, মা তর্পণ না করলেও তোমাকে মনে রেখেছি। তোমাদের মত সংসারের দায়িত্ব পালন করে চলেছি। আত্মীয়, বন্ধু, সমাজের সঙ্গে সাধ্যমত মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করছি। তোমাদের মত সর্বস্ব দিয়ে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে না পারলেও তাদের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমার হাত খুব লম্বা নয়, শক্তসমর্থ নয়, তবু গুটিয়ে রাখিনি। কারও ক্ষতি করিনি। কারও অমঙ্গল চাইনি। জীবনের নিয়মকে আমার মত করে মেনে চলেছি। বড় কোনও ব্রত নিয়ে ভাবার, তা পালন করার সাধ্য না থাকলেও জীবনের ছোটখাটো দায়গুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে আসিনি। যা করেছি, এবং যা করতে পারিনি, আমার ভালমন্দ, পাপতাপ, সব তোমাদের দিয়ে বেঁচে আছি। আমি জানি, তোমরা ঘিরে আছ আমাকে। তোমাদের আশীর্বাদ, আমার মাথার ওপর সব সময় ঝরে পড়ছে।

সাত

মা, সংসার ছিল তোমার চোখের মণি, তোমার ঠাকুরঘর। ব্রতপালন করার মত মন দিয়ে সংসার করেছ। তোমার কান্ড দেখে মাঝে মাঝে আমরা হাসতাম, কখনও চটে যেতাম। শিয়ালদা স্টেশন থেকে দুটো হাভাতে মেয়েকে বাড়িতে এনে ভরণপোষণ দিয়ে ঠোঙা বানানোর শিক্ষানবিশি তুমি চালু করলে হাসা ছাড়া আমরা কী করতে পারতাম? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি চাইতে তাদের স্বনির্ভর করতে। তুমি পারতে না। ঝাঁটার কাঠির পাহাড়, দড়ি, কাঠের টুকরো কিনে এনে কখনও চারজন অচেনা মেয়েকে ঝাঁটা বানানো শেখাতে। তারা শিখত না। শিখলেও স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছে দেখাত না। নিজের হাতে এক ডজন ঝাঁটা বানিয়ে, সেগুলো নিয়ে বাজারে বেচতে যেতে চাইত না। বাড়িতে কয়েকদিন থেকে তারপর এক এক করে তারা চলে গেলেও তুমি দমতে না। আমরা হাসতাম। লেবুতলা পার্ক থেকে এক সকালে, এক পাগলকে, নাম নিমাই, ধরে আনতে আমরা চটেছিলাম। পাগল এই প্রথম। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করিনি। এরকম কতজন আগে এসেছে, হিসেব নেই। তারা সকলে অভাবী, কেউ খেতে পায় না, কারও মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, কঠিন রোগে কারও বাবা মরোমরো, কেউ নিজে মরতে বসেছে, দয়াময়ীর দরজা সকলের জন্যে খোলা। দয়াময়ীর কাছ থেকে কমবেশি সাহায্য সবাই পেয়েছে।

লেবুতলা পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেয়েদের বসার জন্য আলাদা ঘেরা জায়গা ছিল। সেটা ছিল লেডিস পার্ক, উদ্যানে মেয়েদের অংশ। পাড়ার গিন্নিরা সেখানে নিজেদের একটা ক্লাব গড়ে তুলেছিল। সন্ধের পরে সেখানে তাদের মজলিশ বসত। মজলিশের মাথা ছিল দয়াময়ী, সবাই বলত সেনগিন্নি। আমার বন্ধু, বীরুর মা, চৌধুরিগিন্নি ছিল সেনগিন্নির সহকারী। পিপুলের মেজমাসির পরিচয় ছিল দত্তগিন্নি, এরকম সামন্তগিন্নি, ডাক্তারগিন্নি, তেওয়ারি বহিন এবং আরও কতজনের বিবরণ চন্দ্রনাথকে দয়াময়ী শোনাত, তার হিসেব নেই। অল্পস্বল্প, পাশের ঘরে আমার কানেও আসত। আমাদের বাড়িতেও বছরে এক-দুবার গিন্নিদের আসর বসত। সত্যনারায়ণ পুজোর নাম করে বছরে একবার, গিন্নিদের বাড়িতে ডেকে দয়াময়ী খাওয়াত, আর একটা দিন, মাঘের দুপুরে গিন্নিরা চাঁদা তুলে আমাদের ছাতে চড়ুইভাতি করত। সেখানে দয়াময়ীর অতিথি হিসেবে হাজির থাকত তার মা অঘোরবালা, দুই মেয়ে বীথিকা আর বিপাশা। গিন্নিদের বয়স পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হওয়ায় বৃদ্ধা অঘোরবালাও সঙ্গি নী পেয়ে যেত। তাদের কলকাকলিতে সেই দুপুরে বাড়ির ছাতে কাক-চিল বসত না। বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে মাঘের শীত পালিয়ে যেত।

পাগল নিমাইকে বাড়িতে এনে দয়াময়ী সসঙ্কোচে বলেছিল, ফাইফরমাশ খাটার জন্যে কমবয়সী একটা ছেলে দরকার ছিল। নিমাইকে পেয়ে গেলাম, আর চিন্তা নেই।

কয়েক মাস ধরে লেবুতলা পার্কের বেঞ্চিতে বসে সারাদিন যে ছেলেটা মাথা ঝাঁকায়, আপন মনে বকবক করে, মুখ দিয়ে যার লালা গড়ায়, নাম না জানলেও আমরা সকলে তাকে দেখেছি। মুখ চিনতাম। সেই বদ্ধ পাগলকে, কাজ দিয়ে দয়াময়ী বাড়িতে আনতে, আমাদের মুখে কথা জোগাল না। তবে নিমাই যে মারকুটে পাগল ছিল না, এটা জানা থাকায় আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। ব্যাজার মুখে দেবপ্রতিম বলেছিল, আমাদের বাড়ির জন্যে পাগলই ভাল।

নিমাইকে দিয়ে গৃহস্থালির কাজ কিছু হবে না, চন্দ্রনাথও আন্দাজ করেছিল। পাগলটাকে দয়াময়ী কেন বাড়িতে এনেছে, টের পেতেও অসুবিধা হয়নি। চন্দ্রনাথের অনুমান নির্ভুল ছিল। দয়াময়ীর উদ্দেশ্য জানাজানি হতে সময় লাগল না। দয়াময়ী ধরা পড়ে গেল। গোপন খবরটা ফাঁস করে দিল দেবপ্রতিম। রিকশায় পাগল নিমাইকে পাশে বসিয়ে নীলরতন সরকার হাসপাতালে দয়াময়ীকে সে ঢুকতে দেখেছিল। গাঁটের পয়সা খরচ করে দয়াময়ী যে পাগলের চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছে এবং সে কারণেই নিমাইকে বাড়িতে এনেছে, আমরা বুঝে গেলাম। দয়াময়ীকে কিছু বলার সাহস আমাদের ছিল না। সংসার চলত দয়াময়ীর কথাতে। সেখানে চন্দ্রনাথেরও নাক গলানোর উপায় ছিল না।

চিকিৎসায় নিমাইয়ের উপকার হল। মাথার ওপর থেকে অদৃশ্য এক বোঝা নামানোর জন্যে যে সারাদিন হাজার বার পাগলের মত মাথা ঝাঁকাত, তার মাথা ঝাঁকানো কমে এল। মুখ দিয়ে অনর্গল লালা পড়াও প্রায় বন্ধ হল। আমাদের বাড়িতে তার থাকার তিন মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই যে কারণে তাকে আনা হয়েছিল, তার কিছুটা বাস্তবায়িত হল। ছোটখাটো ফাইফরমাশ খাটতে থাকল সে। রাত দশটায় দেবপ্রতিমের জন্যে একবার সিগারেটও কিনে আনল। দয়াময়ী জানতে পেরে, দিনের

যে কোনও সময়ে কাজের লোক দিয়ে সিগারেট আনানোতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। দেবপ্রতিম রাগে গজগজ করলেও সন্ধের পরে নিমাইকে দ্বিতীয়বার সিগারেট কিনতে পাঠাতে সাহস পেল না। বোবা নিমাইয়ের মুখে তখন কথা ফুটেছে। প্রথম যে কথাটা সে বলেছিল, তা 'মা'। দয়াময়ীকে 'মা' বলে ডেকেছিল। আমাদের বাড়ির ওড়িয়া পাচক দাশরথীর দেখাদেখি 'মা' শব্দটা নিমাই উচ্চারণ করেছিল। তার অবশ স্বরনালীর বন্ধ দরজা, একাক্ষর এই শব্দটা বলার পরে খুলে যেতে আমরা জানলাম সে বোবা নয়। সে গোঙা নয়। কথা বলতে না পারার যন্ত্রণায় সে গোঙাত। ছেলেবেলায় সে কথা বলতে শিখেছিল এবং বলত। কোনও একটা রোগে তার মাথা অকেজো, বাগ্‌যন্ত্র অবশ হয়ে পড়ে। কথা বলতে সে ভুলে যায়। তার কথা বলার ইচ্ছে দাশরথী জাগিয়ে দিয়েছিল। নিমাইকে ছোটভাইয়ের মত বুকে টেনে নিয়েছিল সে। দাশরথী বলত, পাগলা তো আমার ভাই বটেই। একই মায়ের ছেলে আমরা।

দয়াময়ীকে দাশরথীও মা বলত। নিমাইকে কথা বলানো, সুস্থ করার দায়িত্ব তাকে দিয়েছিল দয়াময়ী। মায়ের হুকুমমত কাজ করতে দাশরথী সামান্য গাফিলতি করেনি। আঠার বছর বয়সে সে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। আমার বয়স তখনও দশ হয়নি। তারপর দয়াময়ীর আঁচলের তলায় বারো-তের বছর কাটিয়েছে। তাকে হাতে ধরে সবরকম রান্না শিখিয়েছিল দয়াময়ী। দয়াময়ীর এমন ন্যাওটা সে হয়ে গিয়েছিল, যে দেশে যেত না। বারো বছরে হাতে গুনে দেশে গেছে কয়েকবার। বছর খানেক আগে শেষ গিয়েছিল বিয়ে করতে। তারপর দু'বার প্রায় জোর করে তাকে দেশে পাঠিয়েছে দয়াময়ী। দাশরথীর বদলে দু'দফায় যারা রান্না করেছে, তাদের তৈরি ভাত-তরকারি খেয়ে আমাদের খাওয়ার ইচ্ছে চলে গিয়েছিল। অরুচি এসেছিল খাবারে। মুখে কিছু বলতে পারিনি। সে উপায় ছিল না। পাচক দাশরথী যে স্বামী, কটকে তার ঘরে যে নববধূ রয়েছে, এসব বিবরণ দয়াময়ী যে ভাষাতে শোনাত, তারপর কিছু বলার থাকত না। খাওয়াতে আমাদের অভক্তি কাটাতে দয়াময়ী মাঝে মাঝে রাঁধত। সর্বংসহা মায়ের কষ্ট দেখেও আমরা সেদিকে তাকাতাম না। পেট ভরে খেয়ে, আরামে ঢেকুর তুলতাম। খুশিতে উজ্জ্বল হত দয়াময়ীর মুখ। দাশরথী না আসা পর্যন্ত উনুনের ধারে যেতে চিকিৎসকের নিষেধের কথা দয়াময়ী ভুলে যেত। আমরাও মনে করাতাম না। আমরা জানতাম না যে ভোজনসুখের দিন শেষ হয়ে এসেছে। অসুস্থ নিমাই সেরে উঠলেও অন্য দিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘটনাটা শুনলাম। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি দাশরথী যে দেশে যাচ্ছে, আর ফিরবে না। কলকাতার এক নামি সেলাই স্কুল থেকে দু'বছরের ডিপ্লোমা পেয়ে সে পাস করেছে। স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিয়েছিল দয়াময়ী। দু'বছর ধরে স্কুলের মাইনে, সেলাই করার যত সরঞ্জাম দয়াময়ী জুগিয়েছে। কটকে দোকানঘর করার সব খরচও দিয়েছে দয়াময়ী। শুভ পয়লা বৈশাখ দোকান খোলার জন্যে তাকে প্রায় জোর করে দয়াময়ী কটকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দাশরথী কাঁদতে কাঁদতে দেশে ফিরে গেল। দয়াময়ী বলল, বাবা হয়েছিস। ছেলেকেও মানুষ করতে হবে। চোখের সামনে বাবাকে না পেলে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না।

দাশরথী চলে যেতে আমরা বেশ কিছুদিনের মত অসহায় হয়ে গেলাম। খাওয়ায় রুচি থাকল না। নিত্যনতুন পাচক আসতে লাগল বাড়িতে। পাঁচ-সাতদিনের বেশি

কেউ থাকছিল না। কারও রান্না আমাদের পছন্দ হচ্ছিল না। আমরাই কৌশল করে তাদের সরিয়ে দিচ্ছিলাম। দাশরথীর মত ফিটফাট, সুদর্শন আর একজন ওড়িশাবাসী ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রতীক্ষা করছিলাম। দ্বিতীয় দাশরথী যে মিলবে না, আমরা ভাবতে পারছিলাম না। দাশরথী চলে যেতে নিমাই একা হয়ে গেল। তখনও সে ষোলআনা সুস্থ হয়নি। হাসপাতালে নিয়মিত যেতে না হলেও ওষুধ খেতে হচ্ছিল। সময়মত ওষুধ নিজে নিয়ে খেত। ঠিকমত খাচ্ছে কিনা, দাশরথী নজর রাখত। দয়াময়ী এ দায়িত্ব তাকে দিয়েছিল। দাশরথী চলে যেতে নিমাইয়ের ওপর নজর রাখার কেউ থাকল না। গৃহস্থালীর কাজকর্ম করত যে চাঁপার মা, সে এক দুপুরে দেখল, চড়া রোদে ছাতে বসে পাগলের মত নিমাই মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তার দু'কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। চাঁপার মা ভয় পেয়ে দয়াময়ীকে ডেকে এনেছিল। নিমাইকে দেখে, তার কী হয়েছে, দয়াময়ী তখনই বুঝে গিয়েছিল। কালো হয়ে গিয়েছিল দয়াময়ীর মুখ। পাগল ছেলেটাকে পুরো সুস্থ না করে দাশরথীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে আপসোস হয়েছিল। চাঁপার মাকে নিয়ে দয়াময়ী ছাতে এসেছে, খেয়াল করার অবস্থা নিমাইয়ের ছিল না। দয়াময়ী নাম ধরে ডাকতে প্রথমে সে শুনতে পেল না। দ্বিতীয়বারে খেয়াল করে, দয়াময়ীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। নিমাইয়ের হাত ধরে ছাত থেকে তাকে নামিয়ে আনল দয়াময়ী। একতলায় নিমাইয়ের ঘরে ঢুকে চাঁপার মা নিয়ে এল ওষুধের দুটো শিশি। শিশি খুলে দয়াময়ী জানতে পারল, এক মাসের বেশি নিমাই ওষুধ খাচ্ছে না। তার পুরনো রোগ জাঁকিয়ে ফিরে এসেছে। দয়াময়ীকে মা বলত, সেটাও সে ভুলে গেছে।

নিমাইকে নিয়ে দয়াময়ীর আবার হাসপাতালে যাওয়া শুরু হল। সংসার সামলাতে দয়াময়ী তখন নাজেহাল হচ্ছে। পছন্দমত রান্নার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। জেলেপাড়ার বস্তিবাসিনী, আদুরি নামে যে বৌটা সকাল, দুপুর বাসন মাজত, সে প্রায়ই ডুব দিচ্ছে। তার চোলাইখোর স্বামী, তাকে প্রায়ই রাতে এমন পেটাচ্ছে যে, সকালে তার নড়ার ক্ষমতা থাকছে না। লেডিস পার্কের তিন জাঁদরেল গিন্নিকে নিয়ে, জেলেপাড়ায় আদুরির বস্তির ঘরে ঢুকে, তার স্বামী পলানকে দয়াময়ী দু'বার কড়কে দিয়ে এসেছিল। আদুরির গায়ে হাত দিলে পলানকে যে হাজতে থাকতে হবে, জানাতে ভোলেনি। পলান নাকে-কানে হাত দিয়ে দোষ স্বীকার করে জীবনে এমন অপরাধ আর করবে না, শপথ করেছিল। দুবারই এক কথা বলেছিল। কথা রাখেনি। দশ-পনের দিন শান্ত থেকে পলান ফের বৌ পেটাতে শুরু করেছিল। খবরটা শুনে আদুরিকে নিজের বাড়িতে এনে দয়াময়ী রাখতে চেয়েছিল। পলানকে ছেড়ে আদুরি আসতে চায়নি। দয়াময়ী হাল ছেড়ে পরিষ্কার করে কাচা সাদা শার্ট, ধুতি, এক পাচক এল আমাদের বাড়িতে। বাগবাজার থেকে, খুড়ো অর্থাৎ, বামাপদ সরকারের লেখা চিঠি নিয়ে দয়াময়ীর সঙ্গে দেখা করেছিল। খুড়োর চিঠিতে লেখা ছিল, পত্রবাহকের নাম নন্দলাল পানিগ্রাহী। বয়স চল্লিশ। ওড়িয়া ব্রাহ্মণ। কলকাতার রাজভবনে, রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর রাঁধুনি ছিল। পদ্মজা দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পরে নন্দলাল গ্র্যান্ড হোটেলের রসুইখানাতেও কিছুদিন কাজ করেছে। মালাইচাকি প্লাস্টার করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খুড়ো শয্যাশায়ী থাকার সময়ে সেই ওয়ার্ডে নন্দলাল ভর্তি ছিল। গ্রন্থিসংক্রান্ত কোনও রোগে দেহে এমন সিরসিরানি

ধরেছিল যে জামা পর্যন্ত পরতে পারতো না। কাতুকুতু অনুভব করত। সে যে পাকা রাঁধুনি, এ নিয়ে খুড়োর সন্দেহ নেই। নন্দলালকে পেয়ে মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার রান্না আমাদেরও খারাপ লাগল না। তবে দাশরথীকে টেক্কা দেওয়া যে নন্দলালের পক্ষে সম্ভব নয়, কয়েকদিনে আমরা বুঝে গেলাম। মানুষটা খারাপ ছিল না। মুখে মিটিমিটি হাসি লেগেই থাকত। চালচলনে ছিল ললিতলবঙ্গলতা ভঙ্গি। চাউনিটাও স্বাভাবিক ছিল না। নন্দলালের চোখে চোখ পড়লে অস্বস্তিতে কেন জানি না, আমি গুটিয়ে যেতাম। সাতদিন কাজ করার পরে নন্দলাল এমন একটা ঘটনা ঘটাল, যা বাড়িতে হাসির শব্দহীন তুফান তুললেও খোলাখুলি কেউ হাসতে পারল না। রান্নাঘরে সেই দুপুরে, চন্দ্রনাথ একা খেতে বসেছিল। দয়মায়ী তখনও নিমাইকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। বিপাশা কলেজে গিয়েছিল। দেবপ্রতিম বাড়িতে ছিল না। স্নান সেরে আমি ঘরে ফিরেই চাঁপার মায়ের চিৎকার শুনে, কী ঘটেছে দেখতে দৌড়ে খাবার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। যা দেখলাম এবং যতটা বুঝলাম, তা চলচ্ছক্তিহীন করে দিল আমাকে। চন্দ্রনাথ খাওয়া শেষ না করে তখন উঠে পড়েছে। হাতে তালি বাজিয়ে নেচে নেচে নন্দলাল গান গাইছে। ওড়িয়া গান। গানের একটা লাইন, 'দেশো ছাড়ি দুখো পাইচি কতা।' তার হাতের তালি থেকে তবলার বোলের মত যে আওয়াজ বেরচ্ছে, পাকা হিজড়েই তা বার করতে পারে। আমি পৌঁছতে কোমরে ঢেউ তুলে নন্দলাল জিজ্ঞেস করল, কি গ' বাবু, তুমিও একটু দেখবে নাকি আমার লাচ। তার চেরা কণ্ঠস্বর সেই প্রথম আমার কানে ধাক্কা দিল। নন্দলালের দিকে তাকাতে, তার চোখে হিন্দি ছায়াছবির নায়িকার কটাক্ষ দেখতে পেলাম। আমি তখন ভয়ে কাঁপছি। নিমাইকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে দয়ামরী ফিরতে বুকে বল পেলাম। খাওয়ার ঘরের সামনে স্থির হয়ে দয়াময়ী কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াল। নন্দলাল তখন নাচ থামিয়েছে। এক নজরে সকলের মুখ দেখে নিয়ে দয়াময়ী সোজা চন্দ্রনাথের ঘরে গেল। ঘটনাটা দয়াময়ীকে শোনানোর জন্যে চাঁপার মায়ের পেটের ভেতরটা আইঢাই করলেও সে-সুযোগ সে পেল না। বিকেলে নন্দলালকে সাতদিনের মাইনের সঙ্গে বাড়তি পঞ্চাশ টাকা, একটা নতুন ধুতি দিয়ে, বিদায় করা হল। চন্দ্রনাথ এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, দুপুরে কাজে বেরতে পারলনা। ঘটনাটা পরে বিশদে জেনেছিলাম। চন্দ্রনাথ খেতে শুরু করার পরে নন্দলাল মিহি গলায় বলেছিল, আমি লাচতে পারি, গাইতে পারি। চন্দ্রনাথ বলেছিল, তাই নাকি? বেশ।

হ্যাঁ গ' বাবু। শুনবেন নাকি?

চন্দ্রনাথ অবাক হয়ে থালা থেকে চোখ তুলে তাকাতে, নন্দলাল তার ধুতির একটা প্রান্ত ঘোমটার মত কপালের ওপর রেখে দু'হাতে তালি বাজিয়ে নাচতে শুরু করেছিল। তালির অদ্ভুত শব্দের সঙ্গে সেই গান, 'দেশো ছাড়ি দুখো পাইচি কতা'। চন্দ্রনাথের খাওয়া মাথায় উঠেছিল।

চার-পাঁচদিন পরে, এক বিকেলে বাগবাজার থেকে রিকশা চেপে, খুড়ো এল আমাদের বাড়িতে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখে কালো চশমা, প্যান্ট, শার্ট পরা হিসেবহীন বয়সের মানুষটাকে রিকশা থেকে লাঠি হাতে নামতে দেখে আমি অনুভব করলাম, বাড়ির আবহাওয়া খারাপ হতে দেরি নেই। খুড়োকে আজ ভালোরকম ধাতানি দেবে

দয়াময়ী। বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকে এলাম। তিনতলায় নিজের ঘর থেকে দয়াময়ী রোজ এই সময়ে দোতলায় নেমে আসে। চন্দ্রনাথের ঘরে বসে চা খেয়ে একতলায় যায়। রান্না তদারকি করে। লাঠি ঠুকঠুক করে সিঁড়ি দিয়ে খুড়ো দোতলায় উঠছে। কান খাড়া করে আমি বসে থাকলাম। সিঁড়ির মুখ থেকে খুড়ো হাঁক দিল, দয়াময়ী, ও দয়া, কোথায় তুই?

ঘরের দরজায় এসে আমি দেখলাম খুড়োর সামনে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। খুড়ো জিজ্ঞেস করল, কেমন রাঁধছে নন্দলাল? দয়াময়ী চুপ। খুড়ো বলল, মোগলাই, ইংলিশ, চিনা, সবরকম রান্নায় নন্দলাল ওস্তাদ। ওর হাতের মাটন বিরিয়ানি একদিন খাব।

দয়াময়ী বলল, ওকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

কেন?

কালো চশমা লাগানো মুখটা তুলে খুড়ো তাকাতে দয়াময়ী বলল, আমাদের বাড়িতে তোমার লোক পাঠানোর দরকার নেই।

দয়াময়ীর গলার ঝাঁঝ টের পেতে খুড়োর অসুবিধে হল না। ঘাবড়াবার লোক সে নয়। দয়াময়ীর ঠাকুর্দার সঙ্গে চাকরি করেছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, বুঝেছি।

দোতলার দালানে পাতা একটা চেয়ারে খুড়ো বসতে গ্লাস ভরে জল দিয়ে গেল চাঁপার মা। জল খেয়ে খুড়ো বলল, সব জেনেই নন্দলালকে পাঠিয়েছিলাম। এই সম্প্রদায়ের মানুষরা সেরা রাঁধুনি হয়। ম্যাকফার্লেন সাহেব বলতেন একথা। আমাদের রামায়ণ, মহাভারতেও নাকি লেখা আছে। ম্যাকফার্নেলের কাছ থেকে শুনে রামায়ণ, মহাভারতে লেখা হয়েছিল, না, রামায়ণ, মহাভারত পড়ে ঘটনাটা ম্যাকফার্লেন জেনেছিল, আমি জানি না। তাকে জিজ্ঞেস করার সাহসও আমার ছিল না। সাহেব ছিল, আমাদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তোর ঠাকুর্দা চিনত ম্যাকফার্লেনকে।

দয়াময়ী সাড়া করেনি। দয়াময়ীর সামনে বসে ঘণ্টাখানেক বকবক করে, গোল্ডেনভ্যালি রেস্টুরেন্টের ফাউল কাটলেট আর চা খেয়ে, দয়াময়ীর কাছ থেকে যাতায়াতের রিকশাভাড়া নিয়ে, সন্ধ্যা নামতে খুড়ো চলে গেল। রাস্তায়, বাগাবাজারের রিকশা অপেক্ষা করছিল। মাসে দু'দিন, বাগবাজার থেকে বৌবাজারে খুড়োর যাতায়াতের রিকশাভাড়া দয়াময়ী দিত। খুড়োকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না দেবু বোস। দেবুমামা আছে জানলে, খুড়ো, আমাদের বাড়িতে ঢুকত না। কাছাকাছি কোনও বারান্দা ঢাকা রোয়াকে দেবুমামা চলে না যাওয়া পর্যন্ত বসে থাকত। খুড়োকে কেন দেবুমামা অপছন্দ করত জানি না। দয়াময়ী হয়ত জানত। তাকে কখনও জিজ্ঞেস করিনি। আমাদের বাড়িতে ভাঁটুমামা এলেও দেবু বোস অখুশি হত। তার আসা কমে যেত। গম্ভীর মুখে এসে, পাঁচ-সাত মিনিট, দয়াময়ীর সঙ্গে কথা বলে আরও গম্ভীর মুখ করে আমাদের বাড়ি ছাড়ত। অবিবাহিত দেবুমামা ছিল সাত্ত্বিক। কোনও নেশা করত না। ভুল বলা হল। নিজের হাতে খৈনি বানিয়ে ডিবে ভরে রেখে দিত। খৈনি খেত। এটাই ছিল তার একমাত্র নেশা। আমরা, দয়াময়ীর ছয় ছেলেমেয়ে ছিলাম তার প্রাণ। নেশাখোর ভাঁটুর প্রভাব দয়াময়ীর ছেলেদের ওপর পড়তে পারে, এই ছিল দেবুমামার ভয়। আমাদের ভালর জন্যে দেবুমামা সবকিছু করতে পারত।

আট

ছাতার মত ছোট ঘরটা ছেড়ে রোদ পড়েছে গঙ্গার ধারে, ভিজে পলিমাটিতে রোদ ছড়িয়ে আছে। গঙ্গার স্রোতেও লেগেছে রোদের ছটা। জোয়ারের জল ফিরে যেতে শুরু করেছে। নিরবচ্ছিন্ন জলধারার দিকে তাকিয়ে অনেক বছর আগে একটা জলবিন্দু দেখার স্মৃতি আমার মনে পড়ল। জীবনে একবার, মাঝরাতে, সেই একফোঁটা জল দেখে, সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ শুনেছিলাম। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। চোখ থেকে একফোঁটা জল ফেলাকে যদি কান্না হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে চন্দ্রনাথ সেন বোধহয় জীবনে সেই একবার কেঁদেছিল। একফোঁটা চোখের জল ফেলেছিল। ঠিক একফোঁটা, তার বেশি নয়। একবিন্দু জলে মহাসিন্ধুর জলোচ্ছ্বাসের আওয়াজ শুনেছিলাম। আওয়াজটা উঠে এসেছিল আমার বুকের ভেতর থেকে। চন্দ্রনাথের চোখে জল, আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। সেই সন্ধেতে চন্দ্রনাথের বাবা, আমার ঠাকুর্দা, রাজনারায়ণ সেন মারা গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আত্মীয়স্বজনে ভরে গিয়েছিল আমাদের বাড়ি। কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলির নানা ঠিকানা থেকে তারা এসেছিল। রাজনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ বেশিরভাগ বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল, চন্দ্রনাথের পিসতুতো ভাই, তারাপ্রসাদ। আমরা বলতাম, তারাপ্রসাদকাকা। মাঝরাতে রাজনারায়ণের মরদেহ নিয়ে শ্মশানে রওনা হওয়ার আগে একতলার সিঁড়ির আড়ালে মুহূর্তের জন্যে সরে গিয়েছিল চন্দ্রনাথ। তখনই আমি দেখলাম, চন্দ্রনাথের ডান চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল বড় দানার একফোঁটা জল। হাতের পাতার উল্টোদিক দিয়ে, কেউ দেখে ফেলার আগে, সেই জল চন্দ্রনাথ মুছে নিলেও আমার নজর এড়াল না। রাজনারায়ণের মৃত্যুতে দারুণ কোনও শোক আমি পাইনি। শোক পাওয়ার বয়স তখনও আমার হয়নি। স্কুলে পড়ি। শোকের আঘাত সহ্য করতে আমার সামনে পাহাড়ের মত বাবা-কাকারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগের প্রজন্মের আড়াল থাকলে মৃত্যুশোক কমে যায়। রাজনারায়ণের মৃত্যুতে শোকের বদলে আমার মনে অন্য অনুভূতি জেগেছিল। রাজনারায়ণের ছেলেমেয়েরা কে কতটা শোকার্ত হয়েছে, শুকনো মুখ করে, আমি তা দেখে বেড়াচ্ছিলাম। সবচেয়ে বেশি নজর রেখেছিলাম চন্দ্রনাথের ওপর। চন্দ্রনাথের চোখের একফোঁটা জলের ওজন যে, সমস্ত আত্মীয়স্বজনের আকাশফাটানো কান্না, ফোঁপানি, বুক চাপড়ানো বিলাপের যোগফলের বেশি, বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। যন্ত্রণায় টনটন করে উঠেছিল আমার বুক।

রাজনারায়ণের মৃত্যুশোক কবে বাতাসে মিশে গেছে। নিমতলা শ্মশানে রাজনারায়ণের মরদেহ নিয়ে সেই রাতে শ্মশানযাত্রীদের যে ছবি তোলা হয়েছিল, তাদের মধ্যে দু-তিনজন ছাড়া আজ পৃথিবীতে কেউ নেই। রাজনারায়ণের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র একজন বেঁচে আছে। সে আমার ছোট পিসি। বয়স আশি। পৃথিবীতে থেকেও পিসি এখানে নেই। আত্মীয়স্বজনকে চিনতে পারে না। নিজের নামও প্রায় ভুলে যায়। চন্দ্রনাথের চোখের সেই বড় দানার জলের ফোঁটা আজও আমি ভুলিনি। রাজনারায়ণের মৃত্যুতে একমাস অশৌচ পালন করেছিল তার ছেলেরা। পাটকাঠি জ্বেলে মাটির হাঁড়িতে আলোচালের হবিষ্যি খেয়েছিল চন্দ্রনাথ আর দয়াময়ী। ধুমধাম করে শ্রাদ্ধ, নিয়ম-

ভঙ্গের অনুষ্ঠান হয়েছিল। মৃত্যুর বছরপূর্তিতে বাৎসরিক অনুষ্ঠানেও কম আড়ম্বর হয়নি। প্রথম বাৎসরিকের পরে দ্বিতীয় বছরে নমো নমো করে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। চন্দনের ফোঁটায় রাজনারায়ণের ছবি অলঙ্কৃত করে সেই ছবিতে বেলফুলের মালা দিয়েছিল দয়াময়ী। তৃতীয় বছরে কী ঘটেছিল, মনে করতে পারি না। পিতৃপক্ষে গঙ্গায়, চন্দ্রনাথ কখনও তর্পণে গেছে, এ খবর শুনিনি। বাড়িতে ঠাকুরঘর থাকলেও, তা ছিল দয়াময়ীর দখলে। ঠাকুরঘরে চন্দ্রনাথকে জীবনে একবারও ঢুকতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে চন্দ্রনাথ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত, এ নিয়ে আমার সন্দেহ নেই। রোজ স্নান সেরে ভিজে পোশাকে হাতের কর গুনে আহ্নিক করত চন্দ্রনাথ। নিঃশব্দে ইষ্টমন্ত্র আওড়াত। চন্দ্রনাথের ইষ্টদেবতা কে ছিল, জানতাম না। জানার আগ্রহ কখনও হয়নি। আমাদের পরিবারের যে কুলগুরু চন্দ্রনাথকে দীক্ষা দিয়েছিল, বছরে একবার, আমাদের বাড়িতে সে আসত। বয়স্ক কুলগুরু মারা যেতে তার ছেলে কুলগুরু হয়েছিল। তার বয়স তখন পঞ্চাশ। বাবার যা কাজ, সে করত। সাদা ধুতি-শার্ট পরা লম্বাটে শরীর, নিরীহ মুখ মানুষটাকে পরিবারের সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত। হাওড়াবাসী এই কুলগুরুর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, সংসার ছিল। বিদেশি কোনও সংস্থায় মানুষটা কেরানির চাকরি করত। বাসে চেপে রোজ হাওড়া থেকে ডালহৌসিতে অফিসে যেত। ছাপোষা, শান্তশিষ্ট এই মানুষই, আমাদের বাড়িতে দেবতার আপ্যায়ন পেত। তাকে প্রণাম করার জন্যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ভিড় লেগে থাকত। শ্রদ্ধায় ভাসিয়ে দেওয়া হত তাকে। সকাল, সন্ধে একবার করে, গলায় আঁচল জড়িয়ে মা আর বাড়ির মেয়েরা, তার পায়ের সামনে মেঝেতে কপাল ঠুকে পায়ের ধুলো নিত। শুধু চন্দ্রনাথের পরিবার নয়, রাজনারায়ণ সেনের অন্য দুই ছেলে, তাদের বউ, ছেলেমেয়েরাও রোজ গুরুদর্শনে আসত। স্নান করে, গরদের শাড়ি পরে, গুরুর জন্যে দয়াময়ী ভোগ রান্না করত। গাওয়া ঘি ছাড়া রান্নায় আর কিছু ব্যবহার করা হত না। সকালে নিরামিষ পোলাওয়ের সঙ্গে সাতরকমের তরকারি, রাতে ফুলকো লুচি, আলুভাজা, পটলভাজা, ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, ধোঁকার ডালনা রান্না হত। শেষ পাতে থাকত পায়েস, ক্ষীর, সন্দেশ। আমাদের বাড়িতে সাতদিন থেকে শরীরের জেল্লা অনেকটা বাড়িয়ে নিয়ে কুলগুরু বাড়ি ফিরত। সঙ্গে যেত বিরাট এক ছাঁদা। কাপড়ের লম্বা গেঁজেতে প্রণামীর টাকার বান্ডিল ভরে, গুরু কোমরে বেঁধে নিত। চন্দ্রনাথের ভাড়া করা গাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিত গুরুকে। আমার দেখা কুলগুরুর বাবার কাছে চন্দ্রনাথ দীক্ষা নিয়েছিল। ইষ্টমন্ত্র পেয়েছিল তার কাছ থেকে। পরম্পরা অনুযায়ী কুলগুরুর ছেলেকে সেই মর্যাদা দিলেও দেবদ্বিজে তার বিশেষ ভক্তি ছিল বলে আমার কখনও মনে হয়নি। পিতৃতর্পণও চন্দ্রনাথ সম্ভবত কখনও করেনি। তর্পণ করার তাগিদ বোধ না করলেও ইষ্টমন্ত্র জপ করতে একদিনও ভুলত না। গভীর মনঃসংযোগ করে আহ্নিক করত। সেখানে ফাঁকি ছিল না।

সংসার জীবনে চন্দ্রনাথের এমন কোনও পরিতৃপ্তি ছিল, যা ঈশ্বর নিয়ে, ধর্মাচরণ নিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করেনি। পিতৃতর্পণ করার দায়ও সে অনুভব করেনি। দয়াময়ীর সঙ্গে পাঁচ বছরের শীতল যুদ্ধের সময়েও উল্টোডাঙায় কাঠের ব্যবসা আর বৌবাজারের সংসার, নিয়মমাফিক করে গেছে। ভেতর থেকে দুর্বল করে দেওয়ার মত কোনও

গোপন কর্মসূচি চন্দ্রনাথের ছিল না। সেরকম ঘটনায় চন্দ্রনাথ কখনও জড়িয়ে পড়েনি। মধ্যবিত্তের সাদামাঠা নীতিবোধ তাকে সারাজীবন পরিচ্ছন্ন রেখেছিল। আমি সেই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পারিনি। আমাকে বাঁচাতে, আমার ক্লেদ চন্দ্রনাথ নিজে গ্রহণ করেছিল। দয়াময়ী জানতে পারেনি।

সংসারে তখন টালমাটাল চলছিল। বিপাশা বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পরের বছরে, এক সকালে দেবপ্রতিমের সিগারেট কিনতে গিয়ে নিমাই আর ফিরল না। সংসারে হালকা কাজকর্ম করলেও নিমাই তখনও পুরো সুস্থ হয়নি। পাগলামির লক্ষণ মাঝে মাঝে ফিরে আসছিল। তাকে নিয়ে দয়াময়ীর যথেষ্ট দুর্ভাবনা থাকলেও সে যে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পাবে, কেউ ভাবেনি। দয়াময়ী আড়ালে চোখের জল ফেলছিল। দয়াময়ীকে আশ্বস্ত করতে চন্দ্রনাথ বারবার শোনাচ্ছিল, নিমাই কাছাকাছি কোথাও আছে। যে কোনওদিন ফিরে আসবে। থানা, হাসপাতালে খোঁজখবর করা চলছিল। ইংরেজি, বাংলা সংবাদপত্রে 'নিরুদ্দেশ' শিরোনামে বিজ্ঞাপনও ছাপিয়েছিল চন্দ্রনাথ। নিমাইয়ের খোঁজ না মিললেও কিছু আসল পাগল, কয়েকজন সাজানো পাগল, আমাদের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। দু'জন ছিল সেয়ানা পাগল। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে তারা নিজেদের 'নিমাই' ভেবে নিয়ে চলে এসেছিল।

টাইফয়েডে দু'বার ভুগে, এবং সেরে উঠে, কিশলয় তখন তৃতীয়বার জ্বরে পড়েছে। আমাদের গৃহচিকিৎসক ডাক্তার সোমের জুতোর মচমচ আওয়াজের সঙ্গে বাড়িতে মৃত্যুর শব্দহীন পায়ের ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। মায়ের চোখে ঘুম নেই। বাবার কাজকর্ম মাথায় উঠেছে। দয়াময়ীর পাশে ছায়ার মত রয়েছে তার মা অঘোরবালা। ষাট বছর আগে অঘোরবালার একমাত্র ছেলে, চার বছর বয়সে টাইফয়েডে মারা গিয়েছিল। প্রথমবার সেরে উঠে টাইফয়েডের দ্বিতীয় ধাক্কা চার বছরের ছেলে সামলাতে পারেনি। দয়াময়ী তখন দু'বছরের মেয়ে। জ্ঞান হওয়ার মুহূর্ত থেকে শুনেছে সহোদরের মৃত্যুর বিবরণ। রোগের নাম টাইফয়েড। টাইফয়েডের নাম শুনলে তাই আমাদের পরিবার আতঙ্কে কাঁপতে থাকত। তৃতীয়বার কিশলয় জ্বরে পড়তে চন্দ্রনাথ, দয়াময়ীর মাথাতে আকাশ ভেঙে পড়েছিল। অঘোরবালার সঙ্গে আর একজন, আমাদের সংসারের পাশে ছিল। সে দেবু বোস, আমাদের দেবুমামা। চন্দ্রনাথ, দয়াময়ীর পরে, আমাদের পরিবারে দেবুমামা ছিল তৃতীয় অভিভাবক। বুক দিয়ে আমাদের আগলাত। কোষ্ঠকাঠিন্যের কষ্টে শয্যাশায়ী দেবপ্রতিমের কোষ্ঠ, দেবমামাকে নিজের হাতে সাফ করতে দেখেছি। সাফ করার আগে হাতে ভেস্‌লিন মাখানো রবারের গ্লাভস পরে নিত। দেবুমামার চেয়ে আমাদের পরিবারের বড় শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ ছিল না। চন্দ্রনাথের বৈষয়িক সব কাজে পরামর্শদাতা ছিল দেবুমামা। নিয়ম মেনে কাজ করতে ভালবাসত। সময়মত খেত এবং ঘুমত। দিনে দু'কাপের বেশি চা খেত না। দিনের শেষে, রোজ বাঁধানো ছোট খাতায় পাইপয়সার হিসেব পর্যন্ত লিখে রাখত। শীত পড়লে আমাদের বাড়িতে কমলালেবুর প্রথম ঠোঙাটা দেবুমামা আনত। প্রতি বছর দোলের আগের দিন বিকেলে, চিনিতে তৈরি নানা রঙের মঠ আর মিষ্টি ফুটকড়াই ভাজা নিয়ে হাজির হত। দোলকে তখনও হোলি বলা হত না। দোল উৎসবের অঙ্গ, চিনির দুটো খাবার দেখে আমরা

আনন্দে হইচই জুড়ে দিতাম। মঠ, ফুটকড়াইয়ের দৌলতে, পরের সকালে আমাদের রঙ মাখার আনন্দ হাজারগুণ বেড়ে যেত। দেবুমামা পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরে, আমাদের বাড়িতে দোল উপলক্ষে মঠ, ফুটকড়াই আর আসেনি। নিয়ে আসার মানুষটা চলে গেলে। আর কে আনবে?

দেবুমামা মারা যাওয়ার পরে আমাদের সংসারে একটার পর একটা অঘটন শুরু হয়। সবচেয়ে বড় অঘটন, বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, আমি ঘটিয়েছিলাম। দেবুমামা বেঁচে থাকলে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর মুখ দেখাদেখি হয়ত বন্ধ হত না। পিতৃপক্ষের সকালে, মানুষটার মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে, তার মুখ, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দেবুমামাকে বাদ দিয়ে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর তর্পণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেবুমামার সঙ্গে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীকে মনে পড়তে কয়েকটা দুঃস্বপ্নের দিন, আমার স্মৃতিতে ফিরে এল। তৃতীয় দফায় ছোটভাই, কিশলয়ের টাইফয়েড হওয়ার নবম দিনে, শেষ বিকেলে তাকে দেখতে এসে, ডাক্তার সুবীর সোম, একরকম জবাব দিয়ে গেল। বলল, আজ রাতটা যদি কেটে যায়, তবে কাল থেকে আমি আর একবার ছেলেটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। আপাতত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন।

ডাক্তার সোমের কথা চন্দ্রনাথের মনে দাগ কাটেনি। দালানে দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথ বলেছিল, ডাক্তার, আপনি যা বলছেন তা সম্ভব নয়। বাবা-মা বেঁচে থাকতে, তাদের চোখের সামনে, পৃথিবী ছেড়ে তাদের সন্তান চলে যেতে পারে না। এটা প্রকৃতির নিয়মবিরোধী। আমাদের পরিবারে সাতপুরুষে এমন ঘটেনি। নিজের তৈরি নিয়ম প্রকৃতি ভাঙবে না। আমার মৃত্যুর আগে আমার ছেলেমেয়েদের কেউ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে না।

চন্দ্রনাথ প্রলাপ বকছে ভেবে তার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে ডাক্তার চলে গিয়েছিল। সদর দরজা পর্যন্ত ডাক্তারকে এগিয়ে দিয়ে দেবুমামা ফিরে এল। চন্দ্রনাথের পিঠে হাত রেখে বলল, তোমার কথা ঠিক, আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের ছেলেমেয়েদের গায়ে আঁচড় লাগবে না।

এক সেকেন্ড থেমে দেবুমামা আবার বলেছিল, আমি লাগতে দেব না। কিশলয়ের রোগ আমি নিলাম।

দেবুমামার চৌকো ভারি মুখের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। দয়াময়ী বলল, আমার ছেলের রোগব্যাধি আমি নিলাম। মায়ের অধিকার সকলের আগে।

আবছা হেসে দেবুমামা বলেছিল, দয়া, ছেলেমেয়েরা কি তোর একার? আমি কি তাদের কেউ নই?

দেবুমামার গলা শ্লেষ্মায় বুজে এসেছিল। চিকচিক করছিল দু'চোখ। দয়াময়ীর কথা বলার শক্তি নিঃশেষ হয়েছিল। ঘটনা বাঁক নিল পরের সকাল থেকে। মৃত্যুর দরজা ছুঁয়ে কিশলয় ফিরে এল। সুস্থ হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। কিশলয় সেরে ওঠার বেশ কিছুকাল পরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে, দেবু বোস মারা গেল। পরিচর্যার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিল না। কিশলয়ের তৃতীয়বার টাইফয়েডে ভোগার দিনগুলোর ছবি তখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

নয়

গঙ্গার ধার ছেড়ে সকালের রোদ জলের অনেক দূরে সরে গেছে। ঢেউয়ের ভাঁজে-ভাঁজে রুপোর চাকতির মত ঝকঝক করছে শরতের আলো। মাঝে মাঝে ছায়া নামছে ঘন হয়ে। রঙ পাল্টে ক্রমশ কালো হচ্ছে মেঘের বহর। পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে ভেসে চলেছে মেঘ। বৃষ্টির মরসুম এখনও শেষ হয়নি। শরতেও গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে ভালরকম বৃষ্টি হয়। সাঁতার শেষ করে বিকাশ নিশ্চয় জল থেকে উঠে এসেছে। এতক্ষণে পুজোয় বসে গেছে। তার যজমানি করতে কালীঘাটের দু-তিনজন পূজারী বামুন ঘাট আঁকড়ে সকাল থেকে পড়ে আছে। বিকাশ যে শাঁসাল খদ্দের, কয়েক বছরে তারা জেনে গেছে। বাড়ি থেকে বেরনোর সময়ে বিকাশের পুজো, হোম, দানধ্যান দেখার যে আগ্রহ আমার ছিল, এখন নেই। আমার সামনে চন্দ্রনাথ, দয়াময়ী, দেবুমামার সঙ্গে অঘোরবালা এসে দাঁড়িয়েছে। ফোকলা বুড়ির মুখে একগাল হাসি।

গঙ্গার ভিজে বাতাসে হিংয়ের গন্ধ পেলাম। অঘোরবালার মত হিংয়ের কচুরি আজ পর্যন্ত কাউকে বানাতে দেখিনি। হিং-মেশানো, বাটা বিউলিডালের পুর দিয়ে তৈরি কচুরিকে অঘোরবালা বলত রাধাবল্লভি। ছোলার ডালের পুর দিয়ে বানালে তা হত কচুরি। কচুরির আবার নানা জাত ছিল। ছাঁকা ঘিয়ে ভাজা, ফোলা কচুরি, আর পরোটার মত তেল ছড়িয়ে ভাজা পাতা কচুরি। না ফোলা, পাতা কচুরিকে ডালপুরি বলা হত। শুকনো আলুরদম ছাড়া ডালপুরি জমত না। অঘোরবালার হাতের এসব রান্না যখন খেয়েছি, তখন এসবের দাম বুঝতে পারিনি। কী সহজেই না পেতাম, অঘোরবালার রাধা আলু, কড়াইশুঁটি, মটরডালের বড়ির ঝাল! অঘোরবালার মত করে বড়ি বানাতে আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি। হায়! সেই বড়ি, আজ পৃথিবীর কোথাও নেই! পৃথিবী তখন স্বর্গের খুব কাছাকাছি ছিল। অঘোরবালার রাঁধা বড়ির ঝাল আজও মুখে লেগে আছে।

চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর বিবরণ থেকে অঘোরবালাকে আলাদা করা সম্ভব নয়। দেবুমামা মারা যেতে অঘোরবালা একা হয়ে গেল। অল্পবয়সে স্বামী হারানোর পর থেকে জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়টা একা কাটিয়েছে অঘোরবালা। দুই মেয়ের একজন, দয়াময়ীর শ্বশুরবাড়ি ছিল, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে, অঘোরবালার বাড়ির কাছে। ছোট মেয়ে সৌদামিনী, মানে আমার মাসি, থাকত পাইকপাড়ায়। নিজের সংসারে সৌদামিনী এমন ডুবে ছিল যে তাকে অঘোরবালা কাছে পেত না। দয়াময়ীই ছিল অঘোরবালার অন্ধের যষ্টি। মাতৃসমা অঘোরবালাকে অবশ্য দেবুমামা কখনও অবহেলা করেনি। ছেলেবেলায় মা-হারানো দেবু বোস, বিধবা মাসি অঘোরবালার কাছে বড় হয়েছিল। দেবুকে পেয়ে ছেলে হারানোর শোক অনেকটা সামলে নিয়েছিল অঘোরবালা। দেবুমামার মৃত্যুতে অঘোরবালা অকূল পাথারে পড়লেও তাকে হাত ধরে দয়াময়ী দাঁড় করিয়ে রাখল। তখনও নিজের সংসার সম্পর্কে দয়াময়ী উদাসীন হয়নি। নব্বই বছরের অঘোরবালার ওপর সব সময়ে নজর ছিল। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। সংসার থেকে মন উঠিয়ে নেওয়ার পরেও অঘোরবালাকে দেখাশোনা করার জন্যেই দয়াময়ী যেন

বেঁচেছিল। দয়াময়ী প্রায়ই বলত, বুড়ি মা, না মরা পর্যন্ত আমার রেহাই নেই, আমাকে বাঁচতে হবে।

বাস্তবে তাই ঘটেছিল। ধুমধাম করে অঘোরবালার প্রথম বাৎসরিক করার দু'দিন পরে দয়াময়ী মারা গিয়েছিল। সে আরও পরের ঘটনা। তার আগে পৃথিবী থেকে চন্দ্রনাথ বিদায় নিয়েছে। অঘোরবালা যতদিন বেঁচে ছিল, দয়াময়ী প্রায়ই শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে মায়ের কাছে গিয়ে থাকত। লেবুতলার বাড়ি থেকে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, এমন কিছু দূরে নয়। শরীর ভাল থাকলে দয়াময়ী হেঁটে যেত। তা না হলে, কলকাতার পুরনো মানুষদের মত রিকশায় উঠে বসত। দেবুমামা মারা যাওয়ার পর থেকে অঘোরবালার সংসারে মাসের দোকানবাজার দয়াময়ী করে দিত। টাকা দিত অঘোরবালা। হিসেবের ফর্দসমেত খরচপাতি তাকে বুঝিয়ে দিত দয়াময়ী। চন্দ্রনাথের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক তখনও অটুট থাকলেও মায়ের সংসার সামলাতে দয়াময়ী কখনও স্বামীর সাহায্য নেয়নি। নব্বই ছুঁইছুঁই হলেও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অঘোরবালা যথেষ্ট ডাঁটো ছিল। নিজে রেঁধে খেত। ঘর গেরস্থালি ছিল পরিপাটি করে সাজানো। ছুঁচে সুতো পরিয়ে সেলাই-ফোঁড়াই পর্যন্ত করত। নব্বই বছর বয়সেও দোকানবাজার করেছে, পাড়ার মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখেছে। ষাঁড়ের গুঁতোয় রাস্তায় পড়ে গিয়ে হাত না ভাঙলে আরও কিছুদিন দোকানবাজারে যেতে পারত। বলা যায়, হাত ভাঙার পরে অঘোরবালা গৃহবন্দী হয়ে যায়। মায়ের সব দায়িত্ব নেয় দয়াময়ী। অবশ্য তার আগে বিধবা মাকে নিয়ে কাশী, পুরী থেকে কেদারনাথ, বদ্রিনাথ এমনকি, অমরনাথ পর্যন্ত ঘুরিয়ে এনেছিল। তীর্থযাত্রায় যে যার খরচ দিলেও অঘোরবালাকে তীর্থ করানোর জন্যেই স্বামী, সংসার ছেড়ে দয়াময়ী বাড়ি থেকে বেরত। আয়োজনে ত্রুটি থাকত না। গর্ভধারিণী মায়ের সেবা কীভাবে করতে হয়, দয়মায়ীকে দেখে আমি জেনেছিলাম। আমি তার কণামাত্র করতে পারিনি। চেনা কোনও সংসারে এমন ঘটনা দেখিনি।

পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগের মূল্যসূচক ধরে বিধবা অঘোরবালার জন্যে তার শ্বশুর, বিরজাকান্ত ঘোষচৌধুরী যে মাসোহারা বরাদ্দ করেছিল, সময়ের ফুটো দিয়ে জলের মত তা সাতদিনে বেরিয়ে যাবে, সেই মানুষটি জানত না। অঘোরবালাকে টাকার অনটন থেকে দয়াময়ী উদ্ধার করেছিল। অঘোরবালার শ্বশুরের এস্টেটের আইনজীবী, গণেশ গুহঠাকুরতার সঙ্গে কথা বলে, পারিবারিক সম্পত্তির কিছু পুনর্বিন্যাস করে মাসোহারার টাকা, দুশো থেকে ছশো করা হয়েছিল। পুজো, নববর্ষ, অম্বুবাচিতে, তিন দফায়, অঘোরবালা হাজার টাকা করে পেত। বাড়ি ভাড়া লাগত না। শ্বশুরের এস্টেটের আয় থেকে বাড়ির ট্যাক্স দেওয়া, বাড়ির দেখভাল হত। জীবনের শেষদিকে অঘোরবালা যথেষ্ট সচ্ছল ছিল। অঘোরবালা-দয়াময়ীতে মাঝে মাঝে মন কষাকষি হলে, দু'জনের মধ্যে কিছুদিন কথা বন্ধ থাকত। তারপর মিটে যেত। অঘোরবালা-দয়াময়ী তখন দু-চারদিন, এক বাড়িতে ঘেঁষাঘেষি করে থাকত। দু'জনের গল্প আর ফুরত না। অঘোরবালার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে বেশিদিন সরে থাকা দয়াময়ীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বেশি বিরক্ত হলে দয়াময়ী বলত, বুড়িটা জ্বালিয়ে মারল। তার আগে আমি যে যেতে পারব না, জানে। তাই আমাকে ভোগাচ্ছে!

সেই বিকেলে, অথবা পরদিন সকালে, অঘোরবালাকে রিকশয় তুলে দয়াময়ী নিজের বাড়িতে নিয়ে আসত। গলাগলি করে দুই বৃদ্ধা চার-পাঁচ দিন থাকত। মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া মিটে যেত। লেবুতলার বাড়ি থেকে আমি চেতলায় নিজের ফ্ল্যাটে চলে আসার পরে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর দূরত্ব আরও বেড়েছিল। চন্দ্রনাথের হেঁশেল থেকে আলাদা হয়ে নিজে রান্না করে দয়াময়ী খেতে শুরু করেছিল। মূল সংসারের মধ্যে আলাদা সংসার তৈরি হয়েছিল। তুলিকাকে বিয়ের বছর দেড়েক পরে দেবপ্রতিম টের পেয়েছিল, যৌথ সংসারে তার পোষাচ্ছে না। মাছের সাইজ ছোট হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে ছোট টুকরো দুটো তাকে আর তুলিকাকে দেওয়া হচ্ছে। সকালের জলখাবারের পাউরুটিতে ঠিকমত মাখন থাকছে না। নরু ঠাকুরকে সে নিয়মিত ধমকাতে থাকল এবং ইলেকট্রিক হিটার কিনল। যৌথ সংসার থেকে নিজের ভাগের খাবার নেওয়ার পাশাপাশি, ঘরে হিটার জ্বেলে মিনি হেঁশেল চালু করে দিল। বিদ্যুতের মাসুল আগের মত চন্দ্রনাথ মিটিয়ে যেতে থাকল। সব কিছু নজর করেও মুখ খুলল না। সংসারের এই ডামাডোলের মধ্যে আমি বিয়ে করলাম। সংসারে যতটা সম্ভব নিজেকে মানিয়ে নিল, আমার বৌ, নবনীতা। আপাত-পরিতৃপ্ত দাম্পত্যজীবন এবং লুকনো এক হাহাকার বুকে নিয়ে আমি আদর্শ স্বামী হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলাম।

চেতলার ফ্ল্যাটে আমি চলে যাওয়ার অল্পদিনের মধ্যে দয়াময়ী পুরোপুরি চন্দ্রনাথের হেঁশেলে ঢোকা বন্ধ করেছিল। নিজের ঘরে ছোট একটা কেরোসিন স্টোভ জ্বেলে, রেঁধে খেত। বাসনকোসন দয়াময়ী যা ব্যবহার করত, সেগুলোতে দুজনের রান্না করা যায়। বাড়িতে অঘোরবালা থাকুক, অথবা না থাকুক, দয়াময়ী রোজ দু'জনের পেট ভরানোর মত রাঁধত। বাড়ির বাইরে যে চার ছেলেমেয়ে আছে, তাদের কেউ ভরদুপুরে এসে গেলে না খেয়ে থাকবে নাকি? তা হওয়ার নয়। ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য আত্মীয় এলে, তাকেও না খাইয়ে দয়াময়ী ছাড়ত না। দুই বৌ, তুলিকা আর নববিবাহিত কিশলয়ের বৌ মানবীকে রান্নাঘর ছেড়ে দিয়ে দয়াময়ী নিজের ঘরে রান্না-খাওয়া করত। কত রকম রান্না, হিসেব নেই। নিজে খেত নিরামিষ ডাল, তরকারি ভাত। দয়াময়ীর হাতের রান্না, ফুলকপি অথবা পটলের বাটিচচ্চড়ি, উচ্ছের চাপড়ি, মুলো, বেগুন, নটে, ডাঁটা দেওয়া কাঁচা মুগের ডাল যারা খেয়েছে, কখনও ভোলেনি। দুপুরে নিজের ঘরে অতিথি না থাকলে বাড়তি ভাত তরকারি দুই ছেলের সংসারে সমান ভাগ করে পাঠিয়ে দিত। বেশিরভাগ দুপুরে দয়াময়ীর হেঁশেলের তরকারি ছেলেরা পেত। দেবপ্রতিমের ঘরে ডাল পাঠালে, কিশলয় পেত তরকারি। পরের দিন উল্টো ঘটত। আমার প্রিয় ছিল মায়ের তৈরি ডালিয়ার খিচুড়ি। দয়াময়ীরও এটা ছিল প্রিয় খাবার। ভাজা সোনামুগ ডালের সঙ্গে সাবুদানার মত ডালিয়া মিশিয়ে দয়াময়ী যে খিচুড়ি রাঁধত, তার সঙ্গে পাঁচতারা হোটেলের বিরিয়ানি পাল্লা দিতে পারত কিনা সন্দেহ! হঠাৎ কোনও দুপুরে লেবুতলার বাড়িতে গিয়ে পড়লে ছোট প্রেসারকুকারে আধঘণ্টার মধ্যে খিচুড়ি আর দু'রকম ভাজা বানিয়ে ফেলত দয়াময়ী। পাঁপড় ভাজা, বড়িভাজাসমেত গাওয়া ঘি ছড়ানো ধোঁয়া-ওড়া খিচুড়ির থালা আমার সামনে রেখে বলত, খেয়েনে।

সুবাসিত ধোঁয়ায় আমার বুক ভরে যেত। খাওয়ার কথা দ্বিতীয়বার বলতে হত

না। খিচুড়ির থালায় ঝাঁপিয়ে পড়তাম। নিস্তব্ধ ঘরে হাপুস-হুপুস শব্দ এবং কিছুক্ষণ পরে খালি থালায় পিঁপড়ে কেঁদে বেড়াত।

মা সস্নেহে তাকিয়ে দেখত আমার খাওয়া। বলত, আগে খবর দিয়ে এলে দুটো বেগুনি ভেজে দিতাম।

আমি বলতাম, এই যথেষ্ট!

মা খুশি হত। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দেখা করতে গেলে দয়াময়ী অভিমান করত। অঘোরবালার কাছে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিত। আমার পছন্দের খাবারের নাম করে লোভ দেখাত। বলত, শীত পড়লে কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুর দম, রসবড়া, পুলিপিঠে করব একদিন। খবর পাঠাব। নবনীতা, চুমকিকে নিয়ে আসবি কিন্তু।

ছয় ছেলেমেয়ের, কার পছন্দ কোন খাবার, দয়াময়ী জানত। সাধ্যমত তৈরি করে খাওয়াত। দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীতে নারকোল কুচো, ভাজা জিরে গুঁড়ো দিয়ে দয়ামযী যে ঘুগনি বানাত, পৃথিবীর সেরা হালুইকর তা তৈরি করতে পারবে না। ঘুগনির লোভে আমার কলেজের বন্ধুরা প্রতি বছর দশমীর সন্ধেতে দল বেঁধে দয়াময়ীকে প্রণাম করতে আসত। ঘুগনির সঙ্গে তাদের হাতে গড়া ছোলার ডালের বরফি, নারকোল নাড়ু দিত দয়াময়ী। দু-এক বন্ধুর বাড়িতে, কয়েকবার বিজয়ার সন্ধেতে রাজভোগ, সন্দেশ খেয়ে বাড়িতে এসে একবার দয়াময়ীকে বলেছিলাম, সামনের বছর আমার বন্ধুদের বাড়ির খাবারের সঙ্গে একটা করে রাজভোগ আর সন্দেশ দিও।

কথাটা শুনে ঈষৎ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল দয়াময়ীর মুখ। জিজ্ঞেস করেছিল, আমার তৈরি খাবার কি তোর বন্ধুদের ভাল লাগে না?

মায়ের ব্যথিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, তা নয়। সঙ্গে একটা রাজভোগ থাকলে দেখতে ভাল লাগে।

দয়াময়ী কথা বাড়ায়নি। আজ আমার মনে হয়, দয়াময়ী ঘুগনি বানাচ্ছে শুনলে, আমার পুরনো অনেক বন্ধু রাজভোগের হাঁড়ি ফেলে ছুটে আসবে। কয়েকদিন আগে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম মাকে। রান্নাঘরের মেঝেতে বঁটি পেতে দয়াময়ী কুটনো কুটছে। সরু ফালি করে পটল কেটে কাঁসার থালায় রেখে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। থালায় কয়েকটা পুষ্ট সবুজ কাঁচালঙ্কা। স্বপ্নের মধ্যেও বুঝেছিলাম, মা আজ বাটিচচ্চড়ি বানাবে। স্বপ্নে দেখা ছবিটা যে সময়ের, তখনও নিশ্চয় চন্দ্রনাথ বেঁচে ছিল। তা না হলে শাঁখা-সিঁদুর পরা দয়াময়ীকে দেখব কী করে? বাবা মারা গেছে মায়ের পাঁচ বছর আগে। তবু বৈধব্য পর্বের মাকে কখনও স্বপ্নে দেখিনি। চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে, মায়ের জীবদ্দশায় যতবার স্বপ্নে তাকে দেখেছি, কখনও তাকে এয়োতি চিহ্নবিহীন দেখিনি। চওড়া লালপাড় শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ, অনন্ত দাম্পত্যে দয়াময়ী স্থির হয়ে আছে।

চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে দয়াময়ী যে শান্তিতে ছিল না, আমি জানি। চন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই যৌথ সংসারের বাঁধন আলগা হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রনাথ চলে যেতে বাঁধনের সুতো পর্যন্ত বাতাসে মিলিয়ে গেল। বাড়ি থেকে বড়দা, আমি চলে গেলেও নতুন মানুষ এসে গিয়েছিল। দেবপ্রতিমের ছেলে, ভিক্টর স্কুলে যেতে শুরু করেছিল।

দশ

বেলা বাড়লেও সকালের আলো কখন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। মেঘ ডাকল আকাশে। পুব আকাশের মেঘ, তরল পিচের মত সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃষ্টি শুরু হতে দেরি নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে সাঁইসাঁই করে। বাতাসের ভেতরে জলের গুঁড়ো মিশে রয়েছে। ছাউনি ছেড়ে ঘাটে এখনই চলে যাওয়া দরকার। বৃষ্টি শুরু হলে বিকাশের গাড়িতে ঢুকে মাথা বাঁচানো যেতে পারে। ঘাটে পৌঁছনোর আগে বৃষ্টি নামলে, কী করব, ভেবে পেলাম না। বিকাশকে ঘাটে না পেলে কী করব? বিকাশের গাড়ির চালক বাদলকে নিশ্চয় পেয়ে যাব! বাদলকে নিয়ে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তারপর আর অসুবিধে নেই। বাদল যদি ঘাট থেকে আগেই গাড়িতে ফিরে গিয়ে থাকে, তাহলে সোজা গাড়িতে যাওয়া ভাল। ফোর্ট উইলিয়ামের মাঠে কম গাড়ি জমেনি। গাড়ির ভিড় থেকে বিকাশের গাড়ি খুঁজে বার করতে সময় লাগবে। গাড়ির নম্বর আমার অজানা। গাড়ির রঙ ক্রিম, এটুকু জানি। বেশিরভাগ গাড়ির এই রঙ।

গঙ্গার ঘাটের দিকে পা বাড়ানোর মুহূর্তে তেড়ে বৃষ্টি নামল। সিমেন্টের বেদিতে আমি আবার বসে গেলাম। বৃষ্টিতে আটকে গিয়ে আমার খারাপ লাগল না। বরং খুশি হলাম। মৃত মা, বাবা, পরমাত্মীয়দের মুখগুলো এখনও ভিড় করে আছে আমাকে। তারা আমার স্বীকারোক্তি শুনতে চায়। চন্দ্রনাথ, দয়াময়ীর দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে পড়ার গোপন কারণ, তাদের অজানা না থাকলেও, মূল আসামীকে দিয়ে বলাতে চায়। তর্পণে যে বিশ্বাস করে না, ধর্মাচরণে ঘোর অবিশ্বাসী, সেই নাস্তিকেরও যে একটা ধর্ম আছে, সারাজীবন আমি তা বিশ্বাস করেছি। নাস্তিকের ধর্ম হল, সৎসাহস। সততা আর সাহস না থাকলে নাস্তিক হওয়া যায় না। তামাদি হয়ে যাওয়া অপরাধের বিবরণ, শোনার মত কেউ না থাকলে, বিশ্বচরাচরকে জানিয়ে যেতে হয়। আর কেউ না জানুক, দয়াময়ীকে জানানো দরকার। চরাচরের যত জায়গায় দয়াময়ীর দেহবস্তু মিশে আছে, আমার বিবরণ নিশ্চয় সেখানে পৌঁছে যাবে। স্বীকারোক্তি শেষ না করে আমার যাওয়ার উপায় নেই।

বৃষ্টির বেশে আমার পথ আটকে মহাচরাচর দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাকে সরিয়ে রেখে আমার যাওয়ার উপায় নেই। জীবনের অন্তিম পর্বে চন্দ্রনাথ পৌঁছে গেলেও আমি বুঝতে পারিনি। চুয়াত্তর বছর বয়সেও চন্দ্রনাথ কর্মঠ ছিল। ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়ায়নি। উল্টে ব্যবসা বাড়াচ্ছিল। উল্টোডাঙ্গায় কাঠের গোলার পাশে, নতুন জায়গা কিনে করাতকল বসিয়েছিল। নিমতলা ঘাটের কাছাকাছি আরও একটা কাঠের আড়ত খুলেছিল। ব্যবসায় ডুবে থাকলেও মানুষটা যে একা হয়ে গেছে, বুঝতে পারতাম। প্রতি শনিবার সকালে চেতলার ফ্ল্যাটে আমার কাছে আসত। বলার কথা অনেক থাকলেও, দু'একটা বলে চুপ করে যেত। আমি খোঁচাতাম না। অপেক্ষা করতাম। চন্দ্রনাথ আর মুখ খুলত না। চন্দ্রনাথের মুখে বেদনার ছায়া ছড়িয়ে পড়ত। অনুতাপে আমি ধিকিধিকি পুড়তাম। হেমন্তের শেষ দিকে, সন্ধের পরে, রাস্তার বাতিদান ঘিরে

যখন কুয়াশা জমতে শুরু করে, তখনই এক দুপুরে টেলিফোনে চন্দ্রনাথের অসুস্থতার খবর জানলাম। ফোন করেছিল, কিশলয়। নার্সিংহোমের ঠিকানা জানিয়ে বলেছিল, তাড়াতাড়ি চলে আয়।

অফিসের কাজ ফেলে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর লং লাইফ নার্সিংহোমে কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এটা পরশুর ঘটনা। তারপর আরও দু'দিন, চন্দ্রনাথ সেনকে নার্সিংহোমে দেখতে গেছি। চন্দ্রনাথ যে ঝড়টা চটপট সামলে নিয়েছে, বুঝতে পারছিলাম। সত্তরের মাঝামাঝি পৌঁছলেও শুয়ে থাকার মানুষ চন্দ্রনাথ নয়। বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরেছিল। দু'দিন আগে কলঘরে ঢুকে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল, মানতে চাইছিল না। আত্মীয়কুটুমদের বোঝাতে চাইছিল, মাথা ঘুরে নয়, পা পিছলে পড়ে গেছে। শুকনো কলঘরে পিছলে পড়ার সুযোগ ছিল না। সিমেন্টের মেঝেতে একজন লম্বা, প্রমাণ শরীরের মানুষ আছড়ে পড়লে যতটা আওয়াজ হয়, হয়েছিল। কলঘরের কয়েক হাত দূরে নিজের ঘরে বসে সেই আওয়াজ শুনে কিশলয় ছুটে এসেছিল। অফিসে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল দেবপ্রতিম, সেও এসে গিয়েছিল। দুই ছেলে তখনই বাড়ির কাছে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিল চন্দ্রনাথকে। চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হয়নি। পড়ে গিয়ে চোট লাগলেও চন্দ্রনাথের জ্ঞান ছিল। শরীরের ভেতরে কোথাও আঘাত লেগেছিল কিনা, সেই মুহূর্তে জানা না গেলেও হাত পা ভাঙেনি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আত্মীয়স্বজন জেনে গিয়েছিল চন্দ্রনাথের খবর। সকলের আগে বড়দা অরিন্দমকে জানিয়েছিল দেবপ্রতিম। কিশলয় জানিয়েছিল আমাকে।

রোগীর সঙ্গে দেখা করার সময় সেটা নয়। কেবিনের দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখেছিলাম, কাঁচুমাচু মুখ করে চন্দ্রনাথ শুয়ে আছে। দু'চোখে ফাঁকা দৃষ্টি, সম্ভবত ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। সেই বিকেলে চন্দ্রনাথের কেবিনের দরজায় 'ভিজিটর নট অ্যালাউড' লেখা একটা পিসবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দর্শনার্থীদের কেবিনে ঢোকা বারণ ছিল। দরজা ফাঁক করে, শুধু ছেলেমেয়েরা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে বাবাকে দেখার অনুমতি পেয়েছিল। বাকি আত্মীয়রা কেবিনের সামনে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। দরজার দিকে তাকিয়ে শুয়েছিল চন্দ্রনাথ। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে যে উসখুস করছে, একবার চোখাচোখি হতে বুঝে গিয়েছিলাম। কথা বলার ইচ্ছে আমারও কম ছিল না। তবু নিরেট পাথরের মত মুখ করে দরজার পাশ থেকে সরে এসেছিলাম। বাড়ির সকলে তাই করেছিল। দেখা করার কড়াকড়ি দ্বিতীয় দিনে কিছু শিথিল হয়েছিল। নার্সিংহোমের দেওয়া দুটো ভিজিটিং কার্ড নিয়ে একসঙ্গে দু'জন ঘরে ঢোকার সুযোগ পেল। পাঁচ মিনিটের বেশি ঘরে থাকা যাবে না। রোগীকে যত কম কথা বলানো যায়, তত ভাল। চন্দ্রনাথের চার ছেলে, চার পুত্রবধূ, দুই মেয়ে, তাদের স্বামীরা, একঝাঁক নাতি, নাতনি, কাকা, জ্যাঠা, মামা, মেসো, পিসে, আত্মীয়কুটুমে নার্সিংহোমের বাইরের চাতাল ভরে গেল। বসার জায়গা পেল, হাতে গোনা কয়েকজন।

আত্মীয়স্বজন সকলে এলেও নার্সিংহোমে চন্দ্রনাথের স্ত্রী দয়াময়ীকে দেখা গেল না। চন্দ্রনাথের নার্সিংহোমে ভর্তির খবর দুপুরে বিপাশা পেলেও তখনই দয়াময়ীকে

জানায়নি। দয়াময়ীকে বলার আগে নিজের চোখে চন্দ্রনাথের শরীরের হাল দেখে নিতে চেয়েছিল। না জানানোর আরও একটা কারণ ছিল। পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা না বলে খবরটা শোনাতে চাইছিল না দয়াময়ীকে। পাঁচ বছরে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর সম্পর্ক যেখানে পৌঁছেছিল, তা দেখে তাদের স্বামী-স্ত্রী মনে হত না। পঞ্চাশ বছরের বেশি বিবাহিত, তারা যে ছয় ছেলেমেয়ের বাবা-মা, বোঝার উপায় ছিল না। তাদের দেখে মনে হত, দু'জন অচেনা মানুষ এক বাড়িতে বহু বছর বাস করছে। দয়াময়ীর খবর জানতে চন্দ্রনাথের আগ্রহ থাকলেও ছেলেমেয়েদের কাউকে জিজ্ঞেস করত না। কোথায় গেছে, কার বাড়িতে আছে, এ নিয়ে একটা প্রশ্ন করত না। স্বামীকে নিয়ে দয়াময়ীরও কোনও কৌতূহল ছিল না। ছেলেমেয়েদের কাছে চন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ মুখে আনত না। সংসারের টান নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। দয়াময়ীর চালচলন দেখে তাকে বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা, যে কোনও কিছু ভাবা যেত। রঙিন শাড়ি ছেড়ে দয়াময়ী সাদা শাড়ি ধরেছিল। শাড়ির পাড়ে রঙের প্রলেপ ক্রমশ হাল্কা হচ্ছিল। সরু হচ্ছিল শাড়ির পাড়। সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে গেল। কালো নরুন পাড় শাড়িতে দয়াময়ীকে অচেনা কেউ দেখে বিধবা ভাবত। মাছ, মাংস আগেই ছেড়েছিল। সংসারে এত অশান্তি সত্ত্বেও চন্দ্রনাথ কাজে ডুবে থাকত। কাজে চন্দ্রনাথের খামতি ছিল না। কলঘরে পড়ে যাওয়ার আগের দিনেও অফিসে গেছে। অন্যদিনের মত দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত অফিসে বসেছে। ছোট ছেলে কিশলয়কে পাঁচ বছর আগে ব্যবসাতে আনলেও ব্যবসার চাবিকাঠি নিজের হাতছাড়া করেনি। বিষয়বুদ্ধিতে কিশলয় যত পোক্ত হচ্ছিল, তত শক্ত হচ্ছিল চন্দ্রনাথের মুঠো। কিশলয় খুশি হত না। বাবার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হত। আমি এসব খবর কখনও দয়াময়ী, কখনও কিশলয়ের কাছ থেকে পেতাম। চাকরি, টাকা, বিলাসবৈভব, পদোন্নতি এবং আরও আরও সফলতার দৌড়ে ব্যস্ত চন্দ্রনাথের বড় ছেলে অরিন্দম পৈতৃক ব্যবসা, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামাত না। সে থাকত নিজের তালে। পারিবারিক পরিচয় তার কাছে ক্রমশ ধূসর হয়ে যাচ্ছিল। চন্দ্রনাথ সেনের নাম যে শেষ পর্যন্ত সে ভুলে যায়নি, এ তার বাবার ভাগ্য!

লং লাইফ নার্সিংহোমের কেবিনে বাবার হাতটা মুঠোয় নিয়ে আমি বসেছিলাম। চোখ বুজে বাবা শুয়ে ছিল। আগের দুদিনের চেয়ে সেই সন্ধেতে চন্দ্রনাথকে বেশি সুস্থ দেখালেও রোগটা তখনও ধরা পড়েনি। রোগ নির্ণয়ের জন্যে স্ক্যান সমেত প্রায় সব পরীক্ষা হয়ে গেছে। গোলমাল কিছু পাওয়া যায়নি। মানুষটা কলঘরে হঠাৎ কেন পড়ে গেল, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারল না। সোনোগ্রাফ করে পেটে পুরনো কোলাইটিস ধরা পড়েছিল। কোলাইটিসে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে কোনও রোগীকে চিকিৎসক দেখেনি। চন্দ্রনাথকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে আরও চারদিন তাকে নার্সিংহোমে ডাক্তার রাখতে চায়। মুখে কিছু না বললেও নার্সিংহোমে চন্দ্রনাথ আর থাকতে চাইছিল না। নার্সিংহোমে শুয়ে থেকে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করার চেয়ে বাড়িতে বিশ্রাম করা ঢের ভাল। পরের সকালে বাড়ি ফেরার চাপা ইচ্ছে মাথায় নিয়ে নানা যুক্তি, বাবা শোনাচ্ছিল আমাকে। চোরা উত্তেজনা চোখে নিয়ে মাঝে মাঝে কেবিনের

দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি টের পেয়েছিলাম, কার জন্যে চন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছে, কোন মানুষটাকে সে দেখতে চায়। আমার বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠেছিল। দশ বছর ধরে যে কথাটা চন্দ্রনাথ বলেনি, এখন কি বলে দেবে? দয়াময়ীর কাছে ফাঁস করে দেবে, আমার অপরাধ?

চন্দ্রনাথের হাত সমেত আমার মুঠো ঘেমে উঠছিল। মনে মনে ভাবছিলাম, চন্দ্রনাথ বলবে না। সংসার পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়ে পাঁচ বছর ধরে যে কথা চন্দ্রনাথ চেপে রেখেছে, আজ তা বলার কারণ নেই। শুধু দয়াময়ীকে দেখতে চায়। পুরনো মনকষাকষি মেটাতে কি রোগের ছুতোয় চন্দ্রনাথ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে? কলঘরে পড়ে যাওয়াটা কি চন্দ্রনাথের অভিনয়? নিশ্চয় তাই। তবু আমার ভয় কাটছিল না। পাঁচ বছর আগের সেই না-বলা ঘটনা বারবার মনে পড়ছিল। ঘাম জমছিল আমার কপালে। চন্দ্রনাথের বিছানার পাশে কাঠের টুলে আমি বসেছিলাম। চন্দ্রনাথের পায়ের কাছে আর একটা কাঠের টুল খালি ছিল। প্রথম দিনের মত সেই সন্ধেতেও চন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার কড়াকড়ি কিশলয় বজায় রেখেছিল। দুজন ভিজিটরকে একসঙ্গে চন্দ্রনাথের কেবিনে বসতে দিচ্ছিল না। দুটো ভিজিটিং কার্ডের একটা ব্যবহার করছিল চন্দ্রনাথের পরিবারের লোকজন। তাদের কেউ পাঁচ-সাত মিনিট বসছিল কেবিনে। দ্বিতীয় কার্ডটা ঘুরছিল, আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে। মুখে এক টুকরো হাসি নিয়ে কেবিনে ঢুকে চন্দ্রনাথের পায়ের কাছে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে তারা ফিরে যাচ্ছিল। খালি টুলটায় বসতে কেউ আগ্রহ দেখায়নি। 'কেমন আছেন' এই প্রশ্নটা দু-একজন করলেও বেশিরভাগ দর্শনার্থী মুখ খোলেনি। ভিজিটরদের প্রায় রিহার্সাল দিয়ে চন্দ্রনাথের ঘরে কিশলয় পাঠাচ্ছিল। দরজা খুলে কেউ ঢুকলে মুহূর্তের জন্য চন্দ্রনাথের দু চোখ চকচক করে উঠছিল। বালিশ থেকে মাথা তুলে আমার কাঁধের পাশ দিয়ে দর্শনার্থীকে পলকের জন্যে দেখে নিয়ে, ফের শুয়ে পড়ছিল। বালিশে ছেড়ে দিচ্ছিল মাথা। ক্লান্তির ছায়া জমছিল দু'চোখে। বেশ কয়েকবার বালিশ থেকে ঘাড় তুলে দর্শনার্থীকে দেখে, হতাশ হয়ে দরজার দিকে তাকানোর ইচ্ছেও কমে আসছিল।

হেমন্তের বিকেল অনেক আগে শেষ হয়েছে। বাইরে ঘন হচ্ছিল অন্ধকার। কেবিনে আলো জ্বলছে। সাতটা পর্যন্ত দেখা করার সময়। হাতঘড়িতে দেখলাম, সাতটা বাজতে পনের। আমার মুঠো থেকে হাতটা বার করে নিয়ে চন্দ্রনাথ বলল, এবার বাড়ি যা। অনেক দূর তোকে যেতে হবে।

আমি বললাম, আরও পনের মিনিট আছে। আর একটু থাকি।

তোর মাথায় হিম পড়লেই তো সর্দি হয়ে যায়। মাফলার এনেছিস?

না।

মাফলার নিয়ে বেরোবি। মাথা ঢাকা থাকলে ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা কমে যায়।

আমি হাসলাম। ব্যথায় চিনচিন করছিল আমার বুক। আমার ডাকাবুকো বাবা যে কত বড় মনের মানুষ, ভাইবোনদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি জানতাম। চন্দ্রনাথও বোধহয় জানত, তার সেজ ছেলেটা অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে আলাদা। হাওয়াকল

লাগানো দরজা ফাঁক হতে বালিশ থেকে আবার মাথা তুলে চন্দ্রনাথ দরজার দিকে তাকাল। তার কাঠগোলার কর্মচারী মহেশ কুণ্ডু ঘরে ঢুকে দু'হাত জুড়ে মালিককে নমস্কার করল। ধুতি, শার্ট পরা পুরনো, কালো শেকড়ের মত শরীর, কুণ্ডুবাবু কাঠগোলার ভেতরে একটা ঘরে থাকে। সন্ধে সাতটা বাজলে এক ঘণ্টায় দু বোতল চোলাই মদ শেষ করে লেবুতলার বাড়িতে ঠিক রাত সওয়া আটটায় গিয়ে চন্দ্রনাথকে সারাদিনের কাজকর্মের বিবরণ শোনায়। কুণ্ডুবাবুর শরীর থেকে ভক ভক করে চোলাই মদের গন্ধ বেরলেও তাকে কখনও বেসামাল হতে কেউ দেখেনি। চোলাই খাওয়ার পরে বরং তার সপ্রতিভ ভাব বেড়ে যায়। ঘড়ির কাঁটা ধরে আটটা পনের মিনিটে আমাদের বাড়িতে পৌঁছত কুণ্ডুবাবু।

পায়ের কাছে দাঁড়ানো মহেশ কুণ্ডুকে দেখে ক্লান্তিতে চন্দ্রনাথ চোখ বুজল। চন্দ্রনাথের হাত আবার আমি আঁকড়ে ধরলাম। আমার শরীর থেকে নিঃশব্দ গভীর কোনও অনুরোধ চন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে গেল। চোখ বুজে আমার মুঠোতে হাত রাখল চন্দ্রনাথ। অভয় ছড়িয়ে গেল আমার শরীরে। কুণ্ডুবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ফিসফিস করে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, কী ভাবছিস?

আমি কথা বলতে পারলাম না। ঘামে ভিজে উঠেছিল আমার হাত। চন্দ্রনাথ বলল, ভুলে যা। জীবনে অনেক কিছু ঘটে যায়। সব মনে রাখতে নেই।

আমার গলায় বাতাস দলা পাকাচ্ছিল। আমি চুপ। বালিশ থেকে মাথা তুলে চন্দ্রনাথ দরজার দিকে তাকাল। অসুস্থ স্বামীকে তিনদিনে দয়াময়ী একবারও দেখতে আসেনি। কেন আসেনি, আমি জানতাম। চন্দ্রনাথ আরও বেশি জানত। আর একজন জানত। তার নাম প্রমীলা। স্রোতের কুটোর মত আমাদের বাড়িতে সে ভেসে এসেছিল এবং সেভাবেই চলে গেল। দয়াময়ীর সঙ্গে প্রমীলার আর দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। চন্দ্রনাথের সঙ্গে দয়াময়ীর আবার দেখা হোক, আমি চাইছিলাম না। চন্দ্রনাথের নার্সিংহোমে থাকার খবর আগের দিন দয়াময়ী শুনেছে। বিপাশা জানিয়েছে দয়াময়ীকে। খবর শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর সন্ধের আহ্নিকে বসেছিল দয়াময়ী। পনের মিনিটে যে রোজ সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে, কাল সে এক ঘণ্টা আসনে ছিল। আসন ছেড়ে ওঠার পরেও বিপাশার সঙ্গে কথা বলেনি। টেলিফোনে এত খবর বিপাশা আমাকে দিলেও নার্সিংহোমে দয়াময়ী আসছে কিনা বলতে পারেনি। মায়ের মুখ দেখে বিপাশা কিছু ধরতে পারছিল না। বিপাশা না বললেও আমার ধারণা হয়েছিল দয়াময়ী আসবে। দেখা করার পুরো দু'ঘণ্টা সময়, তাই চন্দ্রনাথের ঘরে আমি থাকতে চাইছিলাম। দয়াময়ী কেবিন ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত চন্দ্রনাথের পাশ থেকে আমি নড়ব না। পাঁচ বছরের বাসি, একটা ঘটনা নিয়ে চন্দ্রনাথ যে টুঁ শব্দ করবে না, জেনেও আমি ঝুঁকি নিতে চাইছিলাম না। দয়াময়ীর সঙ্গে পুরনো ঝগড়া মিটিয়ে নিতে পঁচাত্তর বছর বয়সে চন্দ্রনাথ যে রোগীর ভূমিকায় অভিনয় করছে, এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়েছিল।

চন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে অবাক হয়েছিলাম, মজাও লেগেছিল এবং যৎসামান্য ভয়ও যে হয়নি, এমন নয়।

দয়াময়ীর সঙ্গে আগের মত সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে, ভুল বোঝাবুঝির কারণটা

চন্দ্রনাথ গল্প করে বলে দিতে পারে। কার্ড নিয়ে প্রথমে বেলেঘাটার বিজুদা, পরে কমলাবৌদি এসে এক মিনিট করে মামাকে দেখে গেল। নরম মনের মানুষ বিজুদার দু'চোখ ছলছল করছিল। সামান্য কাত হয়ে আমার কাঁধে বাঁ হাত রেখে চন্দ্রনাথ আবার বলল, এবার তুই বাড়ি যা। সাবধানে থাকিস।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফের বলল, জীবনের কিছু ঘটনা ভুলে যেতে হয়। তোর মা-ও মনে রাখেনি। আজ সে আসবে।

আর একটু বসি।

কথাটা আমি শেষ করার আগেই বালিশ থেকে ঘাড় তুলে দরজার দিকে তাকিয়ে চন্দ্রনাথ চোখ টিপে আমাকে কিছু জানাল। আমি পিছন ফিরে দেখলাম কেবিনের দরজা খুলে দয়াময়ী ভেতরে ঢুকছে। চওড়া লালপাড় শাড়ি পরেছে মা। মায়ের সিঁথিতে তাজা সিঁদুর। পাঁচ বছর পরে পুরনো সাজে মাকে দেখে আমার বুক ভরে গেল। কাল্পনিক সব ভয় মুছে যেতে সময় লাগল না। স্বামীর রোগশয্যার পাশে পাঁচ বছর পরে বসে কথা বলবে দয়াময়ী। চন্দ্রনাথের কপালে হাত বুলিয়ে দেবে। এর চেয়ে আনন্দের মুহূর্ত আর কী হতে পারে? কাঠের টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মাকে দু'হাতে ধরে সেখানে আমি বসিয়ে দিলাম। আমার বুক থেকে পাথর নেমে গেল। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি নিয়ে চন্দ্রনাথ তাকাল আমার দিকে। যেন বলতে চাইল কেমন দিলাম।

খুশিতে থইথই করছিল আমার বুক। কেবিন থেকে বেরিয়ে ভাইবোনদের জটলায় পড়ে গেলাম। কেবিনের ভেতরে মিলনদৃশ্যের বর্ণনা শোনার জন্য সকলে ঘিরে ধরল আমাকে। বিপাশা বলল, বাব্বা বাঁচলাম।

ঠোঁট টিপে হাসছে কিশলয়ের বৌ, মানবী। বড় বৌ সুপর্ণার দু'চোখ খুশিতে চিকচিক করছে। আড়ি পাতার জন্যে কেবিনের দিকে দেবপ্রতিমের বৌ তুলিকা এগোতে বড়দি থামিয়ে দিল তাকে। চাপা গলায় কথা চালাচালির মধ্যে মিলনদৃশ্যের বর্ণনা শুনতে আমাকে কেউ দ্বিতীয়বার তাগাদা দিল না। নার্সিংহোমের বাইরে এসে আমার মনে হল, ব্যবসাবুদ্ধির সঙ্গে জীবনকে জোড়া লাগানোর কৌশলও চন্দ্রনাথের অজানা নয়। তিনদিন ধরে অসুস্থতার যে অভিনয় মানুষটা করে গেল, পাকা অভিনেতাও তা পারে না। অসাধ্যসাধন করেছে চন্দ্রনাথ। ভাঙা সংসার জোড়া লাগতে আর দেরি নেই। সুখের দিনগুলো ফিরে আসছে। সব কিছু আগের মত হয়ে যাবে। সন্ধের পরে চন্দ্রনাথ সেনের তিনতলা বাড়ির প্রত্যেক ঘরে আবার আলো জ্বলবে। আত্মীয়, অতিথি আসা-যাওয়া করবে। মনে রাখার মত এমন সন্ধে আমার জীবনে অনেক বছর আসেনি। মাথায় হিম পড়ছে, আমার খেয়াল নেই। ল্যাম্পপোস্টের আলো ঘিরে কালচে ধোঁয়া জমছিল। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আমার মনে খটকা লাগল। কোথাও এমন একটা গোলমাল করেছি যে, আমার অঙ্ক মিলছে না।

চেতলার তিনটে বাস, একের পর এক ছেড়ে দিলাম। অঙ্কের গরমিলটা মাথায় চক্কর কাটছিল। খালি ট্যাক্সি ধরে চৌরঙ্গির এক ক্লাবের সামনে এসে নামলাম। আমি এই ক্লাবের সদস্য না হলেও এখানে কখনও এলে কয়েকজন বন্ধুকে পেয়ে যাই।

বসতে অসুবিধে হয় না। সেই সন্ধেতেও পেয়ে গেলাম। আমাকে দেখে অর্ণব, কৌশিক সমাদর করে বসাল। চন্দ্রনাথের অসুস্থতার খবর কৌশিক জানত। জিজ্ঞেস করল, মেসোমশাই কেমন আছেন? বললাম, আগের চেয়ে ভাল।

চন্দ্রনাথের দীর্ঘায়ু কামনা করল কৌশিক। আড্ডা জমে উঠল। অঙ্কের গরমিলটা তন্নতন্ন করে আমি খুজতে থাকলাম! প্রমীলা এখন কোথায়? চব্বিশ পরগনার কুলপি অথবা গোসাবার কোনও অজ পাড়াগাঁ থেকে সে যদি লেবুতলার বাড়িতে আবার কখনও এসে দাঁড়ায়, ভুলে যাওয়া ঘটনাটা দয়াময়ীকে মনে করিয়ে দেয়, তাকে কে ঠেকাবে? চন্দ্রনাথ কি পারবে? আমি তখন কী করব? ক্লাবের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে আমি ঘামছিলাম।

এগার

তুমুল বৃষ্টিতে সামনে গঙ্গা, পেছনে রাস্তা, ফোর্ট উইলিয়াম, ডান দিক, বাঁ দিকের গাছগুলো দেখতে পাচ্ছি না। ঝমঝম বৃষ্টির সঙ্গে ঢেউয়ের ছলাৎছল আওয়াজ কানে আসতে আমি অনুভব করলাম চারদিক থেকে গঙ্গা ঘিরে ধরেছে আমাকে। গোটা পৃথিবী জলভূমি, কোথাও একটুকরো ডাঙাজমি নেই। মহাপ্রলয়ে ডুবন্ত পৃথিবীতে ছাতা লাগানো একটা বয়ায়, নোয়ার নৌকোও হতে পারে, আমি ভাসছি। পিতৃপক্ষের সকালে পৃথিবী ভাসানো এমন বৃষ্টি, আগে দেখিনি।

লং লাইফ নার্সিংহোম থেকে খোসমেজাজে বেরিয়ে বন্ধুদের আড্ডায় সেই সন্ধেতে কয়েক ঘণ্টা কাটালেও আমার মন সেখানে ছিল না। মনের মধ্যে কিছুক্ষণ আগে যে খটকা জেগেছিল, তা নানাভাবে উত্যক্ত করছিল আমাকে। সাত বছর আগের এক নিষিদ্ধ অধ্যায় থেকে খালাস পেয়েও স্বস্তি হচ্ছিল না। আমার চোখের সামনে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর মিটমাট শুরু হলেও সে মিলনে যে গোঁজামিল রয়েছে, বুঝতে পারছিলাম।

আসল ঘটনা দয়াময়ী কোনওদিন জানবে না। বাকি জীবনটা স্বামীকে অপরাধী ভাবলেও চুপ করে থাকবে। অথচ চন্দ্রনাথ নির্দোষ। আমি-ই তাকে অপরাধী সাজিয়েছি। দয়াময়ীর কাছে আমার অপরাধ স্বীকার করা উচিত। প্রমীলার সঙ্গে আমার যে অবৈধ যোগাযোগ ঘটেছিল, তার সব দায়িত্ব আমার। চন্দ্রনাথ বিন্দুবিসর্গ জানত না। চন্দ্রনাথের কিছু কবার ছিল না। আমাকে বাঁচাতে দয়াময়ীর সব অভিযোগ চন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিল। দয়াময়ীকে ঘটনাটা কীভাবে আমি বলব? পাপ স্বীকার করার ভাষা কী? দয়াময়ীকে বলার আগে সেই অমাবস্যার রূপকথাকে আমি স্মৃতিতে ঝালিয়ে নিয়েছিলাম। পানভোজনে মশগুল কৌশিক, অর্ণব এবং আরও দু'জন, আমার একাকীত্ব বুঝতে পারেনি।

দশ বছর আগে চাঁপার মায়ের জায়গায় প্রমীলা যখন কাজ করতে এল, প্রথম কিছুদিন তাকে আমার চোখে পড়েনি। নতুন বৌ নবনীতাকে নিয়ে আমি তখন মশগুল।

তার আগে একটা প্রেমে পড়ার এবং ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা ছিল। প্রেমে পড়া এবং স্বেচ্ছায় তার ভরাডুবি ঘটানো, দুটোই করেছিলাম কবি হওয়ার তাগিদে। প্রেমিক, ব্যর্থপ্রেমিক, কবি, কোনটাই হতে না পারলেও প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ব্যর্থ প্রেমের হাহাকার যে নিছক শরীরের ব্যাপার, জেনে গিয়েছিলাম। পানপাতার মত প্রমীলার মুখটার সঙ্গে পরিচয়ের পরে জানলাম, দয়াময়ীর সংসারে মাসখানেক হল সে বাসন মাজছে, ফাইফরমাশ খাটছে। পুরো সময়ের দাসী সে। আমাদের বাড়িতেই থাকে। হেঁশেল, ভাঁড়ারে তার হাত দেওয়ার অধিকার না থাকলেও খাবার ঘরে রাতে বিছানা পেতে ঘুমোয়। আরও কিছুদিন পরে দেখলাম, তার দীঘল চোখে ঝিলিক আছে, হাসলে তার গালে টোল পড়ে এবং ঘটনাটা জেনে অথবা না-জেনে সবসময়ে ঠোঁটে হাসিটা সে ধরে রাখে। তখন তার বয়স কমবেশি ত্রিশ। মুখ দেখে আরও কম মনে হয়। কুলপির কোনও এক গাঁয়ে স্বামী ছেলেমেয়ে সংসারকে শাশুড়ির জিম্মায় রেখে নগদ টাকা আয় করতে প্রমীলা কলকাতায় এসেছিল। তাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিল তার স্বামী। দয়াময়ীর সংসারে তাকে নিয়ে এসেছিল চন্দ্রনাথের কাঠগোলার সরকার, মহেশ কুণ্ডু। কুণ্ডুবাবুর বাড়িও ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, কুলপির কাছাকাছি কোনও গ্রামে।

প্রমীলার জীবনপঞ্জি আমাকে শুনিয়ে, সেই সঙ্গে কিছু রঙ্গরসিকতা করে আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে নবনীতা আরও রঙিন করে তুলতে চাইত। বাড়িতে কাজের লোক, কারা আসছে, যাচ্ছে, আমি খেয়াল করতাম না। কয়েকবার নবনীতার রসিকতা শুনে প্রমীলাকে ভাল করে দেখলাম। সে দেখাতে লুব্ধতা ছিল না। বিয়ের আগে থেকে চন্দ্রনাথের মুখোমুখি ঘরে আমি থাকতাম। আমাদের চার ভাইয়ের প্রত্যেকের আলাদা ঘর ছিল। আমার পর্দাবিহীন ঘরে যার খুশি, সে ঢুকতে পারত। বিয়ের পরে ঘরের দরজায় ফ্রিল লাগানো গাঢ় রঙের ভারি পর্দা ঝোলানো হয়েছিল। বেশিরভাগ সময়ে দরজা ভেজানো থাকত। বন্ধুরাও আগের মত ঘরে ঢুকতে পারত না। দরজায় টোকা দিয়ে তারপর ঢুকত। ছুটির সকালে যে ঘরে তুমুল আড্ডা চলত, বিয়ের পরে সেখানে দু-একজন ছাড়া আসত না। বিয়ের আগে আমার ঘরের দরজায় পর্দা না থাকলেও পাল্লা ভেজানো থাকত। কম সিগারেট ঘরে পুড়ত না। সিগারেটের গন্ধ পেলেও চন্দ্রনাথ যে ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে না, এই ভেবে স্বস্তি পেতাম। কেটলি ভর্তি চা আর আট-দশটা কাপ নিয়ে চাঁপার মা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘরে ঘরে ঘুরত। প্রথমে যেত চন্দ্রনাথের ঘরে, তারপর ছেলেদের ঘরে ঢুকত। চাঁপার মা দেশে যেতে ঘরে ঘরে চা বিলি করার ভার পড়ল প্রমীলার ওপর। ঠোঁট টেপা হাসিতে দু'গালে টোল ছড়িয়ে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চায়ের কেটলি নিয়ে আমাদের ঘরে প্রমীলা উঁকি দিত। এটা ঘটত আমরা বাড়ি থাকলে, ছুটির দিনে। দিনে প্রায় কুড়ি কাপ চা, চল্লিশ-পঞ্চাশটা সিগারেট খেত চন্দ্রনাথ। দুটোই, আমি খেতাম চন্দ্রনাথের অর্ধেক।

চন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকলে ঝি, চাকর, পাচক, আত্মীয়, বন্ধু—সকলকে তার সঙ্গে দু-এক মিনিট কথা বলতে হত। প্রমীলার সঙ্গে একটু বেশি সময় চন্দ্রনাথ গল্প করত। বাড়িতে এ নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না। আটষট্টি বছরের চন্দ্রনাথ ছিল সব প্রশ্নের

ঊর্ধ্বে। দয়াময়ী যে মাঝে মাঝে কিছুটা বিরক্ত হত, তার মুখ দেখে বুঝতে পারতাম। কিন্তু তা নিয়ে কখনও কলহ ঘটেনি। গোলমাল বাঁধল অন্তঃসত্ত্বা নবনীতা, বাপের বাড়ি যাওয়ার পর। প্রথম মা হওয়ার ঝুঁকি সামলাতে প্রসবের তিন মাস আগে মায়ের কাছে সে চলে গিয়েছিল। তিনমাস কম সময় নয়। বিয়ের দু'বছর পরে, সাতাশ-আটাশের একজন স্বামীকে মেয়েমানুষের গন্ধ জড়ানো ডাব্‌ল বিছানায় রাতের পর রাত বধূহীন একা কাটাতে হলে তাকে যে শয্যাকণ্টকী রোগে ধরে, তার ঘুম ছুটে যায়, স্ত্রী-বিচ্ছিন্ন পুরুষ তা হাড়ে হাড়ে জানে। আমারও ঘুম চলে গিয়েছিল। অনিদ্রা রোগে ধরেছিল আমাকে। ব্যর্থ প্রেমিক হওয়ার জন্যে যে মেয়েটির সঙ্গে মেলামেশার চূড়ান্ত করেছিলাম, ঘুমের ওষুধ খুঁজতে তার কাছে গিয়েছিলাম দুবার। বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার। ছেলের বয়স চার। হৃষ্টপুষ্ট ছেলে কোলে নিয়ে সে শুধু স্বামীর গল্প শুনিয়েছিল। স্বামী নিয়ে তার দেমাকের শেষ ছিল না। কুড়ি বছর বয়সে, নিজেদের বাড়ির অন্ধকার ছাদে, সে যে আমার শরীরের ভেতরে এবং তার শরীরের আরও ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিল, আমি ঢুকে যেতে চেয়েছিলাম, সাত বছর পরে সে ঘটনার বিন্দুবিসর্গ সে মনে করতে পারেনি। আমার শয্যাকণ্টকী রোগের কথাতে সে কোনও গুরুত্ব দিল না। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতাম। বিছানা থেকে উঠে বারবার জল খেতাম, কলঘরে যেতাম। অফিস থেকে ঘরে ফিরে অন্ধকার ঘরে মড়ার মত শুয়ে থাকতাম। চা দিয়ে যেত প্রমীলা। জলখাবার এনে দিত। রাতে খাওয়ার পরে নিয়ে আসত এক কাপ গরম দুধ। আমার দশা দেখে সে যে ঠোঁট টিপে হাসছে, অন্ধকার ঘরেও নজর করতাম। তখনই আমাকে ভূতে ধরল। দুধের কাপ নিয়ে এক রাতে অন্ধকার ঘরে প্রমীলা ঢুকতে কাপ নেওয়ার আগে তার হাতটা ধরলাম। বাঁ হাতে কাপটা আমি নিয়েও তার ডান হাতটা ছাড়লাম না। হাসিমুখে প্রমীলা দাঁড়িয়ে থাকল। হাতটা সরিয়ে নিল না। পর্দার ফাঁক দিয়ে দালানের এক টুকরো আলো প্রমীলার মুখে এসে পড়তে তার মুখের একপাশে আলো, অন্য পাশে অন্ধকার জড়িয়ে ছিল। আলোকিত ঠোঁটে হাসি, গালে টোল আমার নজর এড়ায়নি। প্রাক্তন প্রেমিকাকে যে কথাটা আভাসে জানিয়ে সাড়া পাইনি, প্রমীলাকে বললাম। কথাটা উড়িয়ে না দিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি প্রমীলা আরও ছড়িয়ে দিল। প্রমীলাকে বললাম, রাত বারোটার পরে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, এস।

কথার এই পর্যন্ত ঠিক থাকলেও পরের অংশটা ছিল মর্যাদাহানিকর। বলেছিলাম, শাড়ি দেব, টাকা দেব।

খালি কাপ নিয়ে কোমরে ঢেউ তুলে প্রমীলা ঘর থেকে চলে যাওয়ার মুহূর্তে টের পেলাম কাজ হয়েছে। প্রমীলা আসবে। শাড়ি, টাকার কথাটা সে গায়ে মাখেনি। প্রমীলার হাসি, নিতম্বের ঢেউ, চোখের ঝিলিক, আমার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। রাত বারোটার জন্যে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলাম, পেন্সিল টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখছিলাম বারবার। অন্ধকার হয়ে গেল বাড়ি। ঘরে ঘরে নিস্তব্ধতা নামল। খুটখাট আওয়াজ কানে এলেই নিঃশ্বাস চেপে ভাবছিলাম, প্রমীলা এসে গেছে। বারোটা বেজে

যাওয়ার পরেও প্রমীলা না আসতে আমি পা টিপে টিপে একতলার খাবার ঘরে হাজির হলাম। প্রমীলা বিছানা করছিল। আমাকে দেখে গালে টোল ফেলে সে হাসল। তাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে খাবার ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। অন্ধকার ঘর। শক্ত মুঠোয় তার হাত ধরে আমি তাকে দোতলায়, আমার ঘরে নিয়ে এলাম। প্রমীলা সামান্য গাঁইগুঁই করলেও বিছানায় শুয়ে যে ভেল্কি দেখাল, তা কোনও নাগরিকা জানে না। নিস্তব্ধ তিনতলা বাড়ির কোথাও একফোঁটা আলো নেই। প্রমীলার সস্তা নাকছাবির লাল পুঁতিটা মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছিল। নবনীতার বাবার দেওয়া খাটে আমার সঙ্গে আধঘণ্টা কাটিয়ে ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় ফিসফিস করে প্রমীলা বলেছিল, শাড়ি, ট্যাকার লোভে কিন্তুক আসি নাই।

প্রমীলার কথাটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিলেও সপ্তাহের শেষ দিকে দ্বিতীয়বার আমার ঘরে সে এসেছিল। আমাকে ডাকতে হয়নি। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে নিজে এসেছিল সে। স্বামী-বিচ্ছিন্না মেয়েটারও কিছু তাগিদ থাকতে পারে। ছিল-ও। তাগিদটা তার মত করে সে বলেছিল। কথাটা লেখার যোগ্য না হলেও অন্যায় নয়। প্রমীলার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় যোগাযোগের রাতে দুর্ঘটনাটা ঘটল। চন্দ্রনাথের পরিবারে শুরু হল সঙ্কটের অধ্যায়। আমার ঘরে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে প্রমীলা যখন নিঃশব্দে একতলায় নেমে যাচ্ছে, তেতলার সিঁড়ির বাঁকে পুঞ্জিত ধোঁয়ার মত স্থির এক ছায়ামূর্তিকে দেখে আমার চিনতে অসুবিধে হল না। ধক করে উঠল আমার বুক। দয়াময়ী এখনই হইচই তুলে বাড়ি মাথায় করবে ভেবে ভয়ে আমি কুঁকড়ে গেলাম। দরজার গাঢ় খয়েরি পর্দার আড়াল থেকে দয়াময়ীকে আমি দেখতে পেলেও আমাকে নজর করার সুযোগ দয়াময়ীর ছিল না। পাশের বাড়ির ফিকে আলো এসে পড়েছিল দয়াময়ীর বাঁ দিকের কাঁধে। মুখের বাঁ পাশ অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। পাথরের মত কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে দয়াময়ী তিনতলার ঘরে চলে গিয়েছিল।

সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি। বারবার কলঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়েছি, ঘাড়ে-মাথায় জল দিয়েছি। মাথা ভিজিয়ে বিছানায় শুয়ে স্বস্তি পাইনি। রক্তের চাপে মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে পড়ছিল। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আমি যা ভেবেছিলাম, তা ঘটল না। ঘূর্ণিঝড় আমার কান ঘেঁষে চলে গেল। ঝড় আছড়ে পড়ল চন্দ্রনাথের ওপর। সেই রাতে তেতলার সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে, ঘন অন্ধকারে ডুবে থাকা দোতলার মুখোমুখি দুটো ঘরের কোনটা থেকে প্রমীলা বেরিয়েছিল, দয়াময়ী ঠাহর করতে পারেনি। সব মায়ের মত দয়াময়ীর সন্তানস্নেহ কম ছিল না। পুত্রস্নেহে সব সময়ে অন্ধতা থাকে। দয়াময়ীরও ছিল। সদ্য বিবাহিত ছেলের ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল। চন্দন কোনও খারাপ কাজ করতে পারে না, আমার সম্পর্কে এই আস্থাতে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দয়াময়ী অবিচল ছিল। তার বিশ্বাসের যোগ্য যে আমি নই, সেই মুহূর্তে কথাটা তাকে বলার সাহস আমার ছিল না। চন্দ্রনাথের ওপর দিয়ে দয়াময়ীর শব্দহীন ধিক্কারের ঝড় বইতে থাকল। স্নায়ুযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সাজানো সংসার।

সেই রাতের বাহাত্তর ঘণ্টা পরে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে, মা, অঘোরবালার কাছে

দয়াময়ী চলে গেল। অঘোরবালাকে দয়াময়ী কিছু জানাল না। মেয়েকে পেয়ে অঘোরবালা আহ্লাদে আটখানা। দয়াময়ীকে আটকে দিল। সাতদিন পরেও দয়াময়ী বাড়ি না ফিরতে তাকে আনতে চন্দ্রনাথ গেল শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে। অঘোরবালার কাছে দয়াময়ী তখন ছিল না। সল্টলেকে বিপাশার বাড়িতে আগের দিন চলে গেছে। শ্রীগোপাল মল্লিকে লেন থেকে মেয়ের বাড়িতে গেল চন্দ্রনাথ। দয়াময়ী ফিরল না। বিপাশার শোয়ার ঘরে দরজা বন্ধ করে চন্দ্রনাথের সঙ্গে দয়াময়ীর কী কথা হয়েছিল, বিপাশা জানে না। চন্দ্রনাথ, দয়াময়ী, কেউ বলেনি তাকে। আমিও কখনও জানতে পারিনি। বাবা যে আসল ঘটনা মাকে বলেনি, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিছুটা আঁচ করেছিলাম। ছেলের নাম উচ্চারণ না করে চন্দ্রনাথ হয়ত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছিল। ছেলেকে ষোলআনা নির্দোষ ধরে নিয়ে স্বামীকে নিরপরাধ ভাবার বদলে, তার ওপর ঘৃণা দয়াময়ী উগরে দিয়েছিল। বাজপড়া মানুষের মত সেদিন মাঝদুপুরে চন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরেছিল। চন্দ্রনাথের সঙ্গে না ফিরলেও সাত দিন পরে দয়াময়ীকে লেবুতলার বাড়িতে বিপাশা পৌঁছে দিল। মা, বাবার নিদারুণ মন কষাকষি শুরু হয়েছে টের পেলেও কারণটা বিপাশা জানতে পারেনি। অঘোরবালাও অন্ধকারে থেকে গেল। ষাট পেরনো মেয়ে আর সত্তর ছুঁইছুঁই জামাইয়ের কলহ অঘোরবালার কাছে হেঁয়ালি মনে হয়েছিল। তিন বছর পরে এক দুপুরে অঘোরবালার বাড়িতে এসে, চন্দ্রনাথ যখন দয়াময়ীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পরিকল্পনা তাকে জানায়, নব্বই বছরের বুড়ির ভিমি খাওয়ার দশা হয়েছিল। আমি তখন চেতলার বাসিন্দা। দয়াময়ীকে চন্দ্রনাথের ডিভোর্স করার পরিকল্পনার খবর আমার কানেও পৌঁছেছিল। আমি জানতাম, সবটাই গুজব। দয়াময়ীকে ভয় দেখাতে চন্দ্রনাথ রটাচ্ছে।

তার আগে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল। ঘটনার গতি ঘুরে যেতে আমি স্বস্তি পেয়েছিলাম। আমাকে বাঁচাতে চন্দ্রনাথ বেঁচে থেকেও জীবন্মৃত হয়ে গেল। প্রমীলা আরও দু'মাস কাজ করার পরে সাত দিনের ছুটিতে দেশে গিয়ে আর ফিরল না। আমার ধারণা, প্রমীলার ফেরার রাস্তা, চন্দ্রনাথই বন্ধ করে দিয়েছিল। টাকা দিয়ে অথবা অন্য কাজের ব্যবস্থা করে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে প্রমীলাকে সরিয়ে ফেলেছিল। এমনও হতে পারে, প্রমীলা তার দেশের ভিটেতে থেকে গিয়েছিল। নগদ টাকার চাকরি করতে আর কোথাও যায়নি। টাকা তার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছিল। লেবুতলার বাড়িতে সে আর ফেরেনি। তাকে শাড়ি, টাকা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, তা রাখার সুযোগ হয়নি। সে ফিরে এলেও আমার দেওয়া জিনিস নিত কিনা জানি না। মাঝে মাঝে ভাবতাম, প্রমীলা যদি আবার ফিরে আসে, আমি কী করব? পাশাপাশি অন্য এক চিন্তা, একই সঙ্গে মাথায় আসত। আমাদের বাড়ি ছেড়ে দেশে গিয়ে প্রমীলা যদি নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা আবিষ্কার করে থাকে এবং যথাসময়ে একটা সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে গর্ভধারণ নিয়ে স্বামীকে কী বলবে? স্বামী কি বিশ্বাস করবে তার ব্যাখ্যা? তেমন কিছু কি ঘটেছে? সেই সন্তানকে নিয়ে প্রমীলা কখনও আমার কাছে এলে, আমি কী করব? এলোপাথাড়ি যতো চিন্তা পাঁচ বছর ধরে আমাকে জর্জরিত করেছে।

সেই রাতের পরে ঘটনা নিজের নিয়মে এগোচ্ছিল। প্রমীলা চলে যেতে ব্যারাকপুরে বীথিকার বাড়ি থেকে দয়াময়ীকে চন্দ্রনাথ আবার আনতে গিয়েছিল। লেবুতলার বাড়িতে পনের দিন থেকে দয়াময়ী ব্যারাকপুরে বীথিকার বাড়ি গিয়ে বেশ কিছুদিন ফিরল না। চন্দ্রনাথের সঙ্গে দু'পা হাঁটার ইচ্ছেও তার চলে গিয়েছিল। সংসারে বড় একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠলেও বুঝতে পারেনি। চোখে ঝিলিক, ঠোঁটে হাসি নিয়ে প্রমীলা বাসন মাজছিল, সংসারের কাজ করছিল। তাকে দয়াময়ীর ফরমাশ করা অবশ্য বন্ধ হয়েছিল। আমি অনুতাপে পুড়তে শুরু করেছিলাম। দয়াময়ী বারমুখো হয়ে গিয়েছিল। মরুভূমির মত হয়ে উঠেছিল তার সংসার। পাঁচ বছর পরে মরুভূমিতে বৃষ্টি নেমেছে। লালপাড় শাড়ি, সিঁদুর আলতা, শাঁখা, নোয়াতে জমকালো এয়োতি সেজেছে দয়াময়ী। চন্দ্রনাথ সেনের সংসার আবার সবুজ হয়ে উঠবে।

আড্ডায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে রাত দশটায় বাড়ি ফিরলাম। ডোরবেলের বোতাম টিপতে দরজা খুলল নবনীতা। ফ্ল্যাটে ঢুকে আমি দেখলাম, চন্দ্রনাথের কাঠগোলার সরকার, মহেশ কুণ্ডু দালানে একটা চেয়ারে, ঝোড়োকাকের মত বসে আছে। বাতাসে ভুরভুর করছে চোলাই মদের গন্ধ। আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে নবনীতা বলল, বাবা নেই।

মুখে আঁচল চেপে নবনীতা ঘরে ঢুকে যেতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কুণ্ডুবাবু বলল, রাত আটটায় বড়বাবুকে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে, কী যে ঘটল!

গলায় শ্লেষ্মা জমে কুণ্ডুবাবুর কথা আটকে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে কুণ্ডুবাবু বলল, নার্সিংহোমে তখনও অনেক আত্মীয়স্বজন। গিন্নিমাও হাসিমুখে সবে কেবিন থেকে বেরিয়ে বাড়ি রওনা হয়েছেন, ব্যস!

শ্লেষ্মায় আবার জড়িয়ে গেল কুণ্ডুবাবুর কথা। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম! চন্দ্রনাথের মত পাকা অভিনেতা নাটকের শেষ দৃশ্যে এত খারাপ অভিনয় করবে, আমি ভাবিনি। আমার চোখে জল এল। তখনই মনে হল, না, অভিনয়ে চন্দ্রনাথ ভুল করেনি। চন্দ্রনাথের অভিনয় আমিই বুঝতে পারিনি। সে ক্ষমতা আমার নেই। মঞ্চ থেকে কখন সরে যেতে হয়, চন্দ্রনাথ জানত। বিকেলে আমাকে বলেছিল, দয়াময়ী যে কথা ভুলে গেছে, তাকে সেই কথা আর মনে করানোর দরকার নেই। জীবনের কিছু ঘটনা ভুলে যেতে হয়।

চন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে হয়তো তার কথা মেনে নিতাম। নার্সিংহোম থেকে আমি বেরিয়ে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার মারা যাওয়ার খবর শুনে আমার যতো ভাবনা অগোছালো হয়ে গিয়েছিল। দয়াময়ীকে যে ঘটনা চন্দ্রনাথ কখনো জানাতে পারবে না, তা বলবার দায়, আমার ঘাড়ে চেপে গেল। কথার জালে আমাকে বেঁধে রেখে পৃথিবী থেকে চন্দ্রনাথ চলে গেছে। সংসারমঞ্চে চন্দ্রনাথের বাকি অভিনয় এখন আমাকে করতে হবে। মা, দয়াময়ী সেনের মুখোমুখি আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে চন্দ্রনাথ। মঞ্চ ছেড়ে আমার পালানোর উপায় ছিলনা।

বারো

বর্ষা শেষ হতে না হতেই শরতের কান ঘেঁষে এবার পুজো। পুজোর দিনগুলো বৃষ্টিতে ভাসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে চারপাশ খোলা কংক্রিটের ছাতার তলায় বসে মনে হল, জলস্রোতের সঙ্গে আকাশ থেকে আমিও নেমে আসছি। মাটি পর্যন্ত না নেমে, জলস্তম্ভে ঠেকে গিয়ে বাতাসে ভাসছে আমার ছাতা লাগানো দোলনা। ছাতার তলায় দুলুনি টের পাচ্ছি। গীতগোবিন্দমে বর্ণিত, এ যেন প্রলয়কালের বৃষ্টি, প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্। পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে। আমি ভেসে যাব। গঙ্গার ঘাটে যারা তর্পণ করছিল, তাদের সাড়া নেই। ঝড়বৃষ্টির দাপট দেখে তর্পণকারীরা নিশ্চয় জল থেকে উঠে পড়েছে। জোয়ারের গঙ্গায় এখন থাকা যে নিরাপদ নয়, পাকা সাঁতারু বিকাশ জানে। সাঁতার কাটার ঝুঁকি সে নেবে না। তর্পণ শেষ করে সেও গাড়িতে গিয়ে বসেছে। ঘাটের উল্টোদিকের মাঠে তার গাড়ি আগলে ড্রাইভার বাদল সকাল থেকে বসে রয়েছে। আমাকে বাড়ি থেকে বিকাশ-ই নিজের গাড়িতে নিয়ে এসেছে। সে-ই বাড়িতে পৌঁছে দেবে। আমার খোঁজে এই বৃষ্টিতে গাড়ি থেকে বিকাশ যেমন নিজে বেরোতে পারছে না, তেমনই বাদলকে পাঠাতে সঙ্কোচ বোধ করছে। ব্যবসাতে বিস্তর টাকা কামালেও আজও সে আগের মত ভদ্র, চক্ষুলজ্জা আছে, রুচি খাটো করেনি। ব্যবসায়ী সম্পর্কে বাঙালির বস্তাপচা ধারণার সঙ্গে আমার স্কুলের এই বন্ধুকে মেলানো যাবে না। বিকাশ সত্যিকার ভদ্রলোক ব্যবসায়ী।

ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম এবং অবৈজ্ঞানিক সবরকম ধারণাতে আমি অবিশ্বাসী হয়েও বিকাশের পাল্লায় পড়ে সকাল আটটায় গঙ্গার ঘাটে তর্পণ দেখতে এসেছি। তর্পণের চেয়ে বেশি করে চোখে পড়েছিল ভোরের আলোয় ভাসন্ত গাঙেয় কলকাতা শহর, ফোর্ট উইলিয়ামের রহস্যমাখানো আকাশরেখা, সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ, ঘাসের ভেতর থেকে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা সবুজতর গাংফড়িং, আহা! কতদিন এসব দেখিনি! সূর্যোদয় দেখিনি, এমন তাজা সকাল দেখিনি, কত দিন! আমার বুকের ভেতরটা ভরে উঠেছিল। শরতের সকালে গঙ্গার ঘাটে এসে মনে হয়েছিল, চাঁদ সদাগর, লখিন্দরের দেশে চলে এসেছি। আমার সামনে এখনই কালকেতু, ফুল্লরা এসে দাঁড়াবে। ছাতার তলায়, দমকা বাতাসে বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিলেও খারাপ লাগছে না। বিকাশের মত গঙ্গায় নেমে তর্পণ না করলেও টের পাচ্ছি, আমার চারপাশে আকাশগঙ্গা বয়ে চলেছে। প্রয়াত মা, বাবা, দয়াময়ী আর চন্দ্রনাথ সেনের মত পৃথিবী ছেড়ে যে সব প্রিয়জন চলে গেছে, তাদের মনে পড়ছে। নির্জন ছাতার চারপাশে অগুনতি বৃষ্টির ফোঁটার মত তারা নেমে আসছে। আমাকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে। গঙ্গার স্রোতে, গাছপালায়, ভিজে ঘাসে তাদের উপস্থিতি টের পাচ্ছি।

তর্পণের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে কয়েকদিন আগে প্রখর যুক্তিবাদী বিকাশ বলেছিল, ‘পৃথিবী থেকে কিছু হারায় না। আপাতভাবে যাকে হারানো মনে হয়, আসলে তা রূপান্তর, বস্তুর চেহারার পরিবর্তন ঘটে। জল কখনও বরফ হয়, কখনও মেঘ। মানুষও তাই। দেহের বিন্যাস থেকে মাটি, জল, আলো বাতাসে মানুষ মিশে যায়।

বস্তুর রূপান্তর সরল। মানুষের রূপান্তর জটিল, তাকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনা যায় না। তার কথা ভুল নয়। বিজ্ঞানের সত্যকে শাস্ত্রীয় আচারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়াতে আমার আপত্তি। শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে লোকাচার সম্পর্কে আমার আগ্রহ থাকলেও মাতামাতি করার মত সেখানে কিছু পাইনি। আমাকে কেউ নাস্তিক ভাবলে, ভুল করবে না।

গঙ্গার ধারে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে, এখন বুঝতে পারছি, শুধু দর্শক সেজে এলেও আমার ভেতরে কিছু ঘটে যাচ্ছে। গঙ্গায় স্নান, তর্পণ না করেও আমি ধৌত হচ্ছি, শোধিত হচ্ছি। পাপ, তাপ ধুয়ে অমলিন হওয়ার ইচ্ছে আমাকে আলোড়িত করছে। আলোড়ন, শোধন, একসঙ্গে চলেছে।

মারা যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে, মৃত্যু আসন্ন জেনেও, আমাকে চন্দ্রনাথ সেন কিছু বুঝতে দেয়নি। আমি তার বিছানার পাশে ছিলাম। লংলাইফ নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে চন্দ্রনাথ শান্ত গলায় কথা বলেছিল আমার সঙ্গে। কিছু পরামর্শ দিয়েছিল। বিছানার পাশে আমি ছাড়া কেউ ছিল না। কেবিনের দরজা খুলে স্ত্রী, দয়াময়ীকে ঢুকতে দেখে পাঁচ বছরের বিচ্ছেদ, জোড়া দিতে চন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সব বিরোধ মিটিয়ে মৃত্যুর আগে আমার মা, দয়াময়ীকে দায়মুক্ত করে দিতে চেয়েছিল। বিচ্ছেদের কারণ যে এই অধম, আমি, চন্দ্রনাথ, দয়াময়ীর সেজ ছেলে, তা পাঁচ বছর চন্দ্রনাথ কাউকে বলেনি। দয়াময়ীকেও নয়। দয়াময়ীর সঙ্গে একান্তে চন্দ্রনাথকে কথা বলার সুযোগ করে দিতে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। আমি জানতাম, পাঁচ বছর বাদে সম্পর্ক জোড়া লাগানোর সময়েও স্ত্রীকে গোপন কথাটা চন্দ্রনাথ বলবে না। যা জানতাম না, তা হল, বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না। দয়াময়ীও জানত না, তার সঙ্গে শেষবার কথা বলার জন্যে চন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছে। বলা ভাল, বেঁচে আছে। স্বামীর সঙ্গে এ জীবনে কথা বলার সুযোগ দয়াময়ী আর পাবে না। নার্সিংহোমে, কেবিনের বাইরে যারা অপেক্ষা করছিল, তারাও ভাবতে পারেনি, আধ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চন্দ্রনাথ চলে যাবে। পাঁচ বছর কথা বলা বন্ধ থাকার পরে পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধার সঙ্গে বাহাত্তরের এক অসুস্থ বৃদ্ধের ভাব হওয়ার দৃশ্যটা দেখার জন্যে তারা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। দুই পুত্রবধূ আর নাবালক কয়েকজন নাতি-নাতনির আগ্রহ ছিল বেশি। তারা দেখেছিল, চন্দ্রনাথের বুকে, পিঠে দয়াময়ী হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রশান্তিতে বুজে গেছে চন্দ্রনাথের চোখ। শিশুর মত চুপ করে সে শুয়ে ছিল। পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে শেষবারের মত সহধর্মিণীর হাতের সেবা নিচ্ছে, কাউকে বুঝতে দেয়নি। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এসেও চন্দ্রনাথের কথাগুলো আমি ভুলতে পারছিলাম না। আমাকে চাঙ্গা রাখতে চন্দ্রনাথ বলেছিল, জীবনে অনেক কিছু ঘটে, সব মনে রাখতে নেই। কেউ রাখে না। পাঁচ বছর আগে কী ঘটেছিল, ভুলে যাও। মন থেকে ঝেড়ে ফেল।

চন্দ্রনাথের কথাতে আশ্বাস ছিল, স্নেহ ছিল গলার স্বরে। তার সংসারকে আমি উচ্ছন্নে পাঠালেও, কথাটা সে কাউকে জানায়নি। পাঁচ বছর ধরে অশান্তির কীট, তাকে ভেতর থেকে খেয়ে ফোঁপরা করে দিলেও কাউকে নিজের কষ্ট বুঝতে দেয়নি। পাঁচ বছর আগের একটা রাতকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে চন্দ্রনাথ ভুলে যেতে বললেও আমি

পারিনি। বাবাকে নিয়ে মায়ের মনে যে সন্দেহের বিষ আমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, চন্দ্রনাথ মারা গেলেও দয়াময়ীকে তা ছেড়ে যায়নি। দয়াময়ীর মিথ্যে সন্দেহ মেনে নিয়ে পৃথিবী থেকে চন্দ্রনাথ চলে গেছে। চন্দ্রনাথ মারা যেতে সংসারের ভেতরকার নিঃশব্দ কলহ থামলেও ভাঙা সংসার জোড়া লাগেনি। স্বামীর মৃত্যুতে দয়াময়ী শোক পেয়েছিল। শোক কমতে মুখে যে বিষাদ ফুটে থাকল, তার কারণ, আমি জানতাম। চাপা কষ্ট দয়াময়ীর মনে থেকে গিয়েছিল। দয়াময়ীর নীরব অভিযোগ থেকে চন্দ্রনাথকে খালাস না করা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে চন্দ্রনাথ চলে গেলেও এক রাতের ঘটনা দয়াময়ীকে জানাতে তার সামনে আমি বারবার গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলাম। বলতে চাইছিলাম, মা তোমাকে কিছু বলার আছে। আমি তোমার সবচেয়ে খারাপ ছেলে। আমার অপরাধের দায় কাঁধে নিয়ে পাঁচটা বছর বাবা দগ্ধেছে। সাত তাড়াতাড়ি সংসারের পাট শেষ করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। সব দোষ আমার। তুমি অভিশাপ দাও আমাকে। তোমার দৃষ্টিতে আমাকে ছাই করে দাও। আমি শান্তি পাব, আরাম পাব।

মনের মধ্যে নাটুকে সংলাপ উথলে উঠলেও দয়াময়ীর সামনে গিয়ে মুখ খুলতে পারিনি। 'মা' বলে ডাকার পরের মুহূর্তে আমার স্বরনালী অসাড় হয়ে গেছে। আমার মুখের দিকে এক লহমা তাকিয়ে কোনও প্রশ্ন না করে তুমি শুরু করেছ আত্মকথন, তোমার নিজের কথা। পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে, বলার মত কথা, তোমার কম জমেনি। চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে সেন পরিবারে ঘটনা থেমে ছিল না।

চন্দ্রনাথের আচমকা মৃত্যুর জন্যে ছেলেমেয়ে, আত্মীয়পরিজনের কেউ কেউ আড়ালে দয়ামযীকে দায়ী করেছিল। চন্দ্রনাথের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করে সাজানো সংসারটা দয়াময়ী মরুভূমি করে দিয়েছিল, এ অভিযোগ পরিবারের মধ্যে উঠেছিল। দু-একজন বলেছিল, স্বামীর সঙ্গে এত নিষ্ঠুরতা কোনও স্ত্রী করতে পারে না।

বাতাসে ভেসে এসব অভিযোগ দয়াময়ীর কানে এলেও সে চুপ করে থাকত। মাঝে মাঝে তার দুচোখ ছলছল করে উঠত। আমাকে দেখলে এটা বেশি হত। ফাঁকা ঘরে বসে এক দুপুরে আমাকে দয়াময়ী বলেছিল, জেনেশুনে আজ পর্যন্ত কোনও অন্যায় না করেও সংসারে চোর সেজে আছি। আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

দয়াময়ীর কথা শুনে একটু হলে আমি কেঁদে ফেলতাম। কোনও মতে কান্না সামলে বলেছিলাম, কোনও অন্যায় তুমি করনি। পাপ করেছি আমি, অনেক খারাপ কাজ করেছি।

আমার কথাকে আমল না দিয়ে দয়াময়ী বলেছিল, ষাট, ষাট, এ সব বলতে নেই। ছেলেমেয়েরা পাপ করতে পারে না, তারা পাপ করলে, তার দায় মা-বাবা নেয়। তারা প্রায়শ্চিত্ত করে।

দয়াময়ীর মুখে কথাটা একাধিকবার শুনে আমি চমকে উঠলেও দয়াময়ীকে সেই রাতের বিবরণ শোনানোর সুযোগ আমি পাইনি। সে সুযোগ দয়াময়ী দিত না। লেবুতলার বাড়িতে কখনও গেলে উদ্ভট কোনও কাজ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিত। কখনও খুলে বসত স্মৃতির ঝাঁপি। ঝাঁপি সহজে বন্ধ হত না। স্মৃতিচারণে বুঁদ হয়ে

যেত দয়াময়ী। টানটান কাহিনী। শুনতে শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে আসা অসম্ভব ছিল। দয়াময়ীকে আমি নিজের কথাটা বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না।

চন্দ্রনাথ সেন মারা যাওয়ার এক বছর পরে ঘটা করে তার 'বাৎসরিক' হল। বাৎসরিকের পাঁচ-সাতদিন পরে মায়ের সঙ্গে শেষ দুপুরে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অফিস থেকে বেরনোর আগে ঠিক করেছিলাম, আজ দয়াময়ীকে সব বলব। তার মন থেকে চন্দ্রনাথ সম্পর্কে সন্দেহ মুছে দেব। কাজটা না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না। চন্দ্রনাথের বাৎসরিক কাজের পরে সেই দুপুরটা আমি কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম। দশ বছর আগে এক গভীর রাতে, সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়ানো দয়াময়ীর দেখাতে যে ভুল হয়েছিল, জানিয়ে দেব। আমি ঘরে ঢুকে কথা শুরু করার আগে, পালঙ্কে আধশোয়া দয়াময়ী বলল, সাতদিন তারাঠাকুরপোর খোঁজ নেই। তোর মালতীকাকির সঙ্গে দেখা কর একবার। আজই যা।

ছেলেবেলা থেকে কিশোর বয়স পর্যন্ত আমি যে তারাপ্রসাদ কাকার স্ত্রী মালতীকাকির ন্যাওটা ছিলাম, দয়াময়ী জানত। আমি বড় হওয়ার পরে, তারাপ্রসাদের বাড়িতে, দরকারে-অদরকারে আমাকে পাঠাত দয়াময়ী। দয়াময়ীকে বললাম, চেতলায় ফেরার পথে মালতীকাকির কাছে গিয়ে তাদের খোঁজখবর করব। কালই সব জানাব তোমাকে।

আমার কথাতে দয়াময়ী খুশি হল। মেলে ধরল স্মৃতির ঝাঁপি। বলল, তারাপ্রসাদ শুধু আমার দেওর নয়, ছোটভাই। তোদের দেবুমামা আমার কাছে যা ছিল, তারাঠাকুরপো তাই।

দয়াময়ীর কপাল থেকে দুশ্চিন্তার রেখা মুছে গিয়েছিল। আত্মীয়পরিজনের পাশে তাদের বিপদে দয়াময়ী সব সময়ে দাঁড়িয়েছে। পনের বছর আগে হলে, আমার ভরসায় না থেকে, তারাপ্রসাদের বাড়িতে দয়াময়ী নিজে চলে যেত। বিরানব্বই বছরের মা, অঘোরবালাকে দয়াময়ী তখনও দেখভাল করছে। রিকশায় চেপে হপ্তায় একবার শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে মায়ের কাছে না গেলে রাতে ঘুমোতে পারত না। নিজের বাড়িতে থেকেও অঘোরবালা বেঁচেছিল দয়াময়ীর পরিচর্যাতে। কাছের, দূরের সব আত্মীয়ের জন্যে দয়াময়ীর সাহায্যের হাত বাড়ানো থাকত। স্নেহে কম-বেশি না ঘটলেও চন্দ্রনাথের পিসতুতো ভাই, তারাপ্রসাদকে আপন দেওরদের চেয়ে বেশি স্নেহ করত। স্নেহভাজন মানুষটা ছাড়া এই ফারাক কেউ বুঝত না। তারাপ্রসাদ বুঝত। মায়ের মত ভক্তি করত দয়াময়ীকে। ভরদুপুরে হোক, অথবা রাত নটায়, বাড়ির সদর দরজা থেকে 'বৌদি, খুব খিদে পেয়েছে', হাঁক দিয়ে দোতলায় উঠে আসত। দোতলার দালানে তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে দয়াময়ী জিজ্ঞেস করত, কী খাবে?

মা অন্নপূর্ণা যা খাওয়াবেন।

ঠোঁট টিপে হেসে ভাঁড়ারে যা থাকত, সব সাজিয়ে তারাপ্রসাদকে দয়াময়ী খেতে দিত। ফলার খেতে তারাপ্রসাদ ভালবাসত। কাঁসার জামবাটিতে ঘন দুধে মুড়ি, মুড়কি, মর্তমান কলা, আমের সময়ে আম, নরম পাকের সন্দেশ মেখে হাপুস-হুপুস করে তারাপ্রসাদ খেত। দয়াময়ীর হাতে তৈরি সরুচাকলি, পাটিসাপটা, পিঠে, বকুল পিঠে, নলেন গুড়ে চোবানো রসবড়া খেয়ে তারাপ্রসাদ বলত, গ্র্যান্ড হোটেলের ম্যানেজারের

উচিত সেখানের রাঁধুনিদের তোমার কাছে রান্না শিখতে পাঠানো!

মুচকি হেসে দয়াময়ী জিজ্ঞেস করত, আর দুটো সরুচাকলি দেব? বেশ, দুটো রসবড়া খাও।

দু'হাত জুড়ে তারাপ্রসাদ বলত, রক্ষে কর। আজ আর নয়।

তারাপ্রসাদের মত চন্দ্রনাথের ছোট দু'ভাই রাধানাথ আর সীতানাথও ছিল দয়াময়ীর অনুরক্ত। রগচটা সীতানাথও ভাল ছেলের মত পালঙ্কে দয়াময়ীর মুখোমুখি বসে নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলত। সকলের কাছে দয়াময়ী ছিল সমান নির্ভরযোগ্য।

দয়াময়ী বলত, তোর ঠাকুর্দা, রাজনারায়ণ সেনের সবচেয়ে পেয়ারের ভাগ্নে হল তারাঠাকুরপো। মামাকে তারাঠাকুরপো সমীহ করত। মামা হুকুম করলে বাঘের দুধ পর্যন্ত এনে দিতে পারত। তিন ছেলের চেয়ে ভাগ্নের ওপর রাজনারায়ণের ভরসা ছিল েবশি। মামা ডেকে পাঠালে, 'না' বলা দূরের কথা, তারাঠাকুরপো যেখানে থাকুক, চলে আসত।

পুরনো দিনের কাহিনীতে দয়াময়ী ভেসে যেত। আমি শুনতাম অজানা যত ঘটনা। চন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ের পরে টালিগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতে তিন বছর দয়াময়ী ছিল। বড় ছেলে অরিন্দমের জন্মের পরে বৌবাজারের লেবুতলাতে বাড়ি কিনেছিল চন্দ্রনাথ। টালিগঞ্জ রাজনারায়ণের বাড়ির চেয়ে বড় ছিল বৌবাজারের বাড়ি। বড় ছেলের নতুন বাড়ি দেখে রাজনারায়ণ বলেছিল, আমার একটা ছেলে রাজার মত হয়েছে।

প্রথম ব্যবসাতে বেশিরভাগ বাঙালি মার খেলেও চন্দ্রনাথ তা হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে উল্টোডাঙার খালধারে কাঠের একটা গোলা কিনে ঢিমেতালে যে ব্যবসা শুরু করেছিল, যুদ্ধ লেগে যেতে সেখানে জোয়ার এল। সারাজীবনে একজন সফল ব্যবসায়ী যা আয় করতে পারে, সাত-আট বছরে তার পাঁচগুণ কামিয়ে নিল। জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা তখন কাঁপছে। শহরের বড় বড় বাড়ি জলের দরে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। বৌবাজার পাড়ার লেবুতলাতে সেরকম একটা বাড়ি, আসলের সিকি দামে, চন্দ্রনাথ কপাল ঠুকে কিনে নিল। বোমার ভয়ে, ঘরবাড়ি বেচে শহর ছেড়ে যারা পালিয়েছিল, ছ'মাস পরে, ফিরে এসে তারা দেখল কলকাতার গায়ে আঁচড় লাগেনি। কলকাতা আছে কলকাতাতেই। অক্ষশক্তি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে আপসোসে তারা কপাল চাপড়াতে থাকল। হা-হুতাশ করা ছাড়া তারা কী-ই বা করতে পারত!

বৃদ্ধ রাজনারায়ণকে টালিগঞ্জ থেকে বৌবাজারে ছেলের বাড়িতে বেশিরভাগ সময়ে তারাপ্রসাদ নিয়ে আসত। বাবার সঙ্গে দেখা করতে দয়াময়ীকে নিয়ে চন্দ্রনাথ যেত টালিগঞ্জের বাড়িতে। বাবা-ছেলেতে যোগাযোগ থাকলেও, তাদের সম্পর্কের মধ্যে তাপ ছিল না। রাজনারায়ণের স্ত্রী, শশিমুখীর যত টান ছিল মেজ ছেলে রাধানাথের ওপর। রাধানাথ আর তার সংসারকে আগলে রাখতে রাজনারায়ণের লোহার সিন্দুক খুলে শশিমুখী প্রায়ই টাকা সরাত। কর্তা-গিন্নিতে এ নিয়ে মাঝে মাঝে তুলকালাম ঝগড়া লেগে গেলে লেবুতলাতে ছেলের কাছে রাজানারায়ণ চলে আসত। দয়াময়ীর হাত ধরে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে রাজনারায়ণ একবার বলেছিল, মা, তুমি ছিলে আমার

সংসারে লক্ষ্মী। আমার বাড়ি থেকে লক্ষ্মী চলে গেছে। তাই আমার এই দশা! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

শ্বশুরের গায়ে, পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করত দয়াময়ী। লেবুতলার বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে রাজনারায়ণ টালিগঞ্জে, নিজের বাড়িতে ফিরে যেত। টালিগঞ্জ থেকে রাজনারায়ণকে বৌবাজারে আনা এবং কয়েকদিন পরে তাকে আবার টালিগঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তারাপ্রসাদ পরম আনন্দে পালন করত। স্ত্রী শশিমুখী, আর মেজ ছেলে রাধানাথকে চাপে রাখতে গিয়ে রাজনারায়ণ যে ছোট ছেলে সীতানাথের মুঠোর মধ্যে চলে যাচ্ছে, দয়াময়ীকে এ খবর প্রথম দিয়েছিল তারাপ্রসাদ। পাটের দালালি করত রাজনারায়ণ। হেঁজিপেঁজি দালাল নয়, পয়সাওলা, সম্ভ্রান্ত ব্যাপারি ছিল। ডজনখানেক নামী চটকলে পাটের জোগান দিত। শ্যামনগর, ইছাপুরে তার দুটো পাটের গুদোম ছিল। বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সেখানে পাট ঢুকত, বেরত, আবার ঢুকত। গুদোম কখনও খালি থাকত না। সকালে খালি হলে সন্ধেতে বোঝাই হয়ে যেত। চব্বিশ পরগনা, হুগলি, নদীয়ার কয়েকশ পাটচাষীকে ফি বছর দাদন ধরিয়ে রাখত রাজনারায়ণ। মাইনে করা দু'জন গোমস্তা চাষীদের সঙ্গে লেনদেন তদারক করত।

টাকার অভাব রাজনারায়ণের ছিল না। শোয়ার ঘরের সিন্দুক খুলে বছরের যে কোনও সময়ে দু-চার লাখ টাকা সে বার করে দিতে পারত। সিন্দুকের দশাসই পাল্লা নিজের হাতে খুলত এবং বন্ধ করত। ছোট ছেলে সীতানাথকে হুগলির দুটো চটকলে পাট জোগানের ঠিকেদারি জুটিয়ে দিলেও। নিজের ব্যবসাতে নাক গলাতে দেয়নি। সীতানাথ সামলাত তার নিজের কারবার। পাট জোগানের কাজ শুরুর কয়েক বছরের মধ্যে ট্রাক, ট্যাঙ্কার কিনে। ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা চালু করেছিল সে। ব্যবসা ভাগ্য ভাল ছিল তার। যেখানে হাত দিত, সফল হত। সংসারে বৌ, মেজ ছেলের উপদ্রব ক্রমশ বাড়তে থাকলে সীতানাথকে নিজের ব্যবসাতে খানিকটা জায়গা রাজনারায়ণ ছেড়ে দিল। তবে ব্যবসার চাবিকাঠি হাতছাড়া করল না। সময় আলগা করে দিচ্ছিল তার মুঠো। রাজনারায়ণ টের পেলেও তার কিছু করার ছিল না। বুদ্ধিমানের মত সীতানাথ, নিজের মুঠো শক্ত করছিল।

বিষয়সম্পত্তিতে চন্দ্রনাথ উদাসীন না হলেও রাজনারায়ণের সম্পত্তির দিকে নজর দেওয়ার সময় তার ছিল না। ফুলেফেঁপে ওঠা নিজের ব্যবসা সামলাতে সে হিমশিম খাচ্ছিল। রোজ যেভাবে তার ব্যবসা বাড়ছিল, দিনের চব্বিশটা ঘণ্টা সেভাবে বাড়ছিল না। সময়কে টেনে বাড়ানো যায় না। চব্বিশ ঘণ্টাকে বাড়িয়ে পঁচিশ ঘণ্টা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে সে হাঁপিয়ে পড়ছিল। টাকার নেশা দয়াময়ীর একদম ছিল না। সে ছিল সত্যিকার নির্লোভ। শ্বশুরের সম্পত্তি নিয়ে চন্দ্রনাথকে কখনও একটা কথা বলেনি। টালিগঞ্জে, শ্বশুরবাড়িতে নিজের ঘরটা পর্যন্ত খালি করে দিয়ে এসেছিল। রাজনারায়ণের সম্পত্তির প্রসঙ্গ কেউ তুললে, দয়াময়ী সে কথায় কান দিত না। টালিগঞ্জ আর লেবুতলার দুটো বাড়ির মধ্যে যোগাযোগের সেতু ছিল তারাপ্রসাদ। সাধারণত মাঝদুপুরে আসত। কখনও-সখনও বিকেলে। গভীর রাতে বাড়ির সদর দরজার কড়া নেড়ে তারাপ্রসাদ ডাকলে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ী ভয় পেত। রাত

এগারটার পরে তারাপ্রসাদ এলে, সে যে কারও মৃত্যুর খবর নিয়ে এসেছে, বুঝতে পারত। তাদের অনুমানে সচরাচর ভুল হত না। বাড়িতে ঢুকে মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার কয়েক মিনিট পরে গম্ভীর মুখে তারাপ্রসাদ বলত, পাড়ার কুকুরগুলো কীভাবে যে আমার আসার কারণ টের পায়, জানি না। রাত নটার পরে, এখানে বেড়াতে এলেও আমাকে দেখে তারা হল্লা জুড়ে দেয়। এটা ঠিক নয়। কুকুরগুলোকে সহবৎ শেখানো দরকার। মৃত্যুসংবাদ দিয়ে, কুকুরদের সমালোচনা করে, তারপর যে ভাষায় তারাপ্রসাদ পুরো বিবরণ শোনাত, শোককাতর পরিবেশের সঙ্গে তা মানায় না। তবু শোনার জন্যে, দোতলার দালানে তারাপ্রসাদকে মধ্যমণি করে সকলে ঘিরে দাঁড়াত। তারাপ্রসাদের মুখ থেকে চন্দ্রনাথ সেনের দিল্লিবাসী জ্যাঠা, নরনারায়ণ সেনের মৃত্যুসংবাদ শোনার স্মৃতি আমার আজও মনে আছে। আমার বয়স তখন খুব বেশি সাত-আট। মাঝরাতে মায়ের আঁচলের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম তারাপ্রসাদের বিবরণ। পেশার চাপে সুপ্রিম কোর্টের ডাকসাইটে আইনজীবী, নরনারায়ণ, নাওয়া-খাওয়ার সময় পেত না। পায়খানা করে ধুতে ভুলে গিয়ে কতবার এজলাসে চলে গেছে, হিসেব নেই। হেগো পোশাকে কঠিন মামলা জিতে এসেছে। বিরোধীপক্ষের আইনজীবীরা এজলাসে নরনারায়ণের সওয়াল জবাবের পাশে দাঁড়াতে পারত না। প্রতিপক্ষের আইনজীবী আদালতে এসেও এজলাসে ঢোকেনি, এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। একতরফা জিতে আদালত থেকে বেরিয়ে এসেছে নরনারায়ণ। কিছুদিন ধরে শরীর খারাপের জন্যে নরনারায়ণ আদালতে বেরতে পারছিল না। গুজরাটি, পার্সি, মারোয়াড়ি মক্কেলরা উকিলবাবুর বাড়িতে চলে আসছিল। বাড়িতে সারাক্ষণ মক্কেল গিজগিজ করত। সকলের সঙ্গে কথা বলার সময় পেত না নরনারায়ণ। নরনারায়ণের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলার জন্যে পকেটে নোটের বান্ডিল নিয়ে কত মক্কেল যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত, হিসেব নেই। সেদিনও মক্কেলে বোঝাই ছিল বাড়ির একতলার ঘর। বেলা বারোটা পর্যন্ত মক্কেলদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে শরীর খারাপ লাগতে নরনারায়ণ দোতলায় উঠে গিয়েছিল। সকাল নটা থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে পাঞ্জাবির দু'পকেটে সাতাশ হাজার টাকা এসে গিয়েছিল। বড় মামিমাকে ডেকে সিন্দুকে টাকাটা রাখতে দিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল, সিন্দুকের চাবি কাছছাড়া করবে না। হ্যাঁ, আর একটা কথা, সিন্দুকের ভেতরে যত নোটের বান্ডিল আছে, সবগুলোতে, তোমার স্বামী এবং আরও অনেকের হাতের ময়লা লেগে আছে। বেশিরভাগ বড়লোক ছোঁচায় না। সিন্দুক থেকে টাকা বার করে সবসময় হাত ধোবে।

দালানের আবছা আলোতে কয়েক বছরের ছোট তারাপ্রসাদকে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, জ্যাঠামশাই কি তোর চোখের সামনে মারা গেল।

আলবৎ! অসুস্থ বড়মামাকে দেখতেই তো আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে বড়মামা যে কী খুশি হয়েছিল, বলার নয়। বারবার বলেছে, ঠিক সময়ে তুই এসেছিস। তোকে একটা জিনিস দেওয়ার আছে। বেশ কিছুদিন ধরে কথাটা ভাবছিলাম। তোকে হয়ত একটা চিঠি লিখতাম। তার আগে তুই এসে গেছিস। ভালই হয়েছে। একে বলে ভাগ্য! কাউকে বলবি না। ঠিক সময়ে দেব।

জিনিসটা কী?

দেওয়ার সুযোগ ঘটল না। সিন্দুকের চাবিটা বড় মামিমার হাতে দিয়ে বিছানায় শুয়ে শান্তভাবে বড় মামা মারা গেল। আমার হাতঘড়িতে তখন বিকেলে চারটে পনের মিনিট সাতাশ সেকেন্ড!

মৃত্যুসংবাদের এই অংশে শোকের ভাব কিছুটা ফিকে হয়ে আসতে তারাপ্রসাদ বলেছিল, বড় মামার শ্রাদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিল্লিতে আটকে গেলাম। শ্রাদ্ধের পরেও এক হপ্তা থাকতে হল।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, কেন?

ঘরের দরজায় ছিটকিনি এঁটে বড় মামিমার সামনে বসে সিন্দুক থেকে প্রত্যেকটা নোটের বান্ডিল বার করে সাবান জলে ধুতে হয়েছিল আমাকে। ধুয়ে, মুছে, পাখার হাওয়ায় শুকিয়ে সিন্দুকে, গুছিয়ে রেখে মামিমার হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম। দশ-পনের লাখ টাকার গন্ধ, আমার গায়ে লেগে গেছে। বড় মামা বোধহয় এটাই দিতে চেয়েছিল।

তারাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদ শোনানোর এই ছিল ধরন। গম্ভীর মুখে বিবরণ শুরু করে যেখানে শ্রোতাদের পৌঁছে দিত, সেখানে শোকের সঙ্গে মজা মিশে যেত। আমার বড়দি বীথিকার হাসির রোগ ছিল। তারাপ্রসাদের বিবরণ শুনে হাসি চাপতে সে অন্ধকারে সরে যেত। অন্ধকার থেকে ভেসে আসত তার হাসির খিলখিল আওয়াজ। আমার হিসেব মত কুড়ি বছরে কম করে দশটা মৃত্যুসংবাদ, আমাদের বাড়িতে তারাপ্রসাদ পৌঁছে দিয়েছিল। বেশিরভাগ খবর এনেছিল রাত এগারটার পরে। আমার বড় পিসি লতিকার স্বামী ধর্মদাস দত্তর মারা যাওয়ার খবর বৌবাজারের বাড়িতে রাত পৌনে একটায় তারাপ্রসাদ পৌঁছে দিয়েছিল। বৌবাজার থেকে তিন কিলোমিটার দূরে বেলেঘাটায় নিজের বাড়িতে রাত সওয়া নটায় ধর্মদাস মারা গিয়েছিল। তিন কিলোমিটার দূরত্বে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতে চার ঘণ্টা লাগার কারণও তারাপ্রসাদ নিজের মত করে শুনিয়েছিল। দোতলার দালানে রাত দুটোয় দয়াময়ীর তৈরি, লালসুতো দিয়ে 'স্বাগতম' লেখা আসনে বসে ঘন দুধের ফলার খেতে খেতে রাজনারায়ণ সেনের বড় জামাই, ধর্মদাস দত্তের জীবনের শেষ বিকেলটা তেলরঙে আঁকা ছবির মত তারাপ্রসাদ তুলে ধরেছিল। মৃত্যুকে প্রায় বোকা বানিয়ে ধর্মদাস মারা গিয়েছিল। মরার পাঁচ মিনিট আগেও মৃত্যুকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। লতিকাদির মুখে শুনলাম, বিকেল সাড়ে চারটের সময় চা-এর কাপ হাতে খাটে বসে লতিকাদির সঙ্গে হাসিঠাট্টা করেছে, ছোট ছেলে ধানু, খাটে ঘুমোচ্ছিল। তার পিঠে হাত রেখে আদর করে, তারপর কাতুকুতু দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়েছিল। কাতুকুতুতে ধানু বিছানায় লাফিয়ে উঠেছিল।

এক সেকেন্ড থেমে তারাপ্রসাদ বলেছিল, মজা করতে আপনজনদের জামাইবাবু কাতুকুতু দিতে ভালবাসত। আমাকে কতবার দিয়েছে। রাম কাতুকুতু! আঙুলে ভালবাসা ছিল। ভাল সেতার বাজাত তো। আজ বিকেলেও আমাকে কাতুকুতু দেওয়ার তালে ছিল জামাইবাবু। আমার আবার কাতুকুতুতে দারুণ ভয়। জামাইবাবুর হাতের নাগালের বাইরে থাকছিলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হতে আমাকে রাতে খেয়ে যেতে বলল।

জামাইবাবুর সঙ্গে লতিকাদিদি, বিজু, কুঁচোকাঁচারা এমন চেপে ধরল, না করতে পারলাম না। রাতে জামাইবাবুর সঙ্গে বসে ফুলকো লুচি, আলুভাজা, ছোলার ডাল, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, মালপো, রাবড়ি, এককথায় এলাহি খাওয়া হল। পানমশলা মুখে দিয়ে জামাইবাবু সিগারেট ধরাল। আমাকে সিগারেট দিল। সিগারেটে দু'টান দিয়ে প্রায় আস্ত সিগারেটটা ছাইদানে নামিয়ে রেখে জামাইবাবু বলল, শরীরে সামান্য অস্বস্তি হচ্ছে। আমি শুই।

জামাইবাবু বিছানায় শুতে লতিকাদি ঘরে এল। জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস করল, শুয়ে পড়লে কেন?

শরীরটা ভাল ঠেকছে না। প্রথমে জামাইবাবুর মুখের দিকে, তারপর বিছানার ওপর কয়েক সেকেন্ড নজর করে, লতিকাদি একটা ঢাউস পাশবালিশ বিছানায় রেখে জামাইবাবুকে বলল, এটা জড়িয়ে শোও।

পাশ বালিশটা জামাইবাবুর চেয়ে সাইজে বড়। সম্ভবত ওজনেও বেশি। পাশবালিশে মুখ গুঁজে, তার ওপর এক পা তুলে জামাইবাবু শুতে লতিকাদি জিজ্ঞেস করল, আরাম লাগছে?

হ্যাঁ।

ঘুমোও, বলে ঘরের আলো নিভিয়ে লতিকাদি পাশের ঘরে ফিরল। লতিকাদির সঙ্গে আমিও এলাম। রাত তখন নটা পাঁচ। বাড়ি ফেরার কথা ভেবেও পাশের ঘরে লতিকাদির সঙ্গে বসলাম। শ্যামবাজার পাড়ার কোন থিয়েটার হলে নাটক দেখে বিজু বাড়ি ফিরল। নাটকের নাম 'আমি মন্ত্রী হব'। জহর রায়ের অভিনয়ের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। ছেলেমেয়েদের খেতে দেওয়ার আগে লতিকাদি বলল, তোমার জামাইবাবু ঘুমোল কিনা, দেখে আসি।

আমাকে বসিয়ে রেখে লতিকাদি পাশের ঘরে গেল। দু-তিন মিনিট আমি বসে থাকার পরেও লতিকাদিকে ফিরতে না দেখে জামাইবাবুর ঘরে আমি গেলাম। জামাইবাবুর কপালে, গলায়, বুকে হাত রেখে লতিকাদি কিছু বুঝতে চাইছিল। আমাকে দেখে বলল, মানুষটা এমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে যে, দু-তিনবার ডেকেও সাড়া পেলাম না।

কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। লতিকাদি বলল, কী ঘামাই না ঘেমেছে।

জামাইবাবু ঘামছে শুনে কিছুটা স্বস্তি পেয়ে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দু'চোখ বুজে চিত হয়ে শুয়ে থাকা জামাইবাবুর মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে টের পেলাম, সব শেষ! জামাইবাবুর কাঁধে আলতো ঝাঁকুনি দিয়ে লতিকাদি বলছিল, এই যে শুনছ? এই যে?

জামাইবাবু যে নেই, লতিকাদিকে বলতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কী, আধঘণ্টা আগে যার সঙ্গে বসে লুচি, মালাইকারি খেয়েছি, সেই লোকটা পৃথিবীতে নেই, ভাবতে আমার অসুবিধে হচ্ছিল। লতিকাদিকে বললাম, তোমাদের হাউস ফিজিসিয়ানকে ফোন কর।

কেন? ডাক্তার ডাকব কেন?

জামাইবাবুকে একবার দেখে যাক।

বিজুকে বল।

ভাইবোনদের নিয়ে খাবারঘরে বিজু তখন 'আমি মন্ত্রী হব' নাটকের গল্প ফেঁদেছে। ভাতের থালা সামনে নিয়ে তারা হেসে কুটিপাটি। নাটকটা সকলে মিলে দেখতে যাওয়ার দিন ঠিক করছে, সবচেয়ে সুবিধের তারিখ খুঁজছে। তাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি খাবার ঘরে বসে থাকলাম। বিজু খেয়ে উঠতে তাকে হাউস ফিজিসিয়ানকে ফোন করতে বললাম। সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। ধর্মদাসের অসুস্থতার খবর তাকে জানাতে ভ্যাঁ করে কেঁদে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। সে আর এক মুশকিল। বিজুর জ্ঞান ফেরাতে বোনেদের একজন তার মাথা, মুখে জল থাবড়াতে থাকল। হাউস ফিজিসিয়ানকে অগত্যা আমি ফোন করলাম। দশ মিনিটের মধ্যে সে এসে গেল। ধর্মদাসকে একবার দেখে গা-ঢাকা চাদরে তার মুখ পর্যন্ত ডাক্তার ঢেকে দিতে তাকে জোর ধমক লাগাল লতিকা। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে মৃত জামাইবাবুকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে ডাক্তারকে বাধ্য করল। রুগী মৃত হলেও পুরনো রুগীর বৌকে চটাতে ভালমানুষ ডাক্তার সাহস পেল না। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে জামাইবাবুর সঙ্গে থাকল ডাক্তার আর লতিকাদি, সামনে, অ্যাম্বুলেন্স চালকের পাশে আমি বসলাম। 'রুগী মৃত' ঘোষণা করে হাসপাতাল ফিরিয়ে দিল আমাদের। বাড়ি না ফিরে আমাদের উপায় ছিল না। লতিকাদি তখনও ভাবছে, জামাইবাবু বেঁচে আছে। টাকা কামানোর লোভে ডাক্তাররা ষড় করে জ্যান্ত মানুষকে মৃত প্রমাণের চেষ্টা করছে। অসহায়ের মত বসে থাকা ছাড়া, ধর্মদাস দত্তের গৃহচিকিৎসকের কিছু করার ছিল না। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে জামাইবাবুর খবরটা টেলিফোনে জানাতে আমি ফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতো, লতিকাদি মারতে তেড়ে এল। হেঁচকা টানে দেওয়াল থেকে টেলিফোনের তারটা ছিঁড়ে ফেলল। টেলিফোনে জামাইবাবুর খবর কাউকে জানানোর উপায় থাকল না। রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত জামাইবাবুর মৃত্যু, লতিকাদি মেনে নিতে পারেনি।

জামাইবাবুর বরফের মত ঠাণ্ডা কপালে হাত রেখে লতিকাদি বসেছিল। বারান্দায় একটা কালো বেড়াল দেখে লতিকাদি হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। বিশ্বাস করল, ধর্মদাস দত্ত আর নেই।

ন'টা সাতাশ মিনিটে জামাইবাবু শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

চাঁচিপুঁচি করে ফলার খেয়ে, তারপর আরও দুটো সন্দেশ এক গ্লাস জল শেষ করে, তারাপ্রসাদ যখন আরামে ঢেকুর তুলল, তখন সেখানে চন্দ্রনাথ নেই। একটার পর একটা টেলিফোন করে ভগ্নীপতির মৃত্যুর খবর আত্মীয়দের দিচ্ছিল। মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমি হাঁ করে শুনছিলাম তারাপ্রসাদের কথকতা, পিসেমশাইয়ের শেষ কয়েক ঘণ্টার কাহিনী। লম্বা, মজবুত স্বাস্থ্য চওড়া কবজি, দশাসই কাঁধ, চেতানো বুক, মাথায় ঝাঁকড়া চুল তারাপ্রসাদকে আমার রূপকথার নায়ক মনে হত। মাঝরাতে তার গলা শুনলে গায়ে কাঁটা দিত। ঘুম ভেঙে গেলে মায়ের সঙ্গে দোতলার দালানে এসে দাঁড়াতাম। মায়ের আঁচলে আমার পুঁচকে শরীর ঢেকে থাকত। ভাইবোনরা সকলে

যখন অঘোরে ঘুমচ্ছে, আমি জেগে যেতাম। সব সময় একা নয়। ভাইবোনদের দু-একজন কখনও জেগে উঠত। মাঝরাতে তারাপ্রসাদের গলা শুনলে আমি বিছানায় থাকতে পারতাম না। সেই তারাপ্রসাদ নিরুদ্দেশ। সাতদিন তার খোঁজ নেই। তার হদিশ দয়াময়ী করতে বললে এড়াবো কি করে? সে উপায় ছিল না। কেনই বা এড়াবো। আমার আপনার দু'কাকার চেয়ে আমাদের পরিবারে তারাপ্রসাদ কাকার কদর ছিলনা। পরিবারের সকলের প্রিয়জন, সেই মানুষটাকে ঘিরে পুরনো স্মৃতি উথলে উঠতে থাকল।

উত্তর কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে এসে কয়েকদিন লেবুতলার বাড়িতে থাকার সময়ে রাজনারায়ণ মারা গেল। শ্বাসনালীতে কড়াপাক সন্দেশের টুকরো আটকিয়ে গিয়ে এক বিকেলে আমার ঠাকুর্দা, রাজনারায়ণ বেহুঁশ হয়ে যায়। ডাক্তার বলল, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, মাথার শিরা ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে। মগজের ভেতরে রক্তক্ষরণ, ইন্টার্নাল হেমারেজ। রক্ত পড়া বন্ধ হল না। রাত দশটায় রাজনারায়ণ মারা গেল। তারাপ্রসাদকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনিয়েছিল দয়াময়ী। তারাপ্রসাদের মত ভবঘুরেকে সেই সন্ধেতে যে বাড়িতে পাওয়া গিয়েছিল, সেটা দয়াময়ীর সৌভাগ্য। তখন বর্ষাকাল। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই সন্ধেতেও বৃষ্টির কামাই ছিল না। ছাতা নিয়ে কাকভেজা হয়ে সন্ধে সাতটায় আমাদের বাড়িতে তারাপ্রসাদ হাজির হয়েছিল। রাজনারায়ণের গলা থেকে তখন ঘড়ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে। 'মেজ মামা' 'মেজ মামা' বলে তারাপ্রসাদ দুবার ডাকল। রাজনারায়ণ সাড়া দিল না। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে তারাপ্রসাদ বলল, আমার ডাকে এই প্রথম মেজ মামা সাড়া দিল না, যাই রাধানাথদা আর সীতানাথদাকে ডেকে আনি।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে দেবুমামা এসেছিল সকলের আগে। দেবুমামা বলেছিল, দয়াময়ীর শ্বশুরবাড়ি, টালিগঞ্জে টেলিফোন করেছিলাম, বাড়িতে কেউ নেই।

তারাপ্রসাদকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাকা আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?

থমথমে মুখে তারাপ্রসাদ বলেছিল, মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার মত বয়স তোর হয়নি।

কথাটা বলেই কিছু ভুল হচ্ছে, টের পেয়ে সেটা শুধরে নিতে বলেছিল, কী যা-তা বকছি। বারবার বাজে একটা শব্দ 'মৃত্যুসংবাদ' বলে জ্যান্ত মানুষটাকে কেন মেরে ফেলছি? বিরাশি বছর ধরে ঘন দুধ, পাকা রুই খেয়ে যে হজম করেছে, আমার মত চুনোপুঁটির কথায় তার কিছু যায় আসে না।

চোখ থেকে টপটপ করে দু-ফোঁটা জল খসে পড়তে বাড়ি থেকে তারাপ্রসাদ বেরিয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টিবাদল মাথায় করে টালিগঞ্জ, ঠাকুরপুকুর, বেহালা, মানিকতলা হয়ে পাইকপাড়া, বরানগর এবং আরও কোথায় তারাপ্রসাদ গিয়েছিল সব আমার পক্ষে জানা সম্ভব না হলেও রাত দশটার পর থেকে আমাদের বাড়িতে আত্মীয়কুটুম আসতে শুরু করেছিল। তার আগে থেকে বাজতে শুরু করেছিল টেলিফোন। বিরাশি বছরের একজন মানুষের সম্পর্কের জাল ছোট হওয়ার কথা নয়। রাজনারায়ণের সম্পর্ক তার চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। রাত আটটায় বাড়ি ফিরে রাজনারায়ণের অবস্থা দেখে চন্দ্রনাথ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। সামলে নিতে সময় লাগেনি। তখনই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডেকে এনেছিল। বিশেষজ্ঞর কিছু করার ছিল না।

রাত দশটায় ঠাকুর্দার মুখে বাবা-দাদাদের সঙ্গে কোষাকোষী থেকে চামচে তুলে গঙ্গাজল দিয়েছিলাম। আধঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছিল রাজনারায়ণ। দোতলার দালানের ঘড়িতে তখন রাত ন'টা বিয়াল্লিশ। স্কুলের উঁচু ক্লাসে তখন আমি পড়ি। পরের বছরে মাধ্যমিক পাশ করেছিলাম। রাত একটায় রাজনারায়ণের মেজ ছেলে রাধানাথকে নিয়ে তারাপ্রসাদ ফিরেছিল। ছোট ছেলে সীতানাথের ট্যাঙ্কার চব্বিশ পরগণার সামালির কাছে ডোবায় পড়ে যাওয়ায় জনা পঁচিশ মজুর নিয়ে সেটা তুলতে সে এত ব্যস্ত, যে তার আসতে রাত কাবার হতে পারে। সে সোজা শ্মশানে চলে যাবে।

দয়াময়ীকে আড়ালে ডেকে সীতানাথের খবরটা দিয়ে তারাপ্রসাদ বলেছিল, বৌদি কথাটা এখন বলা উচিত নয়, তবু বলি আজ রাতে মেজমামার লোহার সিন্দুক, সীতানাথ ভাঙবে। সে সব পারে। টালিগঞ্জের বাড়িতে সে হয়ত এতক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

শ্মশানযাত্রীরা তখন দড়ি দিয়ে মজবুত করে রাজনারায়ণের খাট বাঁধাছাঁদা করছে। ঠাকুর্দার কপালে চন্দন পরাচ্ছিল আমার মেজদি, বিপাশা, বয়স সতের-আঠার, কলেজে ঢুকেছে। তার বিয়ের জন্যে দয়াময়ী ছেলে খুঁজতে শুরু করেছিল। কনের বেশে বিয়ের পিঁড়িতে বসা নাতনীকে দেখার দিন গুনছিল রাজনারায়ণ। বিপাশাকে প্রায়ই বলত, শুভ কাজটা একটু তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দে দিদি। সংসারে আর কতদিন আছি কে বলতে পারে! লজ্জায় লাল হত বিপাশার মুখ। ফিসফিস করে সে বলত, তুমি থাম তো দাদু!

রাজনারায়ণের কপালে চন্দন পরাতে গিয়ে চোখের জলে বিপাশার দৃষ্টি ঝাপসা হয় যাচ্ছিল। মেজদিকে দেখে মায়া হচ্ছিল আমার। দয়ময়ীকে তারাপ্রসাদ যা বলেছিল, তাই ঘটল। নিমতলা শ্মশানে রাজনারায়ণের চিতা নেভার পনের মিনিট আগে সীতানাথ হাজির হল। টকটকে লাল দুটো চোখ, বৃষ্টিতে ভেজা ধুতি, শার্ট তখনও শুকোয়নি। চিতার নিভন্ত আগুন একটা পাটকাঠির ডগা দিয়ে সীতানাথ খোঁচাচ্ছিল। চিতার সামনে ভিজে ধুতি, শার্ট, টানটান করে দুহাতে ধরে কখনও শুকিয়ে নিচ্ছিল। শ্মশানে রাজনারায়ণের সৎকারের বৃত্তান্ত শুনেছিলাম তারাপ্রসাদের মুখে। জাঁকজমক করে রাজনারায়ণের শ্রাদ্ধ হয়েছিল টালিগঞ্জের বাড়িতে। শ্রাদ্ধের সাতদিন পরে রাজনারায়ণের ঘরের লোহার সিন্দুক খুলে দেখা গেল সিন্দুক ফাঁকা। সিন্দুকের ভেতরে কাঁসার বাটিতে কয়েকটা তামার পয়সা, একটা তুবড়ানো রুপোর মাদুলি রয়েছে। সবাই জানত, সিন্দুকে কয়েক লাখ টাকা, রাজনারায়ণের বিয়েতে পাওয়া হীরের বোতাম, আংটি আছে। চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে রয়েছে বোতাম, আংটি। তারও আগে থেকে ছিল, রাজনারায়ণের বাবা বৃন্দাবন সেনের সোনার পকেটঘড়ি। সোনার চেন, সোনার ঢাকা লাগানো বিখ্যাত রদারহ্যাম কোম্পানির সেই ঘড়ি, মৃত্যুর সাতদিন আগে ছেলেমেয়েদের সামনে বৃন্দাবন উপহার দিয়েছিল মেজ ছেলে রাজনারায়ণকে। ঘড়িতে রাজনারায়ণ নিয়মমত দম দিলেও কখনও ব্যবহার করেনি। রদারহ্যামের পকেটঘড়িকে আমার ঠাকুমা বলত, রাধারমণের ঘড়ি। রাধারমণের ঘড়িও সিন্দুক থেকে উধাও। সিন্দুক কে ভাঙল, প্রশ্ন করার সাহস কারো হয়নি। রাজনারায়ণের ন্যাড়ামাথা তিন ছেলে,

মেয়ে লতিকা, বৌ শশিমুখী, কেউ কারও দিকে তাকায়নি। রাজনারায়ণের মৃত্যুর রাতে দয়াময়ীকে তারাপ্রসাদ যা বলেছিল, অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

দশ বছর আগে চন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুর রাতেও তারাপ্রসাদ আমাদের বাড়িতে ছিল। চন্দ্রনাথকে দাহ করতে আমাদের সঙ্গে শ্মশানে গিয়েছিল। পারিবারিক অশৌচের সেই দিনগুলোতে অভিভাবকের মত দাঁড়িয়েছিল আমাদের পাশে। নিজের সংসার ফেলে মালতীকাকি চলে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। দয়াময়ীকে কয়েকদিন ছায়ার মত আগলে রেখেছিল। মাঝরাতে চন্দ্রনাথের মরদেহ, শ্মশানে রওনা করার আগে বাড়িতে যখন কান্নার রোল উঠেছে, দোতলার ঘর খোলা জানলার সামনে বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে, চোরা হাসি ঠোঁটে নিয়ে তারাপ্রসাদ বলেছিল, আমার মরার খবর আত্মীয়কুটুমদের কে পৌঁছে দেবে, কে জানে। দেখিস বাবা, একটু যেন আগুন পাই!'

তারাপ্রসাদের শেষ কথাটা ঘরে যে তিন-চারজন ছিল তাদের কারও কানে গেল কিনা, বুঝতে না পারলেও আমি শুনেছিলাম। তারাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, তার কপালে ভাঁজ পড়েছে, সে যে বুড়ো হচ্ছে, সেই প্রথম নজর করেছিলাম। বছর ঘুরতে তারাপ্রসাদের কথা ফলে যাবে, ভাবতে পারিনি। নিরুদ্দেশ তারাপ্রসাদের বাসি শব খুঁজে বার করে তা দাহের আয়োজনও আমাকে করতে হয়েছিল।

তারাপ্রসাদ নিখোঁজ হওয়াতে সেই দুপুরে যে কথা বলতে দয়াময়ীর ঘরে ঢুকেছিলাম, বলতে পারিনি। আমার মনের মধ্যে না-বলা কথাটা তখনকার মত চাপা থেকে গেল। নিখোঁজ তারাপ্রসাদের হদিস করতে আমি কোমর বেঁধে নেমে পড়লাম। মায়ের হুকুম অমান্য করার ক্ষমতা আমার ছিল না। তারাপ্রসাদকাকার কাছে আমার পারিবারিক ঋণ কম নেই। পাইপয়সা পর্যন্ত শোধ করতে হবে। ঠিকানা খুঁজে সেই সন্ধেতে তারাপ্রসাদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। বাড়িটা অচেনা। বন্ধ সদর দরজার কড়া নাড়তে একটা পাল্লা খুলে ছবির মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল মালতীকাকি। এক বছর আগে, চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে যে মালতীকাকিকে দেখেছিলাম, তার থেকে সামনে দাঁড়ানো মানুষটা আরও রোগা হয়ে গেছে। আলগা হয়েছে চিবুকের ত্বক, চোখের তলায় কালি জমেছে। আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে মালতীকাকি বলেছিল, চন্দন! এস।

রিনরিনে গলা, জলে ধোয়া পান পাতার মত মুখ। পুরনো একতলা বাড়ির দুটো ঘর নিয়ে তারাপ্রসাদের বাসা। সংসারে সচ্ছলতা নেই, আমি জানতাম। মালতীকাকির কাছে গেলে বেশিরভাগ সময়ে রান্নাঘরের চৌকাঠ চেপে বসতাম। ভেতরে মালতীকাকি রাঁধত। আমাকে দেখে কাকির মুখে ছড়িয়ে পড়ত মেঘের আলোর মত হাসি। কোমরছাপানো চুল আলগা খোঁপায় বাঁধা। সামনের চুলে রুপোলি রেখা লেগেছে। বয়স বাড়লেও লাবণ্য কমেনি। আমার চোখের সামনে বড় হয়ে উঠেছিল তারাপ্রসাদের তিন ছেলেমেয়ে। শেষবার যখন এসেছিলাম, তখন স্কুল শেষ করে ছেলে অপু কলেজে ঢুকেছে। দুই মেয়ে, চম্পা লিলি বালিকা থেকে কিশোরী হয়েছে। মায়ের মত সুন্দরী হয়ে উঠলেও মালতীকাকির মায়া জড়ানো লাবণ্য তারা পায়নি। তাদের নিয়ে আমার আগ্রহ ছিল না। মালতীকাকির রান্নাঘরের চৌকাঠে বসলে পাড়াগাঁর বালকের মুগ্ধতা

আমাকে আবিষ্ট করত। সহজে উঠে আসতে পারতাম না। মালতীকাকির রিনরিনে সুরেলা গলা শুনলে মনে হত, সময় স্থির হয়ে গেছে। তারাপ্রসাদের পেশার সঠিক খবর আমার জানা ছিল না। শুনেছি, এক সময়ে চাকরি করত। চাকরি ছেড়ে ঠিকেদারি করেছে, কিছুদিন দোকান চালিয়েছে, রাধানাথের সঙ্গে গোবরগ্যাসের ব্যবসা করেছে, আরও কী করেছে, আমি জানতাম না। বেশিদিন কোনও পেশায় লেগে থাকার ধাত তার নেই, বুঝতে পারতাম। পেশা না থাকায় ঘনঘন বাসা বদলাতে হত। মাসের পর মাস বাড়ি ভাড়া বাকি রাখলে কে থাকতে দেবে? তার কোনও বাসাতে দুবার ঢোকার সুযোগ হয়নি।

রান্নাঘরের বদলে শেষ বিকেলে মালতীকাকির শোয়ার ঘরে গিয়ে বসলাম। 'আধঘণ্টার মধ্যে আসছি' বলে সাতদিন আগে তারাপ্রসাদের উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা শোনাচ্ছিল মালতীকাকি। তারাপ্রসাদ আগেও নাকি এরকম করেছে। মানিকতলা বাজারে পেঁয়াজ কিনতে বেরিয়ে কাঠমাণ্ডু চলে গেছে। ফিরেছে দশদিন বাদে। মাঝখানে কাঠমাণ্ডু থেকে কলকাতার পরিচিত কোনও বাড়িতে টেলিফোন করে খবরটা মালতীকাকিকে দিতে বলেছে।

কয়েক সেকেন্ড থেমে মালতীকাকি বলেছিল, ইদানিং ভবঘুরেপনা কমে গিয়েছিল। বাড়িতে না জানিয়ে কোথাও কোথাও রাতে থাকত না। শরীরও ভাল যাচ্ছিল না। মানুষটাকে নিয়ে বড় চিন্তায় আছি।

পঁচিশ বছর আগে, জলে ধোয়া পানপাতার মত মালতীকাকির যে মুখ দেখে মুগ্ধ হতাম, সঙ্গ পেতে পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করতাম, তার বয়স এখন ষাট। মুখের হাসি, দু' চোখের স্নিগ্ধতা সময় শুষে নিয়েছে, তবু চোখ বুজে পঁচিশ বছর আগের মালতীকাকিকে দেখতে পেয়েছিলাম। তারাপ্রসাদ যতটা হুল্লোড়বাজ ছিল, ঠিক ততটা শান্ত ছিল মালতীকাকি। কথা বলত কম, উপভোগ করত বেশি। রেশমের মত লম্বা, ঘন চকচকে কালো চুল ছিল মাথায়। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করত সিঁদুর। নরম হাসি ঠোঁটে লেগে থাকত। সে হাসি সময় চুরি করে নিয়েছে। ফাঁকা বাড়িতে মালতীকাকির দু'চোখে জল টলটল করছিল। আমি না দেখার ভান করেছিলাম।

চন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্যে দয়াময়ীর বাক্যালাপ বন্ধ থাকার পর্বে তারাপ্রসাদের বড়মেয়ে চম্পার বিয়ে, বলা যায় দয়াময়ী একা দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছিল। ছেলে পছন্দ করা থেকে বিয়ের বাজার, মালতীকাকিকে নিয়ে দয়াময়ী করেছিল। ছোট মেয়ে লিলির বিয়ে দিয়েছিল তারাপ্রসাদ। চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার দু মাস পরে লিলির বিয়েতে দয়াময়ী যেতে পারেনি। কালাশৌচের এক বছর শেষ না হলে কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়া নিষেধ! কালা, ধলা কোনও অশৌচ না মানলেও লিলির বিয়েতে আমি যেতে পারিনি। অফিসের কাজে চেন্নাই গিয়েছিলাম। দয়াময়ীর মুখে শুনেছি, উনিশ বছরের মেয়ের পাশে একচল্লিশ বছরের রুগ্ন বরকে দেখে মালতীকাকির মুখের হাসি সেই যে মিলিয়ে গেল, আর ফেরেনি। কলেজে পড়া শেষ না করে দু বোনের বিয়ের আগে তারাতলার একটা কারখানায় অপু চাকরিতে ঢুকেছিল। তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করে আলাদা সংসার পাতল। আমি শুনেছিলাম, মেয়েকে বিয়ে করার শর্তে অপুর চাকরি

করে দিয়েছিল তার শ্বশুর। সে চাকরি এখন নেই। কারখানা বন্ধ। দু ছেলেমেয়ের বাবা হয়ে গেছে অপু। টাকার দরকার পড়লে মা-বাবার কাছে আসে। মৌলালির মোড়ে তিন মাস আগে আমার সঙ্গে তারাপ্রসাদের শেষ দেখা হয়। প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি। তারাপ্রসাদ চিনেছিল আমাকে। আমার সামনে এসে অসহায়ের মত হাত পেতে বলেছিল, দশটা টাকা দিতে পার।

আমি দিয়েছিলাম। টাকা নিয়ে হনহন করে ক্রিক রো-র দিকে চলে গিয়েছিল তারাপ্রদাস।

তারাপ্রসাদ নিখোঁজ হওয়ার খবর দয়াময়ীর মুখে শুনে তিন মাস আগের ঘটনাটা বলতে গিয়েও চুপ করে থেকেছিলাম। দয়াময়ী বলেছিল, দিন পনের আগে আমার কাছ থেকে তারাঠাকুরপো একশো টাকা নিয়ে গেছে। সংসার চালাতে না পারলে কী করবে? মালতীকে অবশ্য কথাটা বলিনি। সে-ও কম কষ্টে নেই। কী করে সংসার চালাচ্ছে জানি না।

কলকাতার জনসমুদ্রে কোথায় তারাপ্রসাদ রয়েছে, জানি না। তাকে খুঁজতে গিয়ে আমিই হয়ত নিখোঁজ হয়ে যাব। মালতীকাকিকে সে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার কিশোর বয়সের ওপর আলো ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মালতীকাকি। মালতীকাকিকে ভরসা দিতে বললাম, দু-তিনদিনের মধ্যে খুঁজে আনব।

মালতীকাকির মুখে একচিলতে হাসি ফুটল। মোমের আলোর মত হাসিটা আমি চিনতে পারলাম। পরের দিন দুপুরে দয়াময়ীর কাছে আবার গিয়েছিলাম। মালতীকাকির সঙ্গে দেখা করেছি, বলেছিলাম। তারাপ্রসাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে, সে বিবরণ শোনানোর চেয়ে দয়াময়ীকে আরও জরুরী কিছু কথা আমার বলার ছিল। সাত বছর আগের এক রাতের ঘটনা তাকে জানিয়ে আমি নিজের পাপস্খালন করতে চাইছিলাম, তার চেয়ে বেশি করে চেয়েছিলাম, চন্দ্রনাথ সেনকে নির্দোষ-প্রমাণ করতে। তাকে নিয়ে দয়াময়ীর মনে জমে থাকা সন্দেহ কাটাতে চেয়েছিলাম। দয়াময়ী যে ঘটনাকে গুরুতর অপরাধ ভেবেছিল, তার দায় চন্দ্রনাথের ঘাড়ে আমি চাপাতে চাইনি। দয়াময়ীকে বলতে চাইছিলাম, তার দেখায় ভুল ছিল। তার দেখার ভুল ছিল। অন্ধকারে তার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল। অপরাধ যদি কিছু ঘটে থাকে, আমি করেছিলাম। সেই রাতে প্রমীলা এসেছিল আমার ঘরে। আমি না ডাকতেই এসেছিল। প্রথম রাতে সে জেনে গিয়েছিল, আমার ডাকটা এক রাতের জন্যে নয়। আমার ঘর খালি থাকলে যে কোনও রাতে সে আসতে পারে। খেলাটা সে বুঝে গিয়েছিল চন্দ্রনাথের ঘরে যাওয়ার সাহস তার ছিল না। চন্দ্রনাথের ঘরের চৌকাঠ সেই রাতে সে মাড়ায়নি। ভুল দেখেছিল দয়াময়ী।

মৃত্যুর আগে চন্দ্রনাথ ঘটনাটা আমাকে ভুলে যেতে বললেও আমি ভুলতে পারিনি। ভোলা সম্ভব নয়। প্রয়াত চন্দ্রনাথকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে সব ঘটনা আমাকে মনে রাখতে হবে, বলতে হবে দয়াময়ীকে। না বলা পর্যন্ত আমার রেহাই নেই। পিতৃপক্ষে গঙ্গার ঘাটে তর্পণ দেখতে এসে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে আবহমান কালের পাপপুণ্যের সঙ্গে আমি জড়িয়ে গেলাম।

তেরো

গঙ্গার ঘাটে তর্পণকারীদের থেকে দূরে কংক্রিটের ছাতার তলায় তুমুল বৃষ্টির মধ্যে বসে আমি মহাভাসানের ছোঁয়া পাচ্ছিলাম। চন্দ্রনাথ দয়াময়ীর সঙ্গে আমার যে সব প্রিয়জন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, ধোঁয়ার মত জলকণা দিয়ে আঁকা তাদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। মুখের ভিড়ে তারাপ্রসাদও রয়েছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে তারাপ্রসাদ হাসল। বলল, ভাল থেক।

বাতাসে তার গলার স্বর মিশে যেতে মুখগুলো ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল।

মালতীকাকিকে দেওয়া কথা রেখেছিলাম। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এনে দিয়েছিলাম তারাপ্রসাদের খোঁজ। কাজটা সহজ ছিল না। তবু যে করতে পেরেছিলাম, সে আমার সৌভাগ্য, মা-বাবার আশীর্বাদ। তারাপ্রসাদের আর্থিক দুর্দশা থেকে জানতাম কলকাতার বাইরে যাওয়ার সঙ্গতি তার নেই। কলকাতাতেই সে আছে। কলকাতার বদলে, শহরের কাছাকাছি কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে তারাপ্রসাদ সাতদিন থাকলে সে খবর মালতীকাকি পেয়ে যেত। মালতীকাকির আগে জানত দয়াময়ী। চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে আত্মীয়স্বজন আগের চেয়ে বেশি করে দয়াময়ীর খোঁজ নিত। টেলিফোন করত। তাদের কারও বাড়িতে তারাপ্রসাদ গেলে সে খবর দয়াময়ীর কাছে সেদিনই পৌঁছে যেত। কিছু অনুমান করে লালবাজারে পুলিসের সদর দপ্তরে স্কুলের সহপাঠী এক পুলিস অফিসার, শশাঙ্ক ঘোষের কাছে গিয়েছিলাম। তারাপ্রসাদের নিখোঁজ হওয়ার বিবরণ আমার মুখে শুনে, আগের সাতদিনে দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতকুলশীল মৃতের এক তালিকা ভেতরের কোনও দপ্তর থেকে শশাঙ্ক জোগাড় করে এনেছিল। তালিকা দেখে মৃত দু'জনের সঙ্গে তারাপ্রসাদের মিল পেয়েছিলাম। ছবিহীন মৃতের তালিকায় শুধু বয়স আর শরীরের বিবরণ ছিল। শশাঙ্ক চাইতে তারাপ্রসাদের একটা পুরনো ছবি, তাকে দিয়েছিলাম। মালতীকাকির সঙ্গে দেখা করে, ফেরার আগে ছবিটা চেয়ে নিয়েছিলাম। ছবি নেওয়ার চিন্তাটা হঠাৎ কেন আমার মাথায় এসেছিল জানি না। পুরনো অ্যালবাম থেকে তারাপ্রসাদের পড়ন্ত যৌবনের ছবিতে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আমার চোখ আটকে গিয়েছিল। বালক বয়সে দেখা ছবির তারাপ্রসাদকে স্পষ্ট মনে করতে পারছিলাম। তারাপ্রসাদের ছবিটা খুলে মালতীকাকি দিয়েছিল আমাকে। সুপুরুষ তারাপ্রসাদের ছবি নিয়ে পরের দিন নীলরতন সরকার হাসপাতালের লাশকাটা ঘরে শশাঙ্ক চলে গিয়েছিল। সেই সন্ধেতে শশাঙ্ক ফোন করে জানিয়েছিল, পচে বেঢপ হয়ে যাওয়া একটা লাশ দেখে তার মনে হয়েছে, সেটাই তারাপ্রসাদের। খবরটা দিয়ে শশাঙ্ক বলেছিল, কাল তুই যা। পারলে মণীশকে সঙ্গে নিস। মর্গে ঢুকতে সুবিধে হবে।

মনীশ সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার। সুখলাল কারনানি হাসপাতালে শিশু চিকিৎসা বিভাগে ছিল। সেও আমাদের স্কুলের বন্ধু। মনীশের সঙ্গে যোগাযোগ করে, পরের দিন তাকে নিয়ে নীলরতন সরকার হাসপাতালের একটা লালবাড়ির একতলার অন্ধকার ঘরে মেঝেতে পড়ে থাকা সাত-আটটা পচা, গলা মৃতদেহের ভেতর থেকে তারাপ্রসাদকে চিনে নিতে আমার অসুবিধে হয়নি। বিষগন্ধে আমার দম আটকে আসছিল। মায়া-

মমতা মাখা নরদেহ থেকে এত দুর্গন্ধ বেরোয় আমার জানা ছিল না। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। সাতদিন ধরে নিখোঁজ মানুষটার হদিস পেয়েও আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মানুষটাকে এভাবে আমি দেখতে চাইনি। তারাপ্রসাদের খোঁজ না পেলেই যেন ভাল হত। মালতীকাকির দুর্দিনে তার পাশে থাকব বলে দয়াময়ীকে কথা দিয়েছিলাম। দু'দিন আগে গিয়েছিলাম মালতীকাকির কাছে। আমায় দেখে কাকি কেঁদে ফেলেছিল। কাকির চোখের জল দেখে, তার সামনে বসে ঘরের আবহাওয়া হালকা করতে বলেছিলাম, আত্মীয়দের কারও বাড়িতে গিয়ে কাকা জমে গেছে। দু-তিনদিনের মধ্যে কাকাকে ধরে তোমার কাছে হাজির করে দেব।

বড় মুখ করে মালতীকাকিকে কথাটা বলে বিপাকে পড়ে গিয়েছিলাম। মনে প্রশ্ন জেগেছিল, পারব কি? পেরেছিলাম। তারাপ্রসাদকে খুঁজে বার করে প্রথম যে চিন্তা আমাব মাথায় এসেছিল, তা হল, ত্রিশ বছর ধরে যে মানুষটা অন্যের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে দিয়েছে, তার মৃত্যুর খবর কীভাবে মালতীকাকিকে জানাব? শুধু জানালে হবেনা। তারাপ্রসাদের ছেলে অপুকে তার বেহালার বাসা থেকে ধরে এনে তাকে দিয়ে বাবার শেষকৃত্য করাতে হবে। মাত্র এক বছর আগে চন্দ্রনাথের মৃত্যুর রাতে, তারাপ্রসাদের মুখ থেকে আচমকা বেরনো কথাটা আমি ভুলিনি। আমাদের লেবুতলার বাড়ির দোতলার ঘরে দাঁড়িয়ে কাউকে লক্ষ করে না বললেও তার কথাটা 'দেখিস বাবা মরার পরে যেন একটু আগুন পাই' আমি শুনেছিলাম। অন্ধকার লাশকাটা ঘরে তারাপ্রসাদের লাশটা দেখে, সেই কথাটাই প্রথমে মনে পড়েছিল। তারাপ্রসাদের সৎকারের আয়োজন না করে আমার উপায় ছিলনা।

তারাপ্রসাদের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে দয়াময়ী শোকাতুর হয়েছিল। সৎকারের পরের দিন দুপুরে রিকশায় চেপে মালতীকাকির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সন্ধে পর্যন্ত তারাপ্রসাদের বলদেওপাড়ার বাড়িতে ছিল। ছোট বোনের মত জা-কে সান্ত্বনা দেওয়ার সঙ্গে তারাপ্রসাদের শ্রাদ্ধের টাকাও দিয়েছিল। বলদেওপাড়া থেকে লেবুতলার বাড়িতে ফিরে পরের দিন সকালে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে বিরানব্বই বছরের বিধবা মা অঘোরবালার কাছে চলে গিয়েছিল। শোকতাপের দিনগুলোতে সাতষট্টি বছরের মেয়েকে আগলে রেখেছিল তার বিরানব্বই বছরের মা। মালতীকাকির কাছ থেকে তারাপ্রসাদকে খুঁজে বার করার বিবরণ কয়েকদিন আগে দয়াময়ী শুনলেও আমার মুখ থেকে আবার শোনার জন্যে আমার সামনে মা মেয়ে গ্যাঁট হয়ে বসেছিল। লালবাজারের পুলিস দপ্তরে শশাঙ্ক ঘোষের সঙ্গে দেখা করা থেকে গঙ্গায় তারাপ্রসাদের অস্থি ভাসানো পর্যন্ত পুরো বৃত্তান্ত আমি শুনিয়েছিলাম। তারাপ্রসাদের সাতদিনের বাসি দেহ নিয়ে দয়াময়ী একটা প্রশ্ন করেনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, বাড়িতে তারাঠাকুরপোর দেহ না এনে ভাল করেছিস। মালতী দেখলে কষ্ট পেত।

দয়াময়ীর কথা শুনে অঘোরবালা মোটা গলায় কেঁদে উঠতে তার পিঠে হাত রেখে দয়াময়ী শান্ত করেছিল। আমাকে বলেছিল, তারাঠাকুরপোর কাছে আমাদের অনেক ঋণের একটা তুই শোধ করলি। তোর ভাল হবে।

আমার মাথায় মা হাত রাখতে আমি সামান্য লজ্জা পেলেও মায়ের গা ঘেঁষে

বসলাম। হাতের কর গুণে দয়াময়ী ইষ্টমন্ত্র জপ করতে আমি মনে মনে বলেছিলাম, মা তোমার কাছে আমার বিরাট ঋণ রয়ে গেছে। তোমার সংসারে আমি বড়রকম ক্ষতি করে দিয়েছিলাম, তুমি জান না। জানত, চন্দ্রনাথ সেন। ছেলের ওপর অন্ধ স্নেহে সে বলেনি তোমাকে। কোনওদিন সে আর বলবে না। আমি বলব। আমি অপরাধ স্বীকার করতে চাই। তুমি সাহস দাও।

জিভের ডগায় কথাগুলো নিয়ে আমি চুপ করে বসেছিলাম। আমার মাথা থেকে দয়াময়ী হাত সরাতে আমাকে অঘোরবালা জিজ্ঞেস করল, তোকে চারটে নুচি ভেজে দিই?

আমি কিছু বলার আগে বিছানা থেকে উঠে অঘোরবালা গটগট করে রান্নাঘরের দিতে হাঁটতে শুরু করল। মাকে দয়াময়ী বলল, তুমি বস। চন্দনের জন্যে লুচি, আলুভাজা আমি করে দিচ্ছি।

মেয়ের কথা কানে গেলেও অঘোরবালা দাঁড়ালনা। বলল, বসার সময় কি আমার আছে? সন্ধে দিতে হবে আমাকে। আরও অনেক কাজ রয়েছে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে দয়াময়ী বলেছিল, বুড়ি পারে বটে!

অঘোরবালার সঙ্গে রান্নায় হাত লাগাতে বিছানা থেকে নেমে দয়াময়ীও রান্নাঘরের দিকে এগোল। ডেকে নিল আমাকে। অঘোরবালাকে এখন একা হেঁশেল ঠেলতে দয়াময়ী দেবে না। মায়ের সঙ্গে নিজে হাত লাগাবে। দয়াময়ীর পাশাপাশি আমি হাঁটছিলাম। বিশাল বাড়িটার স্তরে স্তরে জমে আছে নানারকম গন্ধ আর সময়। নাকের ঠিক ওপরের স্তরে দুশো বছরের হিং-এর গন্ধ স্থির হয়ে আছে। রান্নাঘরে ঢোকার আগে সেফটিপিনের ডগা গিয়ে খাওয়ার ঘরের বাঁদিকের দেওয়াল, কুরে কুরে অনেকদিন আগে মামা-মাসিদের কারও লেখা ছড়াটা পড়লাম।

খাবো খাবো করছে আমার পাগলা মন
জল ছিটিয়ে
হাত বুলিয়ে
পেতে দে রে কুশাসন।

লেখাটার ওপর ধুলো তেল-কালি জমলেও পড়তে অসুবিধে হয় না। গোটা গোটা হরফে ছড়াটা কে লিখেছিল অনেক খোঁজ করেও আমি জানতে পারিনি। ছড়া লেখার মত ছেলেমেয়ে এ বাড়িতে কম ছিল না। ছেলেমেয়ে নিয়ে বিস্তর আত্মীয়পরিজন আসত। তাদের অনেকে কয়েকদিন থেকে যেত। ছেলেবেলায় লেবুতলার বাড়ির চেয়ে আমার কাছে এ বাড়ির টান ছিল বেশি। ছেলেমেয়েদের নিয়ে পুজোর দিনগুলোতে দয়াময়ী এখানে চলে আসত। আমরা সব ক'জন ভাইবোন, মামার বাড়িতে যাওয়ার দিনটার জন্যে অপেক্ষা করতাম। লেবুতলা থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে যাওয়ার আকর্ষণ, কাশ্মীর কন্যাকুমারিকা ভ্রমণের চেয় কম ছিল না। লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত মামার বাড়িতে থাকতাম। ছড়াটা আমার ভাইবোনদের কেউ লেখেনি। তাদের হাতের লেখা আমি চিনি। আর কেউ লিখেছে। মামা-মাসিদের জিজ্ঞেস করলে তারা ঠোঁট টিপে হাসত। আমার যতদূর মনে পড়ে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেওয়ালে

লেখাটা দেখেছি। পড়তে শেখার পরে পড়েছি এবং আরও পরে ছড়ার ভেতরের মজাটা উপভোগ করেছি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এই বাড়ি তখন মানুষে ভরে থাকত। দুটো সংসার ছিল। একটার কর্ত্রী ছিল বিধবা অঘোরবালা অন্য সংসারের কর্ত্রী অঘোরবালার ননদ চারুবালা। চারুবালা ছিল আমার মায়ের পিসি। বিয়ের পর থেকে স্বামী উপেন ভঞ্জকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চারুবালা থেকে গিয়েছিল। চারুবালার স্বামী উপেন ভঞ্জ ছিল ঘরজামাই। মায়ের সেজোপিসি চারুবালার স্বামীকে আমরা সেজদাদু বলতাম। তাদের সাত ছেলেমেয়ে ছিল আমাদের মামা-মাসি। অঘোরবালার কাছে থাকত তার ভাগ্নে দেবু বোস। ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে মাসি, অঘোরবালার কাছে দেবুমামা মানুষ হয়। আমি স্কুলে পড়ার সময় পর্যন্ত জানতাম অঘোরবালার একছেলে দেবুমামা, দুই মেয়ে দয়াময়ী, সৌদামিনী। তিনজন একই মায়ের ছেলেমেয়ে, সহোদর ভাইবোন। বলাতে ভুল হল। দয়াময়ীর খুড়তুতো দুই বোনকেও আমি আপন মাসি হিসেবে অনেকদিন জানতাম। ছেলেবেলায় তাদের শ্বশুরবাড়িতে এক-দু দিন থেকে এসেছি। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি, তখনই জেনেছিলাম। আক্ষরিক অর্থে বেশি। শ্লেষ দিয়ে তা খাটো করা যায় না।

মামার বাড়ির ঠিকানা শ্রীগোপাল মল্লিক লেন হলেও বাড়িটা মূল রাস্তার ওপর ছিল না। পিচ বাঁধানো রাস্তার বাঁদিকে সরু, অনতিদীর্ঘ একটা গলিতে পাশাপাশি তিনটে বাড়ির শেষ বাড়িটা ছিল দয়াময়ীর পিত্রালয়। গলির প্রথম দুটো বাড়িতেও দয়াময়ীর কাকা-জ্যাঠারা থাকত। তাদের বাড়িতেও ডজনখানেক ছেলেমেয়ে ছিল। দয়াময়ীর নিজের কোনও ভাই না থাকলেও আমার মামা-মাসির অভাব ঘটেনি। পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দয়াময়ী ছিল সকলের বড়, ভাইবোনরা দিদিমণি বলত তাকে। দিদিমণিকে তারা নিজের দাদা-দিদির চেয়ে বেশি ভালবাসত। ভালবাসার সঙ্গে ছিল দিদিমণি সম্পর্কে সম্ভ্রম, দিদিমণির ওপর আস্থা। দিদিমণি কোনও কাজ দিলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে করত। আমি এমনও দেখেছি, দয়াময়ীকে আড়ালে ডেকে দাদামশাই, দিদিমাদের কেউ নিজের ছেলে বা মেয়ের নামে নালিশ জানিয়ে শাসন করতে বলছে। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে দয়াময়ী গেলে, তাকে যেমন তারা ঘিরে থাকত, তেমনই দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে লেবুতলার বাড়িতে যেতেও তাদের ক্লান্তি ছিলনা। দিদিমণির ছেলেমেয়ে হিসেবে আমাদের ছিল পোয়াবারো। অঘোরবালার বাড়িতে গেলে শুধু সে বাড়ি নয়, পাশাপাশি তিনবাড়ির মাসি-মামাদের স্নেহে আমি ভেসে যেতাম। আমার বেশ মনে আছে, এক কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে, মামারবাড়ির ছাতে মহিলামহলের আড্ডাতে আমি কোনওভাবে ঢুকে পড়েছিলাম। তরুণী, যুবতী, বিবাহিতা, অবিবাহিতা মাসি, মামিদের ঝাঁকে আমার মত পাঁচ-ছ'বছরের এক বালককে চোখে পড়লেও কেউ পাত্তা দেয়নি। কখনও খোলা গলায় কখনও চাপা স্বরে তারা কথা বলছিল। কথা মানে গল্প। গল্পের শেষ নেই। মাঝে মাঝে দমকা হাসিতে আসর ফেটে পড়ছিল। পূর্ণিমার মস্ত চাঁদ উঠেছিল আকাশে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছিল। রাস্তা থেকে ভেসে আসছিল ঘুগনিওয়ালার হাঁক, 'চাই বেল ফুল' আওয়াজ। বিবিমাসি হঠাৎ শুরু করেছিল 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গান। গানের সুরে সুরভিত হচ্ছিল বাতাস।

বিবিমাসি থামতে তখনকার জনপ্রিয় সিনেমার গান 'পৃথিবী আমারে চায়' ধরেছিল নিভামাসি। গানটা আগেও শুনেছি। রেডিওতে, পুজোমণ্ডপের মাইকে বারবার শুনে গানের কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মানে না বুঝলেও শিশু বয়সে সব গানের কিছু লাইন মাথায় গেঁথে যায়। গানের একটা লাইন 'খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর' আমার মনের গভীরে ঢুকে গিয়েছিল। নিভামাসি থামতে সকলে হাততালি দিয়ে তাকে আরও একটা গান শোনানোর জন্য যখন চেপে ধরেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'খুলে দাও প্রিয়া খুলে দাও বাহুডোর' মানে কিগো?

ছ'বছরের ছেলে হলেও আমার উচ্চারণ অস্পষ্ট ছিল না। আমার প্রশ্নে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে চুপ হয়ে গেল আসর। তারপর বসন্তের ঝড় বয়ে গেল ছাতে। কোজাগরী জ্যোৎস্নার স্রোতে নানা গলার হাসি ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়তে থাকল। নিভামাসি দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমার গালে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে, তারপর হাতের বাঁধন খুলে নিয়ে বলল, এই হল বাহুডোর খুলে নেওয়া। দু'হাতে তোকে যে বুকে টেনে নিলাম, টেনে নেওয়া হল বাহুডোরে, এখন হাত দুটো সরিয়ে নিতে বাহুডোর খুলে গেল।

নিভা মাসির ব্যাখ্যা কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে কেন যেন লজ্জা পেয়ে ছাতের পশ্চিম দিকে লম্বা বাঁশের মাথায় লাগানো আকাশপ্রদীপের দিকে তাকালাম। পুরো কার্তিক মাস ধরে লাল আলোটা সারারাত জ্বলবে। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া পূর্বপুরুষদের পথ দেখাবে। জানাবে, 'তোমাদের ছেলেমেয়েরা উর্ধ্বতন পুরুষকে ভোলেনি।' আকাশপ্রদীপের তাৎপর্য তখন জানতাম না। আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা লাল আলোর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম নিজেকে। নিভামাসি নতুন গান 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' শুরু করতে আকাশপ্রদীপ থেকে চোখ সরিয়ে চেনা মানুষগুলোর দিকে আবার তাকিয়েছিলাম। দিদিমণির ছেলে হিসেবে মামা-মাসিদের বাড়তি আদর পাচ্ছি, বুঝতে অসুবিধে হত না।

গোল চাকার মত করে আলু কুটে, ধুয়ে, অঘোরবালা কড়াতে তেল ঢালার আগে বাইরের উঠোন থেকে জ্বলন্ত তোলা উনুনের দুটো কানা ধরে মনুর মা রান্নাঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল। অঘোরবালার সংসারে কঠিন কাজগুলো দু'বেলা মনুর মা করে দিয়ে যায়। কুড়ি বছর হয়ে গেল সে কাজ করছে। তার বয়সও ষাটের কম নয়। উনুন ধরানো ঘর মোছা, বাসন মাজা, কাচাকুচি, খুচরো কেনাকাটা মনুর মা করে দেয়। মাসকাবারি বাজার করে দেয় দয়াময়ী। পাঁচ ছ'বছর এই ব্যবস্থা চলছে। তার আগে অঘোরবালা নিজে দোকানবাজার করত। ষাঁড়ের গুঁতোয় মির্জাপুর স্ট্রিটের ফুটপাতে পড়ে হাত ভাঙার পরে দয়াময়ীর কাছে একটানা ছ'মাস থাকতে হয়েছিল অঘোরবালাকে। প্লাস্টার করার আগে থেকে প্লাস্টার কেটে ভাঙা হাত কর্মক্ষম হওয়া পর্যন্ত মায়ের দেখাশোনা করেছিল দয়াময়ী। মায়ের সেবা করেছিল। গর্ভধারিণী মায়ের কীভাবে সেবা করতে হয়, আমি দেখেছি। শুধুই দেখেছি। শেখা হয়নি কিছু। মায়ের জন্যে আমি নিজে কিছু করতে পারিনি। মাঝরাতে টেলিফোনে দয়াময়ীর মৃত্যুর খবর পেয়ে জরদ্গবের মত বিছানায় বসেছিলাম। সে আরও কয়েক বছর পরের ঘটনা।

তোলা উনুনের গনগনে আঁচে কড়া বসিয়ে অঘোরবালা যখন আলুভাজার তোড়জোড় করছে, লুচির জন্যে মাখা ময়দার তালে দু-তিনটে আলতো চাপড় দিয়ে দয়াময়ী আমাকে জিজ্ঞেস করল, মেজদিদিকে তোর মনে আছে?

খু-উব।

মেজদিদির আনা লড়াই-এর চপ কখনও খেয়েছিস?

খেয়াল নেই।

বাগবাজার থেকে নিয়ে আসত।

দয়াময়ী মনে করাতে চাইল লড়াই-এর চপের স্মৃতি। আমার জন্মের আগে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনও এক সময়ে উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে এই চপের জন্ম হয়েছিল। ময়দানের কেল্লা থেকে লালমুখো গোরা সৈন্যরাও নাকি সেই কিনতে বাগবাজারে আসত। লড়াই-এর চপ নামের উৎপত্তিও সম্ভবত সেই থেকে। রসগোল্লার আবিষ্কারক কে সি দাশকে বাঙালি মনে রাখলেও লড়াই-এর চপের স্রষ্টার নাম কেউ জানে কিনা, আমার সন্দেহ আছে। কলকাতার কোনও তেলেভাজার দোকানে হয়ত এই সুখাদ্য এখন তৈরি হয় না। না হোক, ক্ষতি নেই। লড়াই-এর চপ খাওয়ার বয়স আমি পেরিয়ে এসেছি। তবু সেই বিকেলে দয়াময়ীর মুখে লড়াই-এর চপ নামটা শুনে ডালপালা, পাতা, ফুল, গুঁড়ি শেকড়সমেত একটা বিশাল গাছকে আমি মনে করতে চাইলাম। সেই গাছে অনেক পাখি, নানা কলকাকলি, ঋতুর খেলা। গাছটাকে ঘিরে আছে মহাশ্মশানের আবহ। গাছ মানে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এই বাড়ি, ইট, সিমেন্ট, লোহার অণু-পরমাণুতে মিশে থাকা অনেক মানুষের রাগ, অনুরাগ, শোক, সুখ আর সময়। মেজদিদি মানে সাদা থান জড়ানো যে বৃদ্ধাটি দয়াময়ীর কাকিমা, আমার দুই মাসি, বিভা আর আভার মা, অঘোরবালার মেজ জা, তাকে ভোলার কারণ নেই। সব নাতিপুতির মত আমিও মেজদিদি বলতাম তাকে। মেজদিদি স্বাভাবিক মানুষ ছিল না। বলা ভাল, বাউল ছিল। ক্ষ্যাপা কিন্তু নিরীহ, ভালমানুষ। মাথায় কদমছাঁট সাদা চুল, গলায় তুলসীর মালা, দু'চোখে শিশুর দৃষ্টি, বরানগরের কাছে এক আশ্রমে থাকত। অল্প বয়সে দুই মেয়ে নিয়ে বিধবা হওয়ার ঠিক কতদিন পরে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আশ্রমে গিয়ে উঠেছিল, জানি না। সম্ভবত আমার জন্মের আগে সেটা ঘটেছিল। আমার জ্ঞান হওয়ার পরে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে গিয়ে কোনও বিকেলে মেজদিদিকে সেখানে দেখেছি। বেশ কয়েকবার দেখেছি তাকে। অঘোরবালার সঙ্গে এক-দু'ঘণ্টা গল্প করে মেজদিদি আশ্রমে ফিরে যেত। মামাবাড়িতে তাকে কখনও রাত কাটাতে দেখিনি। দুই মেয়ে বিভা, আভার শ্বশুরবাড়িতে সে যেত কিনা, জানার চেষ্টা কখনও করিনি। বিভামাসি আভামাসি নিয়ম করে অঘোরবালার সঙ্গে দেখা করতে এলেও মায়ের সঙ্গে তারা কতটা যোগাযোগ রাখত, জানতাম না। অঘোরবালাকে তারা মায়ের চেয়ে যে বেশি শ্রদ্ধা করে বুঝতে পারতাম। মাকে নিয়ে তাদের কখনও কথা বলতে শুনিনি।

কড়া থেকে হালকা বাদামি রঙের আলুভাজা থালায় নামিয়ে রেখে, কড়ার বাড়তি তেল বাটিতে ঢালল অঘোরলবালা। লুচি ভাজার জন্যে কড়ায় ঘি নিল। কড়া চাপাল উনুনে। পটলের চেয়ে সামান্য বড়, ওইরকম লম্বাটে লুচি একটার পর একটা সাদা

পাথরের গোল চাকিতে বেলে তেল মাখানো উল্টো থালায় দয়াময়ী রাখছে। সব লুচির সমান সাইজ। গরম ঘিয়ে অঘোরবালা লুচি ছাড়তে টোপরের মত সেটা ফুলে উঠছে। সব লুচি সমান ফুলছে। কোথাও ঈষৎ টাল খাচ্ছে না। সত্যিকার ফুলকো লুচি। চেনাজানা কোনও বাড়িতে এরকম লম্বাটে লুচি দেখিনি। সব বাড়িতে গোল লুচি খেয়েছি। অঘোরবালার লুচির গড়ন আলাদা। লেবুতলার বাড়িতে দয়াময়ী কখনও এরকম লুচি করলেও বেশিরভাগ সময়ে গোল লুচি হত। লুচি বানাত রাঁধুনিঠাকুর। অঘোরবালার মত লুচিকে শিল্পকর্মে উন্নীত করার এলেম তারা পাবে কোথা থেকে? পটলের মত সেই লুচি দু'টুকরো করলে প্রতিটা টুকরোর মাপ দাঁড়াত দেড় ইঞ্চি। চাকার মত একই মাপের আলুভাজাকে আধখানা লুচিতে জড়িয়ে, অথবা আলুভাজাতে আধখানা লুচি মুড়ে সামান্য নুনের ছোঁয়া লাগিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া যেত।

লুচি বেলার পাশাপাশি ভাজার কাজটা অঘোরবালাকে সরিয়ে দয়াময়ী নিতে চাইলেও মেয়েকে মা পাত্তা দেয়নি। বলেছিল, তুই বরং ছেলেকে খেতে দে।

চারটে পটলের মত ধবধবে সাদা ফুলকো লুচি, আট-দশটা বাদামি আলুভাজা থালায় সাজিয়ে, কাঁসার গ্লাসে জল ভরে দয়াময়ী খেতে দিল আমাকে। কেটে রাখা লেচির পরিমাণ দেখে বুঝলাম, মা-মেয়েও আজ রাতে লুচি খাবে। চারের অনেকবেশি লুচি জুটবে আমার বরাতে। দয়াময়ী বলেছিল, লুচি ভাজত বটে আমার ঠাকুমা, সর্বমঙ্গলা। দুশো-আড়াইশো লুচি না করে উনুন থেকে খোলা নামাত না।

ঠাকুমা, সর্বমঙ্গলার প্রসঙ্গ ধরে পুরনো দিনে দয়াময়ী চলে যেত। চোখের সামনে ভেসে উঠত শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ির ছবি। বাড়িতে তখন মানুষ কম ছিল না। খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও ছিল এলাহি। সকাল-সন্ধে সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর টেনে ঠাকুমা রান্নাঘরে ঢুকত। সিঁথির চওড়া সিঁদুরের চেয়ে বড় ছিল ঠাকুমার মন। তাকে রান্নায় সাহায্য করত দুই বিধবা পুত্রবধূ, এক বিধবা মেয়ে। সিঁথিতে সিঁদুর দিলেও তিন বিধবার সঙ্গে সর্বমঙ্গলা দু'বেলা নিরামিষ খেত। হাঁটুর বয়সী তিন নিরামিষাহারীর পাশে বসে তার পক্ষে মাছ-মাংস খাওয়া সম্ভব ছিল না। পুরনো এক অভিশাপের কাহিনী তাকে তাড়া করে বেড়াত। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে সর্বমঙ্গলা বধূ হয়ে আসার আগে, তার দাদাশ্বশুর অর্থাৎ দয়াময়ীর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা, কুলদাকান্ত ঘোষচৌধুরিকে এক সন্ন্যাসী অভিশাপ দিয়েছিল, তার বংশ লোপ হবে। নির্বংশ হবে কুলদাকান্ত। সর্বমঙ্গলা এ কাহিনী শুনেছিল তার শাশুড়ির কাছে। কুলদাকান্তের ওপর সন্ন্যাসী কেন এই ব্রহ্মাস্ত্র দেগেছিল, সর্বমঙ্গলা জানলেও তাকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ আমার ছিল না। আমার জন্মের ত্রিশ বছর আগে সে মারা গিয়েছিল। দয়াময়ীকে জিজ্ঞেস করে আমি জানতে পারিনি। দয়াময়ী জেনেও আমাকে, না নিজে জানত না, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। দয়াময়ী যা বলেছিল, তা হল, ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীর পায়ে পড়ে তাকে কিঞ্চিৎ শান্ত করেছিল কুলদাকান্ত। তাকে নিজের চোখে নির্বংশ হতে দেখা থেকে রেহাই দিতে অভিশাপের ওজন কিছুটা হালকা করে দিয়ে সন্ন্যাসী বলেছিল, তার পরিবারে পঞ্চম পুরুষে কোনও পুত্রসন্তান থাকবে না। ছেলে জন্মালে সে অল্পায়ু হবে। সন্ন্যাসীর অভিশাপ শুধু নিজের বাড়ি নয়, পাশাপাশি তিন বাড়ি জুড়ে

ফেলবে, দয়াময়ী বিশ্বাস করত। তিন বাড়িতেই থাকত কুলদাকান্তর সন্তান-সন্ততিরা। অঘোরবালার প্রথম সন্তান, চার বছরের ছেলে, নীলকান্ত সতের দিনের জ্বরে, চোখের সামনে মরে যেতে, সর্বমঙ্গলা টের পেয়েছিল, বংশে বাতি দেওয়ার মত কেউ থাকবে না। নীলকান্ত মারা যাওয়ার পরের বছরে পাশের বাড়ির ঘোষচৌধুরী বংশের বারো বছরের যে ছেলেটা টাইফয়েডে তের দিন ভুগে মারা গেল, সর্বমঙ্গলার হিসেব অনুযায়ী সেও ছিল বংশের পঞ্চম পুরুষ। তিন বাড়ির সকলে একশো বছরের পুরনো অভিশাপের ঘটনা ভুলে গেলেও সর্বমঙ্গলা মনে রেখেছিল। কুলদাকান্তের পঞ্চম পুরুষ শুরু হয়ে গেছে, কাউকে বলেনি। অভিশাপের ইতিহাস আরও একজন মনে রেখেছিল, সে দেবুমামা। মাসির বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে বড় হওয়ার সময়ে এ কাহিনী সে শুনেছিল। নথিবদ্ধ করেছিল স্মৃতিতে। লোকমুখে শুনেছি, দেবুমামা একাধিকবার বলেছে, ঘোষচৌধুরি বংশ লোপাট হতে দেরি নেই। পরিবারের একটা শাখার সঙ্গে যে কোনও কারণে দেবুমামার শত্রুতা শুরু হয়। তাদের ডোবাতে আদাজল খেয়ে দেবুমামা ময়দানে নেমে পড়েছিল। সে আর এক বৃত্তান্ত।

দেবুমামা, ঘোষচৌধুরি বংশ, তাদের পরিবারের গাঁজাখুরি গল্প নিয়ে মাথা ঘামনোর সময় আমার ছিল না। স্কুল শেষ করে আমি তখন কলেজে পৌঁছে গেছি। ময়দানের সবুজ ঘাসে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর দু'হাত তুললে আকাশ ধরতে পারি। আমার দু'চোখে, পায়ের তলায়, সামনে, পেছনে, সীমাহীন বর্তমান, অর্থাৎ আধুনিকতা অথবা ইউরোপ-আমেরিকার গু ও বমি। লড়াই-এর চপের ঢাকা খুলে মহাসময় দেখার বয়স তখনও হয়নি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের তিনটে বাড়ি যে ক্রমশ খালি হয়ে যাচ্ছে, তা-ও খেয়াল করিনি। লেবুতলায় চন্দ্রনাথ সেনের বাড়িতে তখন থৈ-থৈ করছে মানুষ। রোজ ঘটছে নতুন নতুন ঘটনা। সেই বাড়ির ছেলের মনে ঘোষচৌধুরি পরিবারের ঘটনা কতটা দাগ কাটতে পারে?

মেয়েকে অঘোরবালা বলল, ও দয়া, নাতিকে আর দুটো নুচি দে।

লুচি পড়ার সময় পাচ্ছিল না খালি থালাতে। চোখের নিমেষে আমার জঠরে অদৃশ্য হচ্ছিল। আমার খাওয়া দেখে স্নেহে বিগলিত হচ্ছিল দুই রমণীর দৃষ্টি। গরম লুচির গন্ধে ম-ম করছে ঘরের বাতাস। বাতাসের স্তরে স্তরে স্থির হয়ে থাকা আরও নানা গন্ধ জেগে উঠেছে। দয়াময়ী বলল, কত মানুষ ছিল একদিন এ বাড়িতে! পুজোর সময়, পয়লা বৈশাখে, একতলা, দোতলা মিলিয়ে সাতটা শোবার ঘরে জায়গা থাকত না।

লম্বা একটা শ্বাস ফেলে দয়াময়ী বলল, সময়মত দেবুদা যদি বিয়ে করত, কথা শেষ না করে দয়াময়ী অদৃশ্য কিছু গিলে নিল।

আত্মীয়কুটুমে ভরপুর এই বাড়ি আমিও দেখেছি। ত্রিশ বছর আগে সংসারে কয়েকজন পুরুষ থাকলেও বেশিরভাগ ছিল মেয়ে। পাশাপাশি তিন বাড়িতে এক জিনিস ঘটছিল। সব সংসারে পুরুষ সদস্য কমে আসছিল। ত্রিশ বছর আগে আমি যা দেখেছি, তা শুরু হয়েছিল আরও ত্রিশ বছর আগে। দয়াময়ী, সৌদামিনী ছাড়া বাড়িতে ছিল তাদের দুই খুড়তুতো পাঁচ পিসতুতো বোন, অবিবাহিত মেয়ের সংখ্যা

ছিল আট। শাশুড়ি, জা, ননদ নিয়ে অঘোরবালা সমেত চারজন। কুলদাকান্তর নাতি, সর্বমঙ্গলার স্বামী, বিরজাকান্ত বেঁচেছিল অনেকদিন। তার জীবনের বড় অংশটা নাতনিদের বিয়ে দিয়ে কেটেছিল। পিতৃহীন নাতনি, ঘরজামাই-এর মেয়ে, আশ্রিত যত অরক্ষণীয়াদের পাত্রস্থ করতে সারা বছর তাকে ব্যস্ত থাকতে হত। দুই বিধবা পুত্রবধূর ভবিষ্যৎও ভাবতে হয়েছিল তাকে। বিরজাকান্তকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার বড়দা, অরিন্দমের দু'বছর বয়সে, বিরজাকান্ত মারা যায়। দয়াময়ীর ঠাকুমা, সর্বমঙ্গলা আশি-একাশি বছর বেঁচেছিল। মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত সংসারের কর্ত্রী ছিল সর্বমঙ্গলা। বিধবা দুই পুত্রবধূ, বিধবা মেয়ে, নাতি-নাতনিদের বুঝতে দেয়নি, তারা অসহায়। ধীরে ধীরে বাড়ি খালি হতে থাকল। দয়াময়ী, সৌদামিনী, তাদের দুই খুড়তুতো, তিন পিসতুতো বোনের বিয়ে হয়ে যেতে বাড়িতে মেয়েদের মধ্যে থাকল তিন বিধবা, দুই কচি বয়সের পিসতুতো বোন, আর মাসতুতো, পিসতুতো তিন ভাই। অঘোরবালা সংসারের কর্ত্রী হল। সর্বমঙ্গলা মারা যাওয়ার কিছুকাল পরে মেজদিদি পাকাপোক্ত আশ্রমবাসিনী হয়ে গেল। চার ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারে মানাতে না পেরে আলাদা হেঁশেল করল অঘোরবালার ননদ চারুবালা। দুই বিধবার সংসার আলাদা হলেও তাদের মাঝখানে সেতু ছিল দয়াময়ী। মা অঘোরবালার মত পিসি চারুবালাও জানত, দয়াময়ীর চেয়ে তার কাছের মানুষ আর কেউ নেই। পিতৃগৃহবাসিনী মেয়ে চারুবালার ভবিষ্যতের যে সংস্থান সর্বমঙ্গলা আর তার স্বামী বিরজাকান্ত করে গিয়েছিল, সেখানে তিন অবিবাহিতা দুই নাতনির বিয়ের খরচ থাকলেও আলাদা হেঁশেল চালানোর বরাদ্দ ছিল না। চারুবালার শেষ দুই সন্তান, শান্ত আর শীলার জন্মের আগে বিরজাকান্ত ধরাধাম ছেড়েছিল। নতুন দুই আগন্তুককে দেখে বলাবাহুল্য সর্বমঙ্গলা খুশি হয়নি।

দয়াময়ীর কাছে স্বীকারোক্তি পেশ করতে এসে তার কথকতায় এমন জড়িয়ে গেলাম যে, যা বলার ছিল, ভুলে গেলাম। আমার মাথা থেকে মুছে গেল সেই রাতের ঘটনা। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের দুশো বছরের পুরনো বাড়ির ঘরে ঢুকে পড়ল হাজার বছরের আবহ। আমার মনে হল হাজার বছর ধরে আমি বেঁচে আছি। আমার সামনে বসে যে লুচি বেলছে, সেই দয়াময়ীর বয়স পাঁচ হাজার বছর। অঘোরবালার বয়স দশ হাজারের কম নয়। রান্নাঘরের বাইরে দালানে সাদার ওপর হলুদ ছোপ শরীর যে বেড়ালটা হাঁটু মুড়ে, দু'থাবায় মুখ গুঁজে শান্তভাবে বসে রয়েছে, পৃথিবীর জন্মের সময় থেকে সে ওখানে আছে। মায়াবী এক নাগরদোলায় আমি ঘুরতে থাকলাম।

লুচির থালা ছেড়ে হাত ধোয়ার নাম করে উঠে পড়ে কলঘরে ঢুকে মুখে, কপালে, ঘাড়ে জল দিলাম। রাত ন'টার মধ্যে চেতলায় ফিরতে হলে মা, দিদার কাছে আর বেশি সময় বসার সুযোগ নেই। দয়াময়ীর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে? তারাপ্রসাদের শ্রাদ্ধে দয়াময়ী যাবে কিনা, জানি না। আমি যাব। মৃতের পরিবারের শ্মশানবন্ধু ছিলাম। আমার হাজির থাকাটা সংস্কারের মধ্যে পড়ে। আমি সংস্কার না মানলেও প্রিয়জন হারানো পরিবারের আবেগকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি না।

কলঘর থেকে ফিরে দেখলাম লুচি ভাজা শেষ করে কাঠের পিঁড়িতে অঘোরবালা বসে রয়েছে। রান্নার বাসনগুলো মাজার জন্যে এক জায়গায় জড়ো করে রাখছে

দয়াময়ী। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কখন খাবে?

দয়াময়ী বলল, ন'টার আগে নয়।

অঘোরবালা বলল, ন'টার আগে আমার গলা দিয়ে খাবার নামতে চায় না।

কোনও তরকারি রাঁধবে না?

আমার প্রশ্নের জবাব দিল দয়াময়ী। বলল, আবার তরকারি কী হবে? লুচি, আলুভাজার সঙ্গে তোর আনা সন্দেশ, মা-মেয়ে একটা করে নিয়ে নেব। আর কী চাই?

আমার মুখের দিকে একলহমা তাকিয়ে দয়াময়ী জিজ্ঞেস করল, সন্দেশ খাবি নাকি একটা?

না।

লুচি বানাতে বসে বড় বেশি করে মেজদাকে মনে পড়ছিল। লুচি খেতে মেজদা খুব ভালবাসত।

দেবুমামাকে দয়াময়ী মেজদা বলত। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দয়াময়ী জিজ্ঞেস করল, আর একটু বসবি তো? না, এখনই বাড়ি ফিরবি?

আধঘণ্টা বসব।

দয়াময়ী-অঘোরবালার সঙ্গে একতলার যে ঘরে এসে বসলাম, সেখানে দেবুমামা থাকত। দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম খোলা এই ঘরে আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেবুমামাকে থাকতে দেখেছি। সাবেক আমলের একটা তক্তপোশে দেবুমামার বিছানা আগের মত পাতা রয়েছে। পালিশ করা সেগুন কাঠের তক্তপোশের চারটে পায় ঝকঝক করছে। মনুর মা বোধহয় যত্ন করে তক্তপোশটা ঝাড়ামোছা করে। দেবুমামার ঘরে দয়াময়ীকে ঢুকতে দেখে বুঝলাম, পুরনো দিনের কোনও কাহিনী বর্ষার মেঘের মত দয়াময়ীর মনে ঘনিয়ে উঠছে। দয়াময়ীর কাছে আমি বসতে চেয়েছিলাম অন্য কারণে। বলার কথাগুলো খালাস করার সুযোগ হয়ত পেয়ে যাব! তা হওয়ার নয়। তারাপ্রসাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে দয়াময়ী গেলেও তাকে যে একা পাওয়া যাবে না, জানতাম। পরিবারের যে কোনও অনুষ্ঠানে পাদপ্রদীপের মূল আলোটা থাকে দয়াময়ীর মুখের ওপর। সকলে বসে দয়াময়ীর ঘরে। তার গা ঘেঁষে আত্মীয়স্বজন একটু বসতে চায়। দয়াময়ী বলল, তোর বাবার মত মেজদা ছিল আমাদের পরিবারের মাথার ওপর একটা ছাতা।

দয়াময়ী না বললেও আমাদের সংসারে দেবুমামার ভূমিকা আমি জানতাম। লম্বা, চওড়া, ভালরকম কালো মানুষটাকে পাত্তা না দেওয়ার চেষ্টা করলেও বুঝতাম, আমাদের সংসারের ভালমন্দের ওপর তার সজাগ নজর রয়েছে। দয়াময়ী বলল, তোর বাবার চেয়ে চার বছরের বড় ছিল মেজদা।

বাড়ি ফিরতে রাত হবে জেনেও দয়াময়ীর গল্পের ভাঁড়ারে ঢুকে পড়লাম। মা যেখানে, ঘর সেখানে। মায়ের কাছে থাকলে সাত খুন মাপ। দয়াময়ীর কাছে এলে নবনীতা, আমার অর্ধাঙ্গিনী পর্যন্ত নড়তে চায় না, আমি কোন ছার!

চৌদ্দ

গঙ্গার ধারে কংক্রিটের ছাতার নিচে আমাকে আটকে দিয়েছে তর্পণের সকালের বৃষ্টি। গঙ্গায় নেমে মৃত মা, বাবা দয়াময়ী সেন, চন্দ্রনাথ সেনের তর্পণ না করলেও বৃষ্টি, বাতাসে তাদের কথা, হাসি, হাঁটাচলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাদের কাছাকাছি যারা ছিল, মরে হেজে যাওয়া সেই মানুষগুলোও ছাতার চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হারানো সময়, মুছে যাওয়া আলো-অন্ধকার, রোদ-বৃষ্টি, ছায়া মায়া ভালবাসা, হেঁশেলের গন্ধ, এই শরতে, আরও একবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তারাপ্রসাদ মারা যাওয়ার কয়েকদিন পরে দয়াময়ীর সঙ্গে সেই সন্ধেটা ছবির মত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দয়াময়ীর কাহিনীতে আমি জমে গিয়েছিলাম।

দয়াময়ীর কাছে সহোদর দাদার চেয়ে বেশি ছিল দেবুমামা। দয়াময়ী চাইত, তার মেজদাকে দেবুমামার বদলে আমরা মেজমামা বলে ডাকি। আমরা মেজমামা বলতাম। লম্বা, চওড়া, কুচকুচে কালো দেবুমামাকে আড়ালে কেউ কেউ (আমার দুই দিদি নয়) 'টল্' দেবু, 'ফ্যাট' দেবু, এমনকি 'ব্ল্যাকজাপান' বলে উল্লেখ করলেও সামনাসামনি ও সব শব্দ উচ্চারণ করার সাহস কারও ছিল না। আমার মেজদা, দেবপ্রতিম কখনও-সখনও মুখ ফস্কে মেজমামার বদলে 'দেবুমামা' বলে ফেলে ছদ্ম অপরাধবোধে জিভ কাটত। রাশভারি মানুষটা সে ডাক, না শোনার ভান করলেও, তার মুখটা থমথম করত। অসম্ভব দায়িত্ববান, শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ ছিল দেবুমামা। সামান্য কাজে পান থেকে চুন খসলে হইচই জুড়ে দিত। মা-হারা এই বোনপোকে অঘোরবালা যতটা স্নেহ করত, ওটা চমকাত। হাইকোর্ট পাড়ার অ্যাটর্নি, আইনজীবী গণেশচন্দ্র গুহঠাকুরতার সঙ্গে লতায়পাতায় দেবুমামার আত্মীয়তা ছিল। তার অফিসেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চাকরি করেছে। আদালতপাড়ায় গুজব ছিল, গণেশচন্দ্রের যাবতীয় আইনি দলিলের মুসাবিদা ক'রে দেয় দেবু বোস। দেবুমামা পাস করা আইনজীবী না হলেও সম্পত্তি আইন গুলে খেয়েছিল। তার পরামর্শ না নিয়ে গণেশচন্দ্র এজলাসে ঢুকত না। গণেশচন্দ্রের চেয়ে দেবুমামার আয় বেশি, অ্যাটর্নিপাড়ায় এই রটনাও ছিল। হাইকোর্ট ছাড়া কলকাতার অন্য আদালতে গণেশচন্দ্র মামলা করত। আলিপুর, শিয়ালদা, বারাসত, ব্যারাকপুরের আদালতেও গণেশচন্দ্রের মক্কেল ছিল। তার সব মামলার তদারকি করত দেবুমামা। আদালতে সাতসকালে হাজিরা থাকলে, ভোররাতে দেবুমামা সেখানে পৌঁছে যেত। শেষবেলায় ডাক হবে জানলে দুপুরের আগে এজলাসে ঢুকে পড়ত। সেখানে তখন খুনের মামলা চললে, শ্রোতাদের আসনে বসে তাই শুনত। গণেশচন্দ্রের জন্যে তার আগে নথিপত্র তৈরি করে রাখত। এজলাসের সামনে চাতালে, মাদুরের ওপর দিনের নানা সময়ে, লুঙি পরা, খালি গা দেবুমামাকে পাশবালিশ জড়িয়ে মাথার নিচে বালিশ রেখে অনেকে ঘুমোতে দেখেছে। সকালের জন্য নির্ধারিত মামলা, কোনও কারণে বিকেলে হচ্ছে জানলে, ঘুমনো ছাড়া দেবুমামার কিছু করার থাকত না। আদালতকে দেবুমামা ঘরবাড়ি করে নিয়েছিল। গণেশচন্দ্রের সেরেস্তায় পোশাক বদলানোর কোনও অসুবিধে ঘটত না। এজলাসে দাঁড়িয়ে সওয়াল করার সুযোগ

দেবুমামার না থাকলেও আদালতের বিচারপতি থেকে পেশকার, ঝাড়ুদার, সকলে তাকে চিনত। নিন্দুকেরা আড়ালে 'মামলাবাজ' 'কোর্টকাছারির পোকা' বললেও সমীহ করত। লোকটা রেগে গেলে ক্ষতি করে দিতে পারে, এমন ধারণা অনেকের ছিল। দেবুমামাকে তারা ভয় পেত, এড়িয়ে চলত।

দেবুমামাকে বিপজ্জনক ভেবে নিয়ে আত্মীয়স্বজনের একাংশ তাকে অপছন্দ করলেও, দয়াময়ী, তার মেজদাকে অন্য চোখে দেখত। দেবুমামার মত নিরীহ মানুষ যে কম আছে, আমাদের বোঝাতে চাইত। দয়াময়ীর কথা আমরা অবিশ্বাস না করলেও যোল আনা বিশ্বাস করতাম, বললে সত্যের অপলাপ হবে। মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আমি চুপ করে থাকতাম। দেবুমামার নিরীহত্বের গল্প, এক সন্ধেতে, তার সামনে লেবুতলার বাড়ির ছাতে দয়াময়ী শুনিয়েছিল। ফাল্গুন মাসের ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে দেবুমামার দিকে তাকিয়ে দয়াময়ী যে মুহূর্তে 'মেজদা, মনে আছে অষ্টমীর রাতে বীথি আর কয়েকজনকে তোমার ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা' বলে শুরু করেছিল, দেবুমামা ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলেছিল, 'খুব মনে আছে', বলে ছাত থেকে পালানোর জন্য উসখুস শুরু করেছিল।

শ্রোতাদের চাপে ঘটনাটা দয়াময়ী বলা শুরু করতে 'জরুরি কাজ আছে' বলে দেবুমামা ছাত থেকে নেমে গিয়েছিল। দেবুমামা চলে গেলেও চোরা হাসি মুখে নিয়ে বাইশ বছর আগের এক অষ্টমী সন্ধের বিবরণ শুনিয়েছিল দয়াময়ী। চোদ্দ বছরের বীথিকার পাকা দেখা ঠিক হয়েছিল নবমীর সকালে। অষ্টমীর সন্ধেতে স্নেহের ভাগ্নীকে কুমারীজীবনে শেষবারের মত প্রতিমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল দেবুমামা। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ি থেকে বীথিকার সমবয়সী আরও কয়েকজন সঙ্গী জুটেছিল। গোলদীঘির প্রতিমা দেখে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোমণ্ডপে বীথিকা আর তার সঙ্গিনীদের নিয়ে দেবুমামা পৌঁছে গেল। মণ্ডপের সামনে জনারণ্য। তা স্থির নয়। স্রোতের মত বয়ে চলেছে। তার মধ্যে মাইক বাজছে, ঢাক বাজছে, ঘন ঘন মিলিটারি হুইসল বাজিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা শৃঙ্খলা রাখার নির্দেশ দিচ্ছে, সে এক জগঝম্প কাণ্ড! দেবুমামাকে দাঁড়াতে বলে প্রতিমা দেখার জন্যে মেয়েদের আলাদা লাইন ধরে সঙ্গিনীদের সঙ্গে বীথিকা ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেবুমামার মাথায় বাজ পড়ল। প্রতিমা দেখে ফেরার রাস্তা যে আলাদা, বুঝতে অসুবিধে হল না। বীথিকা আর মেয়েদের ভিড় থেকে বার করে নেওয়ার জন্যে মেয়েদের লাইনে দেবুমামা ঢুকে পড়লেও বেশিদূর যেতে পারল না। দুই স্বেচ্ছাসেবক সেখান থেকে তাকে বার করে আনল। কড়া ধমক দিল একজন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা দশাসই চেহারা মাঝবয়সী একজন মানুষকে শিশুর মত উতলা হতে দেখে, অন্য স্বেচ্ছাসেবক, কারণটা জানতে চাইল। কারণ শুনে সে আশ্বস্ত করল দেবুমামাকে। বলল, আপনার মেয়েরা যখন এখানে ফিরে আসবে বলেছে, তখন এখানেই অপেক্ষা করুন।

তার কথায় যুক্তি থাকলেও প্রতিমা দেখে মেয়েদের বেরনোর রাস্তাটা জানতে চাইল দেবুমামা। ছেলেদুটো তিনটে রাস্তা বলে দেবুমামার মাথা আরও গুলিয়ে দিলেও প্রতিমা দেখে মেয়েরা যে মণ্ডপের সামনে ফিরে আসবে, এ কথা বলতে ভুলল না। কথাটা

দেবুমামার মনে ধরল। ভিড়ে কুটোর মত ভেসে যাওয়ার অবস্থা হলেও দাঁত টিপে দেবুমামা দাঁড়িয়ে থাকল। রাত বাড়ার সঙ্গে ভিড় বাড়ছিল। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে ন'টা পৌঁছনোর পরেও বীথিকা সমেত ছ'জন মেয়ের কেউ না ফিরতে ভয়ে কাঁপতে শুরু করল দেবুমামা। পুজো দেখতে ছ'জনের চারজন এসেছিল কলকাতার বাইরে থেকে। দয়াময়ীর কাকি, পিসিদের কুটুমের মেয়ে তারা। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের অন্য দু'বাড়িতে উঠেছিল। তাদের এক-দুজনকে মুখ দেখলে দেবুমামা তখন চিনতে পারত না। ভিড়ের মধ্যে দেবুমামাকে হয়ত তাদের অচেনা লাগত। কলকাতা শহরে রাস্তা চিনে তাদের পক্ষে বাড়ি ফেরা অসম্ভব ছিল। কলকাতার মেয়ে বীথিকা, আর তার এক মামাতো বোনেরও একই দশা। বাড়ি আর বাড়ির সামনে রাস্তাটা ছাড়া কলকাতা শহর, তাদের কাছে ছিল বিদেশ। বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা, তারা চিনত। চোদ্দ বছর বয়স হলেও লেবুতলার বাড়ি থেকে বীথিকা তখনও একা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে মামাবাড়িতে আসেনি। দেবুমামার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছিল। মণ্ডপ থেকে মেয়েদের বেরনোর তিনটে রাস্তা বাঁই বাঁই করে একপাক ঘুরে আসার কথা ভেবেও গেল না। ভিড় ঠেলে তিনমুখো তিনটে রাস্তা চক্কর দিয়ে মণ্ডপে ফিরতে রাত এগারটা বেজে যাবে। দেবুমামার মাথা ঘুরছিল। চারপাশ আলোয় ঝলমল করলেও তার চোখের সামনে নেমে আসছিল অন্ধকার। ছ'জন মেয়ের পাঁচজনকে ভুলে গিয়ে শুধু বীথিকার কথা ভাবছিল। কাল সকাল সাড়ে দশটায় বীথিকার পাকা দেখা। দেড় মাস পরে অঘ্রানের তেইশে তার বিয়ে। বীথিকাকে না নিয়ে সে বাড়ি ফিরবে কী করে? দয়াময়ীকে কী বলবে? দেবুমামার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকল। পায়ের নিচে মাটি কাঁপতে শুরু করতে ফুটপাতের ওপর বসে পড়ল। পরিষ্কার পোশাকের স্বাস্থ্যবান একজন পুরুষকে রাস্তায় বসে কাঁদতে দেখে এক স্বেচ্ছাসেবক অবাক হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পেছনে দাঁড়িয়ে গেল আর একজন স্বেচ্ছাসেবক। অষ্টমীর রাতের ভিড়ের মধ্যে আরও একটা ভিড় তৈরি হল। চার-পাঁচটা স্টিলের মিলিটারি হুইসল কানফাটানো আওয়াজ তুলে একটানা বেজে চলল। স্বেচ্ছাসেবকদের একজনকে কোনওমতে হারিয়ে যাওয়া ভাগ্নীর নাম আর নিজের নাম দেবুমামা বলতে পেরেছিল। কিছুক্ষণ পরে মাইকে তারস্বরে শুরু হল ঘোষণা, বীথিকা সেন, তোমার জন্যে তোমার মামা দেবপ্রসাদ বোস, বিবেকানন্দ রোডে মণ্ডপের মূল প্রবেশপথে অপেক্ষা করছেন। তুমি এখনই চলে এস। বীথিকা সেন, তোমার জন্যে, বীথিকা, দেবপ্রসাদ বোস, বীথিকা বোস, দেবপ্রসাদ, সেন, বোস, হিজবিজবিজ, শুনে দেবুমামার কানে তালা লেগে গেল। রাত এগারটাতেও বীথিকা এল না। রাস্তায় ভিড় আরও বেড়েছে। হারিয়ে যাওয়া নতুন ছেলেমেয়ের নাম মাইকে ঘোষণা হচ্ছে। জ্ঞান হারানোর আগে দেবুমামার মাথার ভেতরটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের একজন বলল, মেসোমশাই, আপনার ভাগ্নী নিশ্চয়ই শ্রীগোপাল মল্লিকক লেনের বাড়িতে ফিরে গেছে। আপনি বাড়ি গিয়ে দেখুন। তাকে পেয়ে পাবেন। স্বেচ্ছাসেবকের গলায় যথেষ্ট সহানুভূতি থাকলেও তার কথা দেবুমামা শুনতে পাচ্ছিল না। ফুটপাত খালি করতে তাকে সেখান থেকে ছেলেটা ভাগাতে চায়, আন্দাজ করছিল। ফুটপাত খালি করে দেওয়ার আগে দেবুমামা ঠিক

করে নিয়েছিল, আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা না করে তার উপায় নেই। দয়াময়ীর কাছে কীভাবে মুখ দেখাবে? ভগ্নীপতি চন্দ্রনাথ সেনকে কী কৈফিয়ত দেবে? কাল বীথিকার পাকা দেখা ভণ্ডুল হয়ে গেলে আত্মীয়কুটুমকে বলার মত কিছু থাকবে না। লেবুতলার বাড়িতে কাল দু'তরফের কম অতিথি আসবে না। মামার সঙ্গে ঠাকুর দেখতে গিয়ে পাত্রী হারিয়ে গেছে শুনলে সকলে তার গায়ে থুতু দেবে। আদালতপাড়ায় খবরটা পৌঁছলে সেখানে টিটিক্কার পড়ে যাবে। অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র গুহঠাকুরতার অফিসে লালবাতি জ্বলবে। আত্মহত্যার জন্যে হেদুয়ার জলের ধারে কিছু সময় দাঁড়িয়ে তার মনে হল, জায়গাটা ডুবে মরার মত যথেষ্ট নির্জন নয়। হেদুয়ার ভেতরে কোনও পুজোমণ্ডপ না থাকলেও অষ্টমীর রাতে সেখানে অনেক মানুষ রয়েছে। ভিড় থেকে বেরিয়ে ফাঁকা মাঠে তারা হাওয়া খেতে ঢুকেছে। বেঞ্চে, ঘাসে বসে গল্প করছে কেউ কেউ। হেদুয়ার জল ঘেঁষে বসে রয়েছে অল্পবয়সী কিছু ছেলেমেয়ে। এতো মানুষের চোখের সামনে আত্মঘাতী হওয়া সহজ নয়। আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার মত লজ্জা আর নেই। সে আর এক কেলেঙ্কারি। পুলিস কেস পর্যন্ত হতে পারে। খোলাবাজারে বিষ কি পাওয়া যায়? বেথুন কলেজের ছাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে সেখান থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ জীবন শেষ করে দেওয়া যেত। কলেজের গেট এখন বন্ধ। ঢোকার উপায় নেই। ছাতুবাবুর বাজার থেকে কি এত রাতে পাঁচ লিটার কেরোসিন তেল আর একটা দেশলাই বাক্স কেনা সম্ভব? দু'পায়ের গোড়ালি আর দু'হাতের কবজির রক্তবাহী শিরাগুলো ধারালো ক্ষুর দিয়ে কেটে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তশূন্য হয়ে মারা যাওয়া সম্ভব। রাত এগারটায় কোনও সেলুন থেকে কি একটা ধারাল ক্ষুর জোগাড় করা যায়? দরকার হলে ক্ষুরটা সে কিনে নেবে। হ্যাঁ, তাই করবে। ক্ষুর কিনে হেদুয়ার নির্জন কোনও অন্ধকার গাছতলায় গিয়ে শেষ করে দেবে এই অভিশপ্ত জীবন। তার জন্যে কাঁদার কেউ নেই। বিয়ে না করে খুব বেঁচে গেছে। বৌ-ছেলেমেয়ে না থাকার জন্যে তার নামে সংসার ভাসিয়ে পালানোর অভিযোগ কেউ করবে না। তার দাদা, কানাই বোস মন খারাপ করলেও ভাইপোরা মৃত কাকার সম্পত্তি পেয়ে খুশিতে হাততালি দেবে। তবে হ্যাঁ, অঘোরবালা অসহায় হয়ে যাবে। মেজদার জন্যে দয়াময়ী দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে। তারপর সকলে হতভাগ্য দেবু বোসকে ভুলে যাবে। মৃত্যুতাড়িত চিন্তার ঘোরে রাত পৌনে বারোটায় শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ির সামনে এসে গেছে, দেবুমামা খেয়াল করেনি। বাড়ির সব ঘরে আলো জ্বললেও সদর দরজায় বাড়তি মানুষ নেই। উত্তেজিত গলা শোনা যাচ্ছে না। দেবুমামাকে গলিতে ঢুকতে দেখে বাড়ির জানলা থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, অই, দেবুদা আসছে।

কথাটা বাড়ির ভেতরে সকলের কানে যেতে সেখানে হইচই শুরু হল, এসে গেছে, এসে গেছে। বীথিকা এবং আরও পাঁচজন মেয়েকে পুজোমণ্ডপের এক স্বেচ্ছাসেবক পৌনে এগারটায় বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। নিরুদ্দিষ্ট দেবুমামার খোঁজ পেতে স্থানীয় থানায় দয়াময়ী পাঠিয়েছিল পিসতুতো দু'ভাই, শান্ত আর কান্তকে। চুয়াল্লিশ বছরের দশাসই, নীরোগ সুস্থ মাথার দেবপ্রসাদ বোসকে খুঁজে বার করতে পুলিস হয়ত তল্লাশিতে

নেমে পড়েছে। বীথিকা সমেত ছয় মেয়ে এক ঘণ্টা আগে বাড়ি ফিরেছে শুনে, প্রথমে তাদের শাস্তি দিতে দেবুমামা একটা বেত খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে, সেটা পেলেও কাজে লাগানো সঙ্গত হবে না, আঁচ করে, নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে কপাট লাগিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। দরজায় টোকা দিয়ে দয়াময়ী বারবার ডাকল, মেজদা খেতে এস। মেজদা দরজা খোল। ছেলেমানুষের মত রাগ করে না, দাদা আমার!

দেবুমামা ঘর থেকে বেরল না। বিয়ে না করা যে কত যথার্থ হয়েছে, সেই রাতে দেবুমামা নাকি ভালরকম বুঝেছিল। বীথিকার পাকা দেখার দিনকয়েক পরে এক সন্ধেতে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর ঘরে বসে, তাদের হালকা মেজাজে কথাটা দেবুমামা বলেছিল। দেবুমামা নারীবিদ্বেষী না হলেও অঘোরবালা আর দয়াময়ী ছাড়া পরিবারের কোনও মেয়ের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারত না। দু-একটা কথা কখনও বললে, তা মেয়েদের কানে রুক্ষ ঠেকত। আমাদের চেনা সবচেয়ে কুশ্রী স্ত্রীলোককে দেবুমামার সহধর্মিণী খাড়া করে, তাদের দাম্পত্য জীবনে কি কি ঘটতে পারে, তা নিয়ে আমরা, ভাইবোনরা আলোচনা, হাসাহাসি করতাম। সবটাই করতাম দয়াময়ীর আড়ালে। তার মেজদাকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করা দয়াময়ী পছন্দ করত না। সে রকম কিছু নজরে এলে ধমক দিয়ে আমাদের ভূত ভাগিয়ে দিত। আমরা চুপ করে গেলেও আত্মীয়স্বজনকে থামানো দয়াময়ীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেবু বোসের চিরকুমারত্ব নিয়ে তারা এমন সব কথা বলত, যা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। সুস্থ, সবল, আর্থিকভাবে সচ্ছল মানুষটা কেন অবিবাহিত থেকে গেল, এ নিয়ে তাদের জল্পনার শেষ ছিল না। রোজ সকালে তার আদাকুঁচো মেশানো ভিজে ছোলা খাওয়া নিয়েও নানা মতামত তারা ব্যক্ত করত। মাসি অঘোরবালার অঢেল স্নেহে বড় হলেও ঘোষচৌধুরি পরিবারে দেবুমামার জায়গাটা তেমন পোক্ত ছিল না। বলা ভাল, একটু নড়বড়েই ছিল। মাসির পরিবারে শেষ পর্যন্ত সে বাইরের লোক থেকে যাবে, দেবুমামা জানত। ঘোষচৌধুরিদের তিনটে বাড়ির নানা ঘরে তাকে নিয়ে রঙ্গরসিকতা, ফাজলামি হয়, এ তথ্যও তার অজানা ছিল না। ঘোষচৌধুরি পরিবারের বিরুদ্ধে তার মনে বিদ্বেষ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। দয়াময়ীর খুড়তুতো কাকা, যাকে নতুনকাকা বলত দয়াময়ী, বিখ্যাত চিকিৎসক, ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরিকে দেবুমামা এমন শিক্ষা দিয়েছিল যে, তার গোটা পরিবার লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। পরিমলের সেজ ছেলে বিনয় আর একমাত্র মেয়ে তনুকার জীবনকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল দেবুমামা। পিতৃকুলের দুই ছোট ভাইবোনের দুর্দশা দেখে দয়াময়ী দারুণ ব্যথিত হলেও দেবুমামাকে ঠেকাতে পারেনি। সে সুযোগ ছিল না। দেবুমামাই যে আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে বিনয়-তনুকার সর্বনাশ করছে, দয়াময়ী জানত না। দয়াময়ী জেনেছিল অনেক পরে। সে জানা ছিল প্রমাণবিহীন, বেশিটা অনুমান। তখন তার কিছু করার ছিল না।

দেবুমামার ঘরে তার তক্তপোশের ওপর বিছানাতে বসে সেই সন্ধেতে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কয়েক টুকরো কথিকা শুনিয়েছিল দয়াময়ী। দয়াময়ীর মুখে সেই প্রথম শুনলাম, তার কাকা, ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরির একমাত্র মেয়ে, তনুকা মাসিকে

ঘিরে দেবুমামা যে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল, তা মুখ ফুটে কখনও না বললেও যাদের বোঝার, তারা বুঝে গিয়েছিল। মাসির খুড়তুতো দেওরের মেয়েকে বিয়ে করলে মনুসংহিতার বিধিবিধান যে অমান্য করা হয় না, দেবু বোস তা জানলেও মনের ইচ্ছেটা সে কখনও অঘোরবালাতে বলতে পারেনি। দয়াময়ীকেও বলেনি। অঘোরবালাকে বলতে সাহস পায়নি। দয়াময়ীকে জানাতে লজ্জা পেয়েছিল। ঘোষচৌধুরিদের তিন বাড়িতে যাতায়াত এত নিয়মিত, যোগাযোগ এত নিবিড় ছিল যে দেবুমামার হাবভাব দেখে তনুকা কিছু বুঝেছিল। সে যুগের তুলনায় তনুকা কম আধুনিকা ছিল না। কথাটা সে পাঁচকান করেনি। মা রত্নাবলীকে একান্তে বলেছিল। স্বামী, তিন ছেলেকে কিছু না জানিয়ে কয়েকদিন দেবুমামার ওপর নজর রেখে রত্নাবলী জেনে গেল, তনুকার ধারণা ভুল নয়। ব্যস্ত স্বামীকে রত্নাবলী ঘটনাটা জানাল। স্ত্রীর কথা কানে গেলেও পরিমল পাত্তা দিল না। বলল, তনুর বিয়ের ব্যবস্থা করলেই তো হয়!

রত্নাবলী বলল, কর।

পরিমল বলল দেবুরও একটা বিয়ে দেওয়া দরকার।

ওই মুশকো কালো লোকটাকে কে বিয়ে করবে?

পরিমল বলল, দেবুকে বিয়ে করার মেয়েও সংসারে আছে। সে বছর বি এ পরীক্ষা দেবে তনুকা। তার জন্যে পরিমল-রত্নাবলী ছেলে খোঁজা শুরু করল। ঘোষচৌধুরি বংশে পরিমল তখন সবচেয়ে বড়লোক। চিকিৎসক হিসেবে সুনামের তুলনায় পসার ছিল বেশি। শেভ্রলে গাড়ি চেপে রোগী দেখতে যেত। দু-তিন বছরের বেশি কোনও গাড়ি ব্যবহার করত না। পরিমলকে আমরা বলতাম ডাক্তারদাদু। আমাদের লেবুতলার বাড়িতে ডাক্তারদাদুকে গাড়ি চালিয়ে ছেলেবেলায় কয়েকবার আসতে দেখেছি। কাকার চিকিৎসায় দয়াময়ীর অগাধ আস্থা ছিল। ছেলেমেয়েদের কারও অসুখ করলে কাকার কাছে নিয়ে যেত। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ডাক্তারদাদুর গ্যারাজে নানা নতুন নামের গাড়ি দেখেছি। কখনও শেভ্রলে, কখনও অস্টিন, ফোর্ড বুইক, ক্যাডিলাক সব বিদেশি নাম। আঙুল দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে দেখতাম সে সব গাড়ি। তনুকামাসি ছিল রীতিমত সুন্দরী, হাসিখুশি আদুরে মেয়ে। সাজপোশাকে চটক ছিল। তনুকামাসির কোলে চেপে ঘোরার স্মৃতি আজও মনে করতে পারি। মানুষের শরীর থেকে যে কত সুন্দর গন্ধ বেরয়, তখনই প্রথম জেনেছিলাম। আরও পরে, বোঝার মত বয়স হলে, টের পেলাম, সুগন্ধ শুধু মানুষের শরীর থেকে বেরয় না, সময়ের গায়েও জড়িয়ে থাকে। বাতাসে তখন ছেলেবেলার সুগন্ধ মিশে ছিল। বয়স বাড়তে টের পেয়েছিলাম. ডাক্তারদাদুর পরিবারের সকলের চালচলন, কথাতে কিঞ্চিৎ অহমিকা আছে। তনুকামাসির অহমিকাতে মিষ্টি গন্ধ জড়ানো ছিল। তাদের প্রিয় দিদিমণি, দয়াময়ীর সামনে তারা অহমিকা ঢেকে রাখলেও পরিবারের ভেতরে তা করত না। দিদিমণির ছেলেমেয়েদের আদর করতে তারা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তার টানেই মামাবাড়িতে আমরা বারবার যেতে চাইতাম। সে আদরে কোনও ভেজাল ছিল না। আসল আদরটা সব শিশু চিনতে পারে। তনুকা মাসি আর তার তিন দাদার আদরে আমি ভেসে যেতাম। তাদের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করতাম। তনুকামাসির স্কুলজীবন তখনও শেষ হয়নি। তার জন্যে উপযুক্ত ছেলে

খোঁজা শুরু হয় আরও পাঁচ-ছ বছর পরে। তখন কোলে চেপে ঘোরার বয়স পার হয়ে আমি স্কুলে পড়ছি। নিচু ক্লাসের ছাত্র হলেও রোজ স্কুলে যেতে হয়। তনুকামাসির জন্যে বর খোঁজার খবর আমাদের লেবুতলার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ছোটবোনের বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে জেনে খুশি হয়েছিল দয়াময়ী। বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধু কেউ এলে তাকে খবরটা শুনিয়ে দিত। আমাদের বাড়ির সামনে এক দুপুরে এসে দাঁড়িয়েছিল ডাক্তারদাদুর ক্যাডিলাক গাড়ি। দাদা-দিদিদের সঙ্গে আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করলেও কিশলয় তখন শিশু। মায়ের কোলে চেপে না ঘুরলেও তার আঁচলের তলায় থাকে। কিশলয়কে নিয়ে দয়াময়ী বাড়িতে ছিল। দয়াময়ীকে একা পেতেই ভরদুপুরে আমাদের বাড়িতে ডাক্তারদাদু এসেছিল। সময় নির্বাচনে ডাক্তারদাদুর ভুল হয়নি। দয়াময়ীর সঙ্গে পনের মিনিট যে বিষয়ে ডাক্তারদাদু কথা বলেছিল, সেখানে তনুকামাসির বিয়ে নিয়ে একটা শব্দ ছিল না। তনুকামাসির জন্যে ছেলে খোঁজা শুরু করার বৃত্তান্ত, ঘুণাক্ষরে দয়াময়ীকে ডাক্তারদাদু জানায়নি। একেবারে অন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। সবরকমভাবে সুলক্ষণা, দারুণ সুন্দরী, পঁচিশ বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে শুভপরিণয়ে দেবুমামাকে আবদ্ধ করতে দয়াময়ীর সাহায্য চেয়েছিল। দয়াময়ী ছাড়া সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে দেবুমামাকে কেউ রাজি করাতে পারবে না, ডাক্তারদাদু জানত। মাঝদুপুরে দয়াময়ীর কাছে এসেছিল তার সাহায্য চাইতে। আদাজল খেয়ে কুড়ি বছর ধরে দাদার বিয়ের চেষ্টা করে দয়াময়ী হাল ছেড়ে দিয়েছিল। কথাটা ডাক্তারদাদু নতুন করে তুলতে দয়াময়ী কিছুটা অবাক হলেও খুশি হয়েছিল। দেবুমামার বিয়ে দিতে ডাক্তারদাদুর আগ্রহের কারণটা কয়েক মিনিটে ধরে ফেলেছিল। বেলুড়ে কোনও এক অনাথ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ডাক্তারদাদু, সেখানকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। আশ্রমে পালিতা, বিবাহযোগ্যা এক মেয়ের জন্যে দেবুমামাকে পাত্র হিসেবে ডাক্তারদাদু নির্বাচিত করেছিল। সহায়সম্বলহীন বিধবা মা ছাড়া মেয়েটার কেউ নেই। পাত্রীর পরিচয় দেওয়া শেষ করে ডাক্তারদাদু বলেছিল, জীবনে দু-একটা ভাল কাজ সব মানুষকে করতে হয়। মেয়েটাকে বিয়ে করলে দেবু শুধু আদর্শ সহধর্মিণী পাবে না, কন্যাদায়গ্রস্ত এক বিধবাকে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচাবে, অনাথ আশ্রমে আর একজন অনাথের জায়গা হবে। তোর, আমার নামের পাশে কিছু পুণ্য জমা পড়বে।

পরিমলের কথাগুলো দয়াময়ীর মনে দাগ কেটেছিল। দেবুমামার বয়স তখন চুয়াল্লিশ। দশ বছরের বড় দাদাকে বিয়ের পিঁড়িতে তোলার ছক তৈরি করে কন্যাদায়গ্রস্ত বিধবাকে উদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছিল দয়াময়ী। ডাক্তারদাদু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। তার এই ভাইঝি কোনও কাজের ভার নিলে, তা যে নিখুঁতভাবে করবে, ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরির সন্দেহ ছিল না। দেবুমামাকে সংসারী করতে আরও একবার দয়াময়ী পুরোদস্তুর কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। কুড়ি বছর ধরে প্রথমে অঘোরবালা, তারপর সে নিজে চেষ্টা করে যা পারেনি, এবার মনে হল, সেই কাজ সে পারবে, আইবুড়ো মেজদার একটা হিল্লে করে দেবে। ঘরে বৌ এলে মেজদা নিজের মত করে সংসার পাততে পারবে। তার নিঃসঙ্গতা ঘুচবে। পুরুষের জীবনে চুয়াল্লিশ বছর, এমন কিছু বেশি বয়স নয়। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তারদাদুর প্রস্তাবটা দেবুমামাকে শুনিয়ে,

তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্যে অনুরোধ-উপরোধে দয়াময়ী ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। প্রথমে দেবুমামা খানিকটা চমকে গেলেও অ্যাটর্নি অফিসের চাকরিতে শানানো বুদ্ধি খাটিয়ে ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরির প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত কারণটা বুঝে গেল। ফাঁকা ছাতে বোনের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে দেবুমামা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ঘটনার উৎসমুখ জানতে পেরে তার চৌকো চোয়াল শক্ত হল।

অফিস থেকে ফেরার পথে তখন হপ্তায় তিন-চারদিন শেষ বিকেলে দেবু মামা আসত আমাদের বাড়িতে। দয়াময়ীর সংসারের খবর, ছেলেমেয়েরা কে কেমন লেখাপড়া করছে, জানতে চাইত। আমার দাদা-দিদিদের কাউকে সামনে পেলে, প্রায়ই মৌখিক অঙ্ক, ইংরেজি ট্রানস্লেশন জিজ্ঞেস করে এমন নাস্তানুবুদ করত, যে তার পায়ের শব্দ পেলে সকলে গা-ঢাকা দিত। সবে স্কুলে আমি ভর্তি হওয়াতে দেবুমামার প্রশ্নবাণ থেকে রেহাই পেতাম। কিশলয় ছিল কোলের শিশু। অ আ ক খ শিখতে বিদ্যাসাগরের পাঁচটা প্রথমভাগ ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করেছে। দেবুমামাকে পর্যন্ত রেয়াৎ করে না। তাকে কোলে নিয়ে দয়াময়ী সেই বিকেলে দেবুমামাকে ডেকে, ছাতে চলে গিয়েছিল। ফাঁকা ছাতে আলাপ চালিয়েছিল ভাইবোন। বোনের সঙ্গে সরল মনে ছাতে উঠলেও তার প্রস্তাব শুনে দেবুমামা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধিমান মানুষ ছিল দেবুমামা। দয়াময়ীর প্রস্তাবের ভেতরের কথাটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। অপমানে মাথায় আগুন জ্বললেও বোনকে বুঝতে দেয়নি। ঘোষচৌধুরি বংশে বাতি দিতে যে কেউ থাকবে না, আরও একবার টের পেয়েছিল। মুচকি হেসে বলেছিল, পরিমলকাকার তিনটে ছেলে থাকতে কন্যাদায়গ্রস্ত বিধবাকে উদ্ধার করতে আমাকে ধরে টানাটানি করছে কেন? এক মুহূর্ত থেমে দয়াময়ীকে দেবুমামা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, নিজের মেয়ের বিয়ে নিয়ে কিছু বলল পরিমল? দয়াময়ীকে চুপ করে থাকতে দেখে দেবুমামা বলেছিল, তনুকার জন্যে ছেলে দেখার কথা তোকে না বলে আমাকে সংসারী করতে সে এত ব্যস্ত কেন?

দেবুমামার প্রশ্নের ন্যায্যতা বোঝার সঙ্গে আরও কিছু অনুভব করেছিল দয়াময়ী। দেবুমামার কথাটা ঈষৎ ধোঁয়াটে ঠেকলেও মুখে কিছু বলেনি। তারপর দু'বছরের মধ্যে ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরির পরিবারে এমন সব কাণ্ড ঘটে গেল, যা তাদের সংসারকে প্রায় তছনছ করে দিল। বি এ পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে নকল করার অভিযোগে, পরীক্ষা কেন্দ্রে হাতেনাতে ধরা পড়ল তনুকা। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা খুদে খুদে হরফে লেখা, এক ডজন প্রশ্নোত্তরের চোথার হস্তাক্ষর পরীক্ষা করে জানা গেল চোথা তৈরি করে দিয়েছিল তার দাদা বিনয় ঘোষচৌধুরি। জেরার চোটে চোথালেখকের নাম, তনুকা মেনে নিতে বাধ্য হয়। বিনয়ের বিরুদ্ধে থানায় পরীক্ষা নিয়ামক এজাহার লেখাতে তাকে পুলিস খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কলকাতার প্রায় সব বাংলা, ইংরেজি সংবাদপত্রে খবরটা ছাপা হতে পাড়ার চা দোকান, রোয়াক থেকে বনেদিবাড়ির বৈঠকখানা পর্যন্ত তা রটে গেল। শিক্ষাব্যবস্থার যে বারোটা বেজে গেছে, এ নিয়ে হা-হুতাশের ঝড় বইতে থাকল। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে, মামাবাড়ির একটা অংশ কিছুদিনের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরির কাছে রুগী আসা বন্ধ হয়ে গেল, না সে নিজেই চেম্বারে বসা বন্ধ করেছিল, আমি জানি না। আমাদের

লেবুতলার বাড়িতে সত্য-মিথ্যে নানা খবর এসে জড়ো হলেও দেবুমামা মুখে কুলুপ এঁটে থাকল। কাকা আর খুড়তুতো ভাইবোনের লাঞ্ছনায় দয়াময়ী মুষড়ে পড়লেও প্রাণ খুলে কথা বলার মত কাউকে পেল না। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে অঘোরবালার সঙ্গে দেখা করতে কয়েকবার গেলেও নিজের বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে দয়াময়ী যায়নি। তনুকার সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাইলে অঘোরবালা বারণ করেছিল। বলেছিল, ঘটনাটা আর একটু জুড়োক।

সময় এমন এক জাদুকর যে সবচেয়ে গরম ঘটনাকে অল্পদিনে জুড়িয়ে জল করে দিতে পারে। পরীক্ষা-কেলেঙ্কারির তৃতীয় মাসে ডাক্তারদাদুর পারিবারিক জীবন স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। কাকা-কাকির সঙ্গে দয়াময়ী দেখা করে সাহস দিয়েছিল। চাঙ্গা করে তুলেছিল তনুকাকে। আদালতে আত্মসমর্পণ করে বিনয়মামা রেহাই পেলেও তার মনমরা ভাব কাটেনি। বিলেত যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিল। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ি থেকে এসব খবর নিয়ে দয়াময়ী বৌবাজারের বাড়িতে ফিরলে, আমরা মামাবাড়ির হালচাল জানতে পারতাম। দেবুমামা আগের মত আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করলেও ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরির পারিবারিক কেচ্ছা নিয়ে টুঁ শব্দ করত না। পাথরের মত নির্বিকার দেবুমামাকে জিজ্ঞাসাবাদে দয়াময়ী ক্ষান্তি দিয়েছিল। যথেষ্ট গোপনীয়তা বজায় রেখে, জব্বলপুরবাসী এক বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে তনুকামাসির বিয়ে পাকা করেছিল ডাক্তারদাদু। বিয়ের কার্ড ছাপানোর আগে মেজ ছেলে তরুণকে দয়াময়ীর কাছে পাঠিয়ে ডাক্তারদাদু খবরটা জানিয়েছিল। তরুণকে দয়াময়ী বলেছিল, তনুর বিয়েটা কাকাবাবু জব্বলপুরে গিয়ে দিতে পারত।

তরুণ সামান্য হকচকিয়ে গেলেও বলেছিল, ছেলের বাড়ি তাই চেয়েছিল। বাবা রাজি হল না। কলকাতায় সব আত্মীয়স্বজন, তাদের ছেড়ে।

আধখানা বাক্য বলে তরুণ ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। দয়াময়ী কথা বাড়ায়নি। ফিসফিস করে তরুণ বলেছিল, ছেলের বাড়িতে কলকাতার কোনও খবরের কাগজ ঢোকে না। তনুকে নিয়ে যে সব আজেবাজে খবর, কাগজে বেরিয়েছিল, বিশ্বরূপ, বা তার বাড়ির কেউ সে সবের বিন্দুসির্গ জানে না। কলকাতায় যারা জানত তারাও ভুলে গেছে।

জব্বলপুর গান্‌শেল ফ্যাক্টরির ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্বরূপ দত্তের সঙ্গে তনুকার বিয়ের আমন্ত্রণপত্র যথাসময়ে বিলি হয়ে গেল। আত্মীয়-বন্ধুদের মন থেকে সংবাদপত্রে ছাপা খবরের কালো দাগ মুছে দিতে মেয়ের বিয়েতে ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরি রাজকীয় আয়োজন করেছিল। নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এক হাজারের বেশি। রাত আটটা পনের মিনিট সাতাশ সেকেন্ড গতে বিয়ের লগ্ন। সাড়ে সাতটার মধ্যে বিয়ের আসরে বরকে হাজির করতে সন্ধা সওয়া ছটায় বিনয়মামা আর কান্তমামা রওনা দিয়েছিল। নতুন ব্যুইক গাড়িতে এক পোঁচ পালিশ লাগিয়ে, লাল গোলাপে সেই গাড়ি মুড়ে প্রায় চতুর্দোলার মত সাজানো হয়েছিল। জব্বলপুরের পাত্রপক্ষের মেয়ে-পুরুষ সাতাশ জন অতিথির জন্যে চৌরঙ্গিপাড়ার এক অতিথিশালা চারদিনের জন্যে ডাক্তারদাদু ভাড়া করেছিল। ঘোষচৌধুরি পরিবারের দু'জন, নিজের ছোটভাই আর

মেজশালার ওপর অতিথিদের দেখাশোনার ভার দিয়েছিল পরিমল। অতিথি আপ্যায়নে কোনও খুঁত ছিল না। বিয়েবাড়িতেও আহ্লাদ উপচে পড়ছিল। অতিথিনিবাস থেকে সকালে ঠিক সময়ে গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসেছিল। শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকেও যথাসময়ে হলুদ, মাছ, মিষ্টি গিয়েছিল পাত্রপক্ষের ঠিকানায়। রাত আটটায় অতিথিনিবাস থেকে খালি গাড়ি নিয়ে বিনয়মামা, কান্তমামা ফিরে আসতে বিয়েবাড়িতে একটা শব্দহীন বাজ পড়ল। দুই মামা জানাল, অতিথিনিবাস ফাঁকা। জব্বলপুরের একজন মানুষও সেখানে নেই। বাক্সপেঁটরা গুঁছিয়ে বিকেল পাঁচটায়, সাতাশ জন অতিথি চলে গেছে। যাওয়ার আগে কোনও ঠিকানা রেখে যায়নি। বিকেল চারটের সময় অতিথিনিবাস থেকে ডাক্তারদাদুর দুই প্রতিনিধি, তার ছোট ভাই, মেজশালা, বিয়েবাড়িতে ফিরে এসেছিল। অতিথিনিবাস ছাড়ার আগের মুহূর্তেও তারা কল্পনা করেনি, এমন ঘটবে। জব্বলপুরের সাতাশ জনের কেউ, অতিথিনিবাস ছেড়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে পালানোর ছকটা মুহূর্তের জন্যে তাদের বুঝতে দেয়নি। বর আনতে গাড়ি নিয়ে আরো দু'ঘন্টা পরে বিনয়মামা, কান্তমামা পৌঁচেছিল অতিথিনিবাসে। সে বাড়ি তখন ফাঁকা।

শব্দহীন হাহাকারে বিয়েবাড়ি ভরে গেল। বিবাহমণ্ডপের বেশিরভাগ আলো, নিভিয়ে দেওয়া হল। ছাদনাতলায় নেমে এল অন্ধকার। বিয়ের বেনারসী, গয়না পরে, কপালে চন্দনের মাঙ্গলিক কলকা এঁকে মায়ের সঙ্গে ঠাকুরঘরে দরজা বন্ধ করে বসে হাপুস নয়নে তনুকামাসি কেঁদে চলল। রুগি দেখার চেম্বারে ঢুকে একটার পর একটা ফোন করছিল ডাক্তারদাদু। বাতিল বিবাহবাসরের সব ধকল মাঝরাত পর্যন্ত দয়াময়ী একা সামলেছিল। ডাক্তারদাদুর পরামর্শে অতিথিদের বলেছিল, বর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়, মনে হচ্ছে ব্রাহ্মলগ্নের আগে বিয়ে শুরু হবে না। আপনারা খেয়ে নিন। অতিথিরা কেউ খেয়েছিল। না খেয়ে চলে গিয়েছিল অনেকে। তনুকার সঙ্গে যারা দেখা করতে চাইছিল, তাদের বলেছিল, কুলগুরুর নির্দেশে ঠাকুরঘরে ও জপে বসেছে।

দয়াময়ীর কথাতে কেউ অবিশ্বাস করেনি। রাত বারোটায়, জব্বলপুরবাসী পাত্র, বিশ্বরূপ দত্তকে কেয়াতলা রোডের এক বিবাহবাসর থেকে পুলিস গ্রেপ্তার করল। আধঘণ্টা আগে সেখানে শেষ হয়েছে বিশ্বরূপ দত্তের বিয়ের অনুষ্ঠান। পাত্রীর নাম, অনুশীলা ঘোষ। সদ্যবিবাহিতা বধূর পাশ থেকে প্রতারক বরকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাজতে ঢোকানো হবে কিনা, জানার জন্যে ওপরওলা অফিসারকে ফোন করেছিল থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ওপরওলা তার ওপরওলাকে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিল। ঘটনা গড়িয়েছিল পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত। বাসরঘরে বরকে গ্রেপ্তার করে সেখানেই তাকে জামিন দেওয়ার হুকুম দিয়েছিল পুলিস কমিশনার। সাতদিন পরে বরকে আদালতে হাজির হতে হবে। বিবাহবাসরে বর গ্রেপ্তারের খবর, ঘটনার ছত্রিশ ঘণ্টা পরে সকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে, শহর জুড়ে আর একদফা মুখরোচক আলোচনার ঝড় তুলল। পরীক্ষা কেন্দ্রে তনুকার নকল করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচ বছরের বহিষ্কারের ঘটনাকে পাত্রপক্ষ অছিলা হিসেবে খাড়া করেছিল। তারা জানিয়েছিল, বিয়ের দিন বিকেলে তারা খবরটা পায় এবং কেয়াতলা রোডের এক গরিব বিধবাকে কন্যাদায় থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদের কাছে খবরদাতার তরফে

অনুরোধ আসে। অনুরোধটা তারা এড়াতে পারেনি। অনুশীলার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার প্রস্তুতিতে বিশ্বরূপ দত্তের বিয়ে হয়ে যায়। আদালত মারফত, ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরির কাছ থেকে ছেলের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে পাওয়া হীরের আংটি, বোতাম তারা ফেরত করতে উদ্যোগ নিয়েছে।

বাসরঘরে বর গ্রেপ্তারের খবর সংবাদপত্রে পড়ে বিলেতবাসী এক ডাক্তার, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে এসে ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরির সঙ্গে দেখা করে এবং তনুকাকে বিয়ে করতে চায়। চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই, অকৃতদার, বিদেশবাসী ডাক্তার চন্দ্রভানু সিংহরায়ের প্রস্তাব শুনে ডাক্তারদাদু বর্তে যায়। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার আনন্দে চন্দ্রভানু সম্পর্কে ওপর ওপর খোঁজখবর করে লগ্নভ্রষ্টা মেয়ের স্বামী হিসেবে তাকে মেনে নেয়। বয়স্ক মানুষটা ঘটনার টানাপোড়েনে ভয় পেয়ে, হাওয়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে চেয়েছিল। কলকাতা-ইংল্যান্ড টেলিফোন ব্যবস্থা তখন ছিল না। দ্রুততম খবর লেনদেন হত টেলিগ্রামে। চন্দ্রভানু সম্পর্কে জানতে বিলেতে তিনজনকে ডাক্তারদাদু টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। তিনজনই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঠিয়েছিল জবাবি টেলিগ্রাম। ডাক্তার চন্দ্রভানু সিংহরায়ের খবর জোগাড় করতে একজন দু'হপ্তা সময় চেয়েছিল। দ্বিতীয় টেলিগ্রামপ্রেরক জানিয়েছিল, ইংল্যান্ডের লিভারপুল শহরে চন্দ্রভানু সিং নামে একজন ডাক্তারকে সে চিনলেও, সেই ডাক্তার সম্ভবত পাঞ্জাবি এবং অবশ্যই বিবাহিত। তৃতীয় টেলিগ্রামে জানানো হয়েছিল, যে উল্‌ভারহ্যাম্পটনে চন্দ্রভানু সিংহরায় নামে একজন কৃতী চিকিৎসক থাকে। টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে তার নম্বরে ফোন করে তাকে পাওয়া যায়নি। তাকে চেনে, এমন কাউকে টেলিগ্রামপ্রেরক খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে।

জবাবি টেলিগ্রামের সবগুলো হাতে পাওয়ার আগেই তনুকার সঙ্গে নমো নমো করে চন্দ্রভানুর বিয়ে সেরে ফেলেছিল ডাক্তারদাদু। অচেনা ভয়ে বৃদ্ধ ডাক্তার এত কাবু হয়ে গিয়েছিল যে দেরি করতে সাহস পাচ্ছিল না। বিয়ের তিনদিন পরে নতুন বৌ নিয়ে মধুচন্দ্রিমা করতে চন্দ্রভানু গোপালপুরে গেল। ডাক্তারদাদুর ব্যুইক গাড়ি তাদের পৌঁছে দিল হাওড়া স্টেশনে। মেয়ে-জামাইকে ট্রেনে তুলতে গিয়েছিল সস্ত্রীক ডাক্তারদাদু। গোপালপুরে পাঁচদিন কাটিয়ে শ্বশুরের গাড়িতে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এল চন্দ্রভানু। তিন হপ্তা সেখানে থেকে, দেড় মাসের মধ্যে তনুকাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চন্দ্রভানু সেই যে উধাও হল, তারপর পঁচিশ বছর বেপাত্তা। তার কোনও খোঁজ নেই। তার দেওয়া ইংল্যান্ডের দুটো ঠিকানাতে, কলকাতা থেকে তাকে লেখা কয়েকটা চিঠি 'প্রাপক অমিল' মোহরখচিত হয়ে ফিরে এসেছে। গোপালপুরে মধুচন্দ্রিমাপর্বে তনুকা অন্তঃসত্ত্বা হয়। তার ছেলে পুষ্করের বয়স এখন চব্বিশ। পুষ্করকে নিয়ে মা-বাবার ঠিকানা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও থাকার জায়গা তনুকামাসির জোটেনি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে তাকে বাপের বাড়িতে থাকতে হবে, এ নিয়ে আমার সন্দেহ নেই। ডাক্তারদাদু আর তার স্ত্রী রত্নাবলী, পৃথিবী ছেড়ে অনেকদিন চলে গেছে। চন্দ্রভানুর হদিস পেতে বিনয়মামা বিলেত গিয়ে, গোটা দেশ চষে ফেলেও ভগ্নীপতির খোঁজ পায়নি। অদূর ভবিষ্যতে চন্দ্রভানুকে একদিন ধরে ফেলবে, এই আশায় সেখানে

থেকে যায়। বিয়ে করে। সংসার পাতার পরে দুটো ছেলেমেয়ে হয়। সাত বছর আগে, ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিডল্যান্ড্স এলাকার কোনও এক রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনাতে বিনয়মামা মারা যায়। বিনয়মামার বৌ, ছেলে, মেয়ে কলকাতায় ফেরেনি।

দয়াময়ীর কাছ থেকে তার নতুনকাকা, ডাক্তার পরিমল ঘোষচৌধুরির পরিবারের খুঁটিনাটি খবর পেতাম। দয়াময়ী মারা যাওয়ার আগেরদিন পর্যন্ত যোগাযোগ রেখেছিল তনুকার সঙ্গে। তনুকা মাসিকে আমি শেষ যখন দেখেছিলাম, তখন তার মাথার সব চুল শনের নুড়ির মত সাদা হয়ে গেছে। প্রথমে চিনতে পারিনি তনুকামাসিকে। পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর বয়সে কারও চুল এরকম সাদা হয়ে যেতে দেখিনি। সাতষট্টি বছরের দয়াময়ীর মাথার অর্ধেকের বেশি চুল তখনও কালো ছিল।

দেবুমামার ঘরে কপিকল থেকে ঝুলছিল পুরনো দিনের ঢাকা লাগানো আলো। ঘরের ভেতরটা ঢিমে আলোতে ভাসছে। দেওয়ালে টাঙানো দেবুমামার ছবির দিকে তাকিয়ে দয়াময়ী বলেছিল, বিলিতি এক জোচ্চরের বদলে মেজদার সঙ্গে তনুকার বিয়ে হলে মেয়েটা সুখি হত। স্বামী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করতে পারত। পৃথিবী থেকে অসময়ে মেজদাকে চলে যেতে হত না।

দয়াময়ীর চোখের কোনায় জল চিকচিক করছিল। চুপ করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে দয়াময়ী বলেছিল, জব্বলপুরের বরকে যাতে একা বাড়ি ফিরতে না হয়, সেজন্যে সেই সন্ধেতে তার অন্য জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা মেজদা করে রেখেছিল। দুঃস্থ বিধবা মায়ের বিবাহযোগ্যা সুশ্রী মেয়ে অপেক্ষা করছিল বিয়ের পিঁড়িতে। নতুনকাকার পছন্দের বরের অনুপস্থিতিতে তনুকার বিয়ে যাতে ভেস্তে না যায়, সে আয়োজনও মেজদার করা ছিল। আয়োজনটা এত গোপন, যে কাউকে বলতে পারেনি। সারা সন্ধে নিজের ঘরে একা বসেছিল। কারও জন্য হয়ত অপেক্ষা করছিল। কোনও একটা ডাক শোনার জন্য সময় কাটাচ্ছিল। তাকে কেউ ডাকতে আসেনি।

গলা কিছুটা নামিয়ে দয়াময়ী বলেছিল; মেজদা মারা যাওয়ার পরে তার আলমারি খুলে আনকোরা নতুন একপ্রস্থ ধুতি, পাঞ্জাবি, গরদের জোড় পেয়েছিলাম। প্যাকেটে বাঁধা সেই পোশাকের সঙ্গে দোকানের রসিদ পর্যন্ত সাঁটা ছিল। রসিদের তারিখ থেকে জেনেছিলাম, তনুকার বিয়ের দুদিন আগে কলেজ স্ট্রিটের এক নামী দোকান থেকে সেগুলো কেনা হয়েছিল। মানুষটার বিয়ের পোশাক কেনার কারণ, সে মারা যাওয়ার পরে জানতে পারলাম।

কান্নায় ভিজে উঠতে থাকা গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে দয়াময়ী বলেছিল, মেজদা যে কি সরল ছিল, ভাবা যায় না। বোধহয় বোকা ছিল। মাঝে মাঝে ভাবি, আমিই বোকা। তার মনের খবর কিছুই জানতাম না। অথচ জানা উচিত ছিল।

অঘোরবালা লম্বা একটা শ্বাস ফেলতে দয়াময়ী চুপ করল। আমাকে বলেছিল, রাত ন'টা বাজল। তাড়াতাড়ি বাড়ি যা। নবনীতা ভাববে। তারাঠাকুরপোর শ্রাদ্ধে দেখা হবে। সকাল সকাল চলে আসবি।

পনেরো

মেঘ-বৃষ্টিতে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে থাকলেও আমি বুঝতে পারছি এখন ভরদুপুর। গঙ্গার ধারে ছাতার তলায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বৃষ্টিতে আটকে রয়েছি। বৃষ্টি নামতে, বিকাশের গাড়িতে বাড়ি ফিরতে অসুবিধে হবে না জেনেও থতমত খেয়েছিলাম। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে মাথার ভেতরে মা, বাবা, পুরনো দিনগুলো ঢুকে কীভাবে স্মৃতিময় ধ্যান হয়ে গেল, বুঝতে পারিনি। ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলাম আমি। মা, বাবা, দয়াময়ী আর চন্দ্রনাথ সেন থেকে শুরু করে, তাদের ঘিরে যত আত্মীয়পরিজন জড়ো হয়েছিল, বৃষ্টির মিহি গুঁড়োতে তৈরি ভাস্কর্যের মত তারা আমার চারপাশে ভিড় করেছে। স্মৃতির আখর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারা চাইছে আমার ধ্যান। মা-বাবার সঙ্গে তাদের প্রিয়জনদের আমার ধ্যান নিবেদন করে আমি নিজের অকৃতার্থতা মুছে ফেলতে চাইছি। মা, বাবা, তোমাদের তর্পণ করতে পিতৃপক্ষে কখনও গঙ্গায় আসিনি, ভবিষ্যতে আসতে পারব কিনা, জানি না। আমার অক্ষমতা তোমরা মাপ করে দিও। তোমাদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

আমি জানি, কাউকে ঋণ শোধ করতে দয়াময়ী কখনও তাগাদা দেয়নি। পরিবারের কেউ চন্দ্রনাথের কাছে টাকা কর্জ করলেও ঋণদাতাকে ভুলে যাওয়ার শিক্ষা চন্দ্রনাথ, দয়াময়ী কে দিয়েছিল জানি না, তবে সারাজীবন ওই শিক্ষা তারা মনে রেখেছিল। টাকাপয়সার সঙ্গে আত্মীয়-বন্ধুকে, নানা দরকারে যত সাহায্য করেছে, কিছুই তারা মনে রাখত না। কোনও স্মারক, কারও কাছ থেকে চায়নি। উপকারীকে তারা মনে রাখত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে, দয়াময়ী-চন্দ্রনাথের মত উচ্ছ্বসিত হতে খুব কম মানুষকে দেখেছি। তাদের দাম্পত্যজীবন থেকে শেষ পাঁচ বছর প্রীতি, কৃতজ্ঞতা মুছে গিয়েছিল। কিছুকালের জন্যে তাদের সম্পর্ক, আমি পণ্ড করে দিয়েছিলাম। আমার অপরাধ, চন্দ্রনাথ জানলেও দয়াময়ীকে বলার সুযোগ পাইনি। সুযোগ এলে সাহস হারিয়েছিলাম। পিতৃপক্ষের পৃথিবী ভাসানো বৃষ্টির মধ্যে আমার ধ্যানের নৌকোয় সেই স্বীকারোক্তি তুলে দয়াময়ীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

অঘোরবালার হেঁশেল থেকে তার ননদ, চারুবালা আলাদা হয়ে গেলেও সে জানত, পারিবারিক সম্পর্ককে এই ভাগাভাগি ছুঁতে পারবে না। দুটো সংসারকে আগলে রাখবে দয়াময়ী। ভাইবোনদের সুখ-দুঃখে তাদের পাশে থাকবে। চারুবালার ধারণাতে ভুল ছিল না। দুই পিসতুতো বোন মালা আর শীলার বিয়ে দিতে দয়াময়ী উঠেপড়ে লেগেছিল। দয়াময়ীর বড় মেয়ে বীথিকার চেয়ে তিন বছরের বড়, মালার জন্যে পাত্রের খোঁজ, বীথিকার বিয়ের সময় থেকে দয়াময়ী শুরু করেছিল। দয়াময়ী জানত, পরিবারের মধ্যে বয়সে ছোট কোনও মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তার বয়োজ্যেষ্ঠাটি গভীর সঙ্কটে পড়ে যায়। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও তার মনের ভেতরে জট পাকাতে শুরু করে। সংসারে সে নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবতে থাকে। তার মনে অপরাধবোধ জমে। বীথিকার বিয়ে হয়ে যেতে তার চেয়ে তিন বছরের বড় মাসি, সতের বছরের মালার আত্মবিশ্বাস টলে গিয়েছিল। বয়সের চেয়ে সম্পর্কে বড় হওয়ার ভার ছিল বেশি।

চোদ্দ বছরের বোনঝির বিয়ে হয়ে যেতে সতের বছরের মাসি, মালার মুখ শুকিয়ে গেল। সে অপরাধী ভাবতে শুরু করেছিল নিজেকে। অপরাধী ভাবার আরও একটা কারণ হল, তার বিয়ে না হলে ছোট বোনের জন্যে ছেলে পেতে অসুবিধে হবে। পাঁচ বছরের ছোট, শীলার পথ আটকে সে দাঁড়িয়ে গেলে, তাকে কিছুদিনের মধ্যে শীলা দুষতে শুরু করবে। মুখে কিছু না বললেও হাবভাবে বুঝিয়ে দেবে তার অখুশি।

লেবুতলার বাড়িতে নিজের সংসার সামলানোর সঙ্গে নানা জায়গায় ছড়ানো পরিবারের মেয়েদের উপযুক্ত ছেলে খুঁজে বিয়ে দেওয়াকে সংসারের কাজ হিসেবে দয়াময়ী নিয়েছিল। দয়াময়ীর যোগাযোগে কয়েক ডজন ছেলেমেয়ের শুভপরিণয় ঘটেছিল। তাদের কেউ অসুখী হয়েছে, আমি শুনিনি। মালামাসির জন্যে সতের নম্বর যে পাত্রকে দয়াময়ী জোগাড় করেছিল, তার নাম বিশ্বতোষ দত্ত। বীথিকার স্বামী অরূপের পুরনো বন্ধু বিশ্বতোষ থাকত ব্যারাকপুরের আগের স্টেশন, টিটাগড়ে। দুজনে এক স্কুলে পড়ত। স্কুল শেষ করে কলেজ পার হয়ে অরূপ, এম বি বি এস পাস করে ডাক্তার হলেও বিশ্বতোষের লেখাপড়া কোথায় থেমেছিল, দয়াময়ী জানলেও আমি জানতাম না। জানার বয়স তখনও আমার হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, সে ব্যবসা করত।

বীথিকাকে অরূপ প্রথম দেখতে আসার দিন থেকে তার সঙ্গে বিশ্বতোষ ছিল। তাকে 'বিশু' বলে অরূপ ডাকত। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে তার বিশুদা নামটা চালু হয়ে গেল। বীথিকার স্বামী অরূপের সঙ্গে তার মিলের চেয়ে অমিল বেশি থাকলেও দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। লম্বা, চওড়া স্বাস্থ্য, টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ ছিল অরূপের। বিশুদা ছিল কুচকুচে কালো, লোহার পেরেকের মত রোগা, ঢ্যাঙা। গম্ভীর অরূপের পাশে তার মুখে সবসময়ে একটুকরো হাসি লেগে থাকত। ট্রাউজার্স, শার্ট পরা অরূপের পাশে শরীরে ধুতি, ফুলশার্ট ছাড়া বিশুদাকে দেখা যেত না। ধবধবে সাদা পুরো হাতের শার্টের অর্ধেক গোটানো থাকত। আমাদের পরিবারের অনেকে বলত, সাদা পোশাকের জন্যে বিশুদাকে বেশি কালো দেখায়। ছবি তোলার শখ ছিল বিশুদার। কাঁধে ক্যামেরা না ঝুলিয়ে অরূপের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে কখনও আসেনি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে অনেকবার গেছে। অঘোরবালাকে মাঝখানে বসিয়ে বাড়ির সকলের ছবি তুলেছে। গ্রুপ ফটো তোলার পরে ঝাঁকের ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এসে সেখানে বিশুদাকে রেখে ছবি তুলতে চাইলে, সে রাজি হত না। মুচকি হেসে বলত, আমার ছবি উঠবে না।

কেন?

এত কালো মানুষের ছবি ওঠে না।

অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বিশুদা কথাটা বললেও সকলে হেসে গড়াগড়ি যেত। বিশুদার সঙ্গে মালা মাসির জোড় মেলাতে দয়াময়ী উদ্যোগ নিল। মালামাসি আর বিশুদার সঙ্গে আলাদা করে আগে কথা বলে তাদের মনের খবর দয়াময়ী জেনে নিয়েছিল। অরূপের বন্ধু বিশ্বতোষ যে খারাপ মানুষ নয়, মালা মাসি বলেছিল দয়াময়ীকে। ছিপছিপে শরীর, কাটা কাটা নাক, চোখ, ঠোঁট, মাথাভর্তি ঘন লম্বা চুল, ফর্সা

মালামাসিকে, অনায়াসে সুন্দরী হিসেবে বিশুদা মেনে নিয়েছিল। দুজনের এই অস্পষ্ট মতামতকে প্রজাপতির নির্বন্ধে রূপান্তরের চেষ্টা শুরু করল দয়াময়ী। সংসারের জমিতে ফুল ফোটানোর নিয়মগুলো তার অজানা ছিল না। বীথিকার বিয়ের বছরখানেক পরে মালার জন্যে সংসার রচনায় সে মন দিল। শরতের মাঝামাঝি, সম্ভবত দুর্গাপুজোর কিছু আগে, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ি থেকে এক দুপুরে, বিশুদার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ দেখতে গিয়েছিলাম। আমি ছাড়া আরও দুজন দর্শনার্থী ছিল, তারা হল মালামাসি আর আমার মেজদি বিপাশা। আমার বয়স তখন সাড়ে ছয়, বিপাশা এগার। শরতের আলো জড়ানো সেই স্বপ্নের দুপুরটা, আজও মনে আছে। সাদা পাথরে তৈরি বিশাল সৌধ, সেদিন প্রথম দেখলাম। সবুজ ঘাসে ঢাকা দিগন্তছোঁয়া ময়দান আগে দেখিনি। স্মৃতিসৌধের চৌহদ্দির ঘাস, গাছপালার এমন ঘন শ্যামলিমা দেখার সুযোগও সেই প্রথম হয়েছিল। শহরের মধ্যে এমন দেখার জায়গা আছে জেনে অভিভূত হয়েছিলাম। শিশু বয়সে সব কিছুকে আসল মাপের চেয়ে বড় লাগে। তরুণ, যুবক, মাঝবয়সী, সকলকে পিতৃতুল্য মনে হয়। চারতলা বাড়িকে মনে হয় গগনচুম্বী প্রাসাদ। হালকা রংকে তুলির প্রগাঢ় আঁচড় ভাবতে অসুবিধে হয় না। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ প্রথম দেখার স্মৃতি তাজমহল দর্শনের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। মালামাসির কানের কাছে মুখ নিয়ে মাঝে মাঝে নিচু গলায় বিশুদা কথা বলছিল। মালামাসির শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকা বিপাশা যে চেষ্টা করেও সব কথা শুনতে পাচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছিলাম। আমার তা নিয়ে আক্ষেপ ছিল না। আমি ভাবছিলাম, সকলে এসেছে আমাকে স্মৃতিসৌধ দেখাতে, আমার জন্যে এই মধ্যাহ্নভ্রমণ, আমিই চোখের মণি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে ফিরে স্মৃতিসৌধ দেখার মুগ্ধতা আর হোটেলে কাটলেট খাওয়ার বিবরণ ছাড়া দয়াময়ীকে বিপাশা কিছু শোনাতে পারেনি। আমি তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম, মালামাসির কানের পাশে মুখ নিয়ে বিশুদার গুজগুজ করার বৃত্তান্ত। দয়াময়ীর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, দরকারি খবরটা সে পেয়ে গেছে।

বলায় ভুল হল। দয়াময়ীর মুখ দেখে কিছু বোঝার বয়স তখন আমার হয়নি। বোঝার মত কিছু থাকতে পারে, জানতাম না। বিশুদার মহিমা কীর্তন করার সূত্রে মালামাসির ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে তার কথা বলার প্রসঙ্গ ছুঁয়ে চলে গিয়েছিলাম পার্ক স্ট্রিটে। ট্যাক্সিতে পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছে, সেখানে রেস্টুরেন্টে বিপুল সাইজের ফাউল কাটলেট খেয়ে সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরেছিলাম। রেস্টুরেন্টের জাঁকজমক দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ফাউল কাটলেটের স্বাদ বর্ণনার ভাষা, তখন আমার ছিল না। সে স্বাদ ভোলার নয়। স্বাধীনভাবে পার্ক স্ট্রিটে যাওয়া শুরু করার পরে, রাস্তার একমাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত খুঁজে ছেলেবেলার সেই রেস্টুরেন্টের হদিস পাইনি। একাধিকবার খোঁজ করে ব্যর্থ হয়েছি।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে বিশুদা কয়েকবার যাতায়াত করতে সেখানে সকলে জেনে গিয়েছিল, মালার বিয়ের ফুল ফুটতে দেরি নেই। শ্বশুরবাড়ির দিকে মালা পা বাড়িয়েছে, টের পেয়ে শীলার সাজগোজ বেড়ে গেল। যখন তখন পাউডার মাখতে, চুলে চিরুনি বোলাতে লাগল সে। পনের পেরিয়ে ষোলয় পা দিতে যে মেয়ের

দেরি নেই, দিদির বিয়েতে তার খুশি হওয়ার কথা। তার রাস্তা সাফ হয়ে গেল। রাস্তা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনাতে শীলা খুশি হয়েছিল। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে স্কুল-কলেজে যাওয়ার চল থাকলেও মা-বাবার সংসারে আশ্রিতা চারুবালার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউ ছিল না। চারুবালার সাত ছেলেমেয়ের শিক্ষা নিয়ে জানানোর মত তথ্য, আমার কাছে নেই। তবে কান্তমামা আর শান্তমামার হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। রান্নাঘরের বাইরে দরজার বাঁদিকের, দেওয়ালে সেফ্‌টিপিনে 'খাবো-খাবো করছে' ছড়াটা সম্ভবত মালামাসি খোদাই করেছিল। মালামাসির হাতের লেখা দেখার পরে, সেরকম ধাবণা আমার হয়েছিল। হাতের লেখা শিক্ষার্থীর অনুকরণ করার মত ছিল হরফের ছাঁদ। পেটে কতটা বিদ্যে আছে, না জেনেও তাদের হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। চারুবালার শোয়ার ঘরে দেওয়ালে ঝুলত ফ্রেমে বাঁধানো সুতোয় তৈরি তাজমহলের ছবি। কালো কাপড়ের ওপর, সাদা সুতো দিয়ে মালামাসি বানিয়েছিল। পাথরে খোদাই করা নকশাগুলো ফোটাতে ব্যবহার করেছিল লাল, নীল, সবুজ, খয়েরি সুতো। সেলাই-এর কাজে ওস্তাদ না হলে তাজমহলের এমন প্রতিলিপি করা যায় না। ছবির তলায় সুতো দিয়ে লেখা ছিল দু'লাইন পদ্য।

তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখেছ কি তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরেতে সাজাহান!

ছুঁচ-সুতোয় তৈরি তাজমহল দেখে সকলে মুগ্ধ হত। লাইনদুটো বারবার পড়ে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই আমি আওড়াতাম। বিশুদার সঙ্গে মালামাসির বিয়ের কথা অনেকটা এগিয়ে কেন কেঁচে গেল, জানি না। প্রথমে, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে, তারপর আমাদের লেবুতলার বাড়িতে বিশুদার যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। অরূপের সঙ্গেও তার সম্পর্ক চুকে যাওয়ার কথা, আরও কয়েক বছর পরে জেনেছিলাম। মানুষটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। মালামাসির জন্যে ছেলে খোঁজা থামল না। লেডিস্‌ পার্ক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠ, যোগাযোগের সব জায়গাতে, যোগ্য পাত্রের হদিস করে যেতে থাকল দয়াময়ী। দয়াময়ীর সুবাদে যারা মেয়ে দেখে যেত, তাদের বেশিরভাগ পরে খবর দিত না। খবর যারা দিত, তাদের কথাগুলো ছিল ধোঁয়াটে। পরিষ্কার করে কিছু বলত না। মালামাসির বয়স সতের থেকে বেড়ে কুড়ি, তারপর আরও বেড়ে পঁচিশে গিয়ে ঠেকল। প্রতিটা বছরের শেষে একটা বছর বাড়তে থাকল। মালামাসির সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছিল শীলামাসির বয়স। পঁচিশে মালামাসি পৌঁছে যেতে শীলামাসি একই নিয়মে বাইশে পা দিল। চার বছর আগে থেকে শীলামাসির জন্যেও ছেলে খোঁজা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ডানাকাটা পরী না হলেও শীলামাসিকে খারাপ দেখতে ছিল না। মালামাসির মত গায়ের রঙ ফর্সা না হলেও শীলা মাসির শ্যামবর্ণের গভীরে অন্যরকম শ্রী ছিল। শ্যামলা রঙ থেকে সোনালি আভা বেরত। ভাসাভাসা দু'চোখে সবসময়ে খুশি মিশে থাকত। পরিবারে সকলের ছোট হওয়ার জন্যে বাড়তি আদরযত্ন পেয়ে, শীলামাসি খানিকটা খামখেয়ালি হয়ে উঠেছিল। পরিবারের লোক জানত শীলার বরের অভাব হবে না। বর পেতেও অসুবিধে হবে না। প্রথমদিকে মালাকে যারা দেখতে আসত, তাদের চোখের আড়ালে শীলাকে রাখা

হত। মালাকে দেখতে এসে শীলাকে বরপক্ষ পছন্দ করে বসলে ঝামেলা বেঁধে যাবে। মালার বিয়ে হবে না। বড় মেয়ের বদলে ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে বড়র মন ভেঙে যাবে। নিজেকে সংসারের বোঝা ভাবতে শুরু করবে সে। ছোটকে লুকিয়ে রাখার কৌশল বেশিদিন খাটল না। তেইশ বছরের মালাকে দেখে, তার পাঁচ বছরের ছোট এক বোন আছে জেনে, সাড়ে আঠারোর বছরের শীলাকে একবার চোখের দেখা পাত্রপক্ষ দেখতে চেয়েছিল। এরকম অনুরোধ ফেলা যায় না। আটপৌরে শাড়িতে শীলা এসে দাঁড়াতে হবু কুটুমরা তার রূপের তারিফ করেছিল। বিয়ের বাজারে সেই প্রথম নিজেকে যাচাই করে আহ্লাদে শীলা আটখানা হয়েছিল। একজনের বদলে জোড়া মেয়ে দেখে পাত্রপক্ষ ফিরে গেল। পনের দিন পেরিয়ে গেলেও তারা কোনও খবর করল না। মালার বদলে তারা শীলাকে নির্বাচন করলেও চারুবালা অরাজি হত না। সেজপিসিকে দয়াময়ী তেমন পরামর্শই দিয়েছিল। ছেলেপক্ষের সাড়া না পেয়ে চারুবালা দমে গিয়েছিল। দয়াময়ীও ভয় পেয়েছিল। গোলমালটা কোথায় ঘটছে, আঁচ করলেও সেজ পিসিকে বলল না। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে নিজের ধারণাটা বাজিয়ে দেখতে চাইল। মালার হিল্লে না হলেও তাকে দেখতে আসার সময়ে লুকিয়ে থাকার ফরমান বাতিল হতে শীলা খুশি হল। সেজদির বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করে তার বয়স বেড়ে যাচ্ছিল। ভয় পাচ্ছিল সে। অধৈর্য হচ্ছিল। দুই বোন মাঝে মাঝে তুমুল ঝগড়া ক'রে, তারপর একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত। দয়াময়ী গিয়ে তাদের শান্ত করত। চারুবালার প্রথম দু'সন্তান, দু'মেয়ের আঠার বছর আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দু'মেয়ের পরে চারুবালার দুই ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর পৃথিবীতে আসে মালা শান্ত আর শীলা। আজকের কথা নয় সে সব। বিয়ে করার বয়সে চারুবালার বড়ো দু' ছেলে তখন পৌঁছে গেলেও, তা নিয়ে চারুবালা একটা কথা বলত না। বলার উপায় তার ছিল না। ছেলেদের সংসার চালানোর সামর্থ্য না থাকলে তাদের বিয়ের কথা সে বলে কী করে? বেকার ছেলেকে কোন মেয়ের বাবা জামাই করবে? সংসার প্রতিপালনের মত রোজগার, চারুবালার কোনও ছেলে তখন করত না। তার মধ্যে মেজছেলে সুপান্থ, ডাকনাম পান্থ, ভুবনেশ্বরে কেরানির চাকরি জোগাড় করে চলে যেতে চারুবালার সংসারের সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল। পান্থ, চাকরি পেলেও তার বিয়ে দিয়ে সংসারে নতুন ভাগীদার আনার বিরোধী ছিল চারুবালা। বড় ছেলে শ্রীকান্ত আর ছোট ছেলে সুশান্ত, ডাকনাম, কান্ত আর শান্ত, চাকরি না করলেও খুচরো কাজ করে যা রোজগার করত, সংসারে চাহিদার তুলনায় তা ছিল নস্যি। তবু কিছু টাকা, তারা সুযোগ পেলে চারুবালাকে দিত। নিজের চেষ্টায় কান্ত শিখেছিল ঘড়ি মেরামত করার কাজ। দেওয়াল-ঘড়ি, হাতঘড়ি, দুটোই সারাতে পারত। চেনাজানাদের হাতঘড়ি বিগড়ে গেলে এক-দুদিন নিজের কাছে রেখে চালু করে দিত। সকলে না দিলেও দু-চারজন মানুষ তাকে এক-দু টাকা পারিশ্রমিক দিত। মধ্য আর উত্তর কলকাতার কিছু বনেদি বাড়ির দেওয়াল ঘড়ি দেখভাল করার দায়িত্ব জোগাড় করেছিল সে। সাবেক আমলের দেওয়াল ঘড়িতে হপ্তায় একদিন দম দিত। দরকার মত তেল ঢালত, নতুন যন্ত্রাংশ লাগাত। বছরে কেউ দশ, কেউ পনের টাকা দিত। পারিশ্রমিক দিতে দু-একজন ভুলে গেলেও টাকার কথা

কান্ত বলতে পারত না। শৌখিন কাজ করতে চারুবালার সবচেয়ে ছোট ছেলে শান্ত ভালবাসত। তার হাতের কাজ ছিল উঁচুমানের। বিশ্বকর্মা পুজোর দু'মাস আগে থেকে, ঘুড়ি ওড়ানোর মরসুম শুরু হলে সে বাড়িতে বসে ঘুড়ি বানাত। ঘুড়ি তৈরিতে তাকে পাল্লা দেওয়ার মতো কারিগর সে তল্লাটে ছিল না। উত্তর কলকাতার সে ছিল সেরা ঘুড়িকারিগর। তার তৈরি কড়িটানা আধতেল, একতেল, দু'তেল ঘুড়ি কিনতে ছেলেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেত। ছেলের বাবারাও ঘুড়ি কিনতে আসত। গোলদীঘি থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত তার ঘুড়ির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘুড়ির মরসুম শেষ হওয়ার আগে সে কাগজের ফানুস বানাতে শুরু করত। উত্তর কলকাতার আকাশে পুজোর পর থেকে কালীপুজো, দেওয়ালি পর্যন্ত রোজ বিকেলে প্রচুর ফানুস উড়ত। ফানুস তৈরিতে শান্তর হাত ছিল চমৎকার। আকাশে উড়ে বেড়ানো তার তৈরি কাগজের হাতি, ঘোড়া, ঘড়ি, পদ্মফুল, গাড়ি, গদা, এলাকার মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখত। এক নজর দেখে বলে দিত, শান্ত ভঞ্জের ফানুস।

ঘুড়ি-ফানুস বানিয়ে, বিয়ে করে সংসার পাতার চিন্তা অতিবড় গবেটও করে না। শান্ত করত না। ঘুড়ি, ফানুসের মরসুম শেষ হলে, পাড়ার এক চেনা হোসিয়ারি থেকে শীতে পরার তুলোর গেঞ্জি এবং বিবিধ অন্তর্বাসের বান্ডিল এনে চেনাজানাদের বিক্রি করত। ঘোষচৌধুরি পরিবারের দৌহিত্রের পক্ষে কাজটা মানানসই নয়, টের পেয়ে একটু আড়াল রেখে করত। স্বল্পস্থায়ী, ছোটমাপের লেনদেনে দুই ভায়ের হাত খরচ চলে গেলেও তাকে পেশা বলা যায় না। পিসতুতো দু'ভাইকে ভদ্রগোছের দুটো চাকরিতে ঢোকাতে দয়াময়ীর চেষ্টার শেষ ছিল না। চাকরির জন্যে কতজনকে তদ্বির করেছে, তার হিসেব নেই। দয়াময়ীকে মুখে কেউ হতাশ না করলেও কথা রাখেনি। কান্ত অথবা শান্ত, কারও চাকরি হয়নি। কান্তকে ঘড়ি মেরামতের দোকান করে দিতে চেয়েছিল দয়াময়ী। শান্তকে ছেলের মতো ভালবাসত। শান্তর কথা উঠলে তার প্রশংসায় দয়াময়ী পঞ্চমুখ হত। শান্তকে ব্যবসা করার জন্যে সাধ্যের বাইরে গিয়ে মূলধন দিতে রাজি ছিল। দেবু বোস শুনে, ঠেকাতে চাইত দয়াময়ীকে। বলত, কষ্ট করে জমানো তোর টাকা জলে যাবে। ওদের দিয়ে ব্যবসা হবে না। কুঁড়ের ডিম ওরা। ঘরজামাইয়ের ছেলে। খেটে খাওয়া ওদের রক্তে নেই।

দেবু বোসকে প্রায় ধমক দিয়ে দয়াময়ী থামাত। অঘোরবালার সংসারে এক হাঁড়িতে থাকার সময়েও তার ননদের তিন ছেলেকে অপদার্থ ভাবত দেবু বোস। তাকে মুখে মেজদা বললেও চারুবালার ছেলেমেয়েরা অপছন্দ করত। তারা ভাবত, তাদের দাদামশাই-এর বাড়ির একটা ঘর দেবু বোস বেদখল করে আছে। তাদের দাদামশাই-এর বাড়ি যে দেবু বোসের মাসির-ও বাড়ি, এ কথা তার ভুলে যেত। না ভুললেও মনে রাখতে চাইত না। তাদের ধারণা হয়েছিল, ভবিষ্যতে বাড়ির মালিকানা তাদের হাতে এলে দেবু বোসকে হটানো মুশকিল হবে। দয়াময়ীর ঠাকুর্দা, অঘোরবালার শ্বশুর, বিরজাকান্ত ঘোষচৌধুরির উইলে বড়ো পুত্রবধূ অঘোরবালাকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল। আটঘাট বেঁধে বিরজাকান্ত উইল তৈরি করেছিল। উইল অনুযায়ী, তার সম্পত্তিতে আমৃত্যু অঘোরবালার অধিকার বজায় রাখা হয়েছিল। বিধবা দুই পুত্রবধূর

ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদের জন্যে মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিল বিরজাকান্ত। তার কেনা, কোম্পানির কাগজ, জমানো টাকার সুদ থেকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাবে দুই পুত্রবধূ। মেজ বউ-এর টাকাও ব্যাঙ্কে বড় বউ অঘোরবালার নামে জমা পড়বে। বড় বউ-এর হাত দিয়ে টাকা মেজ বউ-এর কাছে যাবে। চারুবালার সংসার চালাতে উইলে কোনও বরাদ্দ টাকা ছিল না। অঘোরবালার মৃত্যুর পরে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ি, চারুবালার ছেলেরা এবং তার কোনও মেয়ে বাড়িতে থাকলে, সে পাবে। অবিবাহিত দুই দৌহিত্রী নীলা, মুক্তার বিয়ের সব জোগাড় রেখে গেলেও তাঁদের মধ্যে কারও বিধবা হয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে বিরজাকান্ত উড়িয়ে দেয়নি। বিরজাকান্তর উইল তৈরি করেছিল, অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা। উইলের অন্যতম অছিও ছিল সে। তার অফিসে চাকরি করার সুবাদে দেবু বোস ছিল গণেশচন্দ্রের আপ্তসহায়ক। সে পাশে না থাকলে সাতাত্তর বছরের গণেশচন্দ্র চোখে অন্ধকার দেখত। লতায়পাতায় গণেশচন্দ্রের সঙ্গে আত্মীয়তা থাকায় তার সংসারেও দেবু বোসকে ঢুকতে হয়েছিল। হপ্তায় দু'দিন গণেশচন্দ্রের ভবানীপুরের বাড়িতে সে না গেলে সেখানে হাঁড়ি-হেঁশেল বন্ধ হওয়ার উপক্রম ঘটত। গণেশচন্দ্রের স্ত্রী রাধারানীর সংসার অচল হয়ে যেত। গৃহদেবতার নিত্যপুজোর ফুল-ফলের জোগানদার পর্যন্ত, রাধারানীর বিবরণ অনুযায়ী, তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করত। জগুবাবুর বাজারের দুই দোকানিকে রাধারানীর ফুল-ফল জোগানোর কাজে লাগিয়ে দিয়েও দেবু বোস রেহাই পায়নি। বিরজাকান্তের উইল কার্যকর করার দায়িত্ব গণেশচন্দ্র দিয়েছিল দেবু বোসকে। নিখুঁতভাবে সে কাজ দেবু বোস করে গেছে। খুঁত কিছু ঘটলেও ইচ্ছে করে দেবু বোস তা ঘটাত। মাসি, অঘোরবালার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে, এটুকু তাকে করতে হত। অঘোরবালার স্বার্থে দরকার হলে বিরজাকান্তর উইল জাল করতে তার বুক কাঁপত না।

বিরজাকান্তর উইলের ভেতরের খবর দয়াময়ী জানত। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ির ঈশান কোণে অশান্তির মেঘও সে দেখতে পেয়েছিল। পিসতুতো তিন ভাইয়ের সঙ্গে দেবু বোসের সম্পর্ক যে শেষ হতে চলেছে, তার নজর এড়ায়নি। ভাইদের কিছু না বললেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মালা, শীলাকে যোগ্য ছেলে খুঁজে বিয়ে দিতে চাইছিল। কান্ত, শান্তকে পাকা চাকরিতে ঢোকাতে ঘুষ পর্যন্ত দিতে রাজি ছিল। মাঝে মাঝে বলত, আমি পুরুষ হলে এসব ব্যবস্থা তুড়ি বাজিয়ে করে ফেলতাম! শান্তকে সংসারী করতে না পারলে আমি মরে শান্তি পাবো না।

ব্যবহারিক পৃথিবীতে দাপিয়ে কাজ করার মত স্বাধীনতা, এখানকার সমাজ, মেয়েদের যে দেয়নি, দয়াময়ী অনুভব করত। এ নিয়ে তার আক্ষেপ ছিল। মালা, শীলার বর খুঁজতে তবু তার ঘোরাঘুরির শেষ ছিল না। মালার বয়স চব্বিশ আর শীলার হতে, চারুবালার সঙ্গে কথা বলে, মেয়ে দেখানোর পদ্ধতিতে দয়াময়ী কিছু রদবদল ঘটাল। মালাকে দেখানোর পরে, ছেলেপক্ষের চাহিদা আঁচ করে, আটপৌরে পোশাকে শীলাকেও অনুষ্ঠানে পৌঁছে দিতে থাকল। কষ্টে বুক ফাটলেও দয়াময়ীর কিছু করার ছিল না। মালার মুখে অপমানের জ্বালা কখনও-সখনও ফুটে উঠত। দয়াময়ীকে

একদিন বলেছিল, দিদিমণি, আমাকে রেহাই দাও। আর পারছি না। তোমরা শীলার বিয়ের চেষ্টা কর।

চোখের জল সামলে দয়াময়ী বলেছিল, তা কি হয়? বড় মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ছোট মেয়ের জন্যে মা-বাবা কি ছেলে খুঁজতে পারে? আত্মীয়স্বজন কী বলবে? পাত্রপক্ষ জানতে পারলে, তারাও কৈফিয়ত চাইবে।

কেন চাইবে?

চাইতে পারে। ভাবতে পারে, পরিবারে এমন কোনও ঘটনা আছে, যা ঢাকতে বড়র আগে ছোটর বিয়ে দিচ্ছে। মানুষের ভাবনাকে তো লাগাম পরানো যায় না।

মালার মুখে কথা জোগায়নি। দয়াময়ী টের পাচ্ছিল, কুড়ি বছর আগে, চারুবালার বড় দুই মেয়ের যত সহজে বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, তাদের চেয়ে সতের-আঠার বছরের ছোট, মেয়ে দুটোকে এত সহজে পাত্রস্থ করা যাবে না। চারুবালার বড় দু' মেয়ে নীলা, মুক্তাকে তাদের বাবা উপেন ভঞ্জ, যখন, দাঁড়িয়ে থেকে সম্প্রদান করেছিল। সবচেয়ে ছোট দু'মেয়ে মালা আর শীলার বয়স তখন চার আর এক। চারুবালার সন্তান ধারণের ইতহাসও অদ্ভুত। প্রথম দুই মেয়ে, নীলা-মুক্তার পরে লাইন দিয়ে জন্মেছিল দুই ছেলে, কান্ত, পান্থ। তারপর চার বছরের বিরতি দিয়ে তিন বছরের ব্যবধানে জন্মাল মালা আর শান্ত, দু'বছরে ভূমিষ্ঠ হলো শীলা। চারুবালার দুই মেয়ে আর দু'ছেলে পৃথিবীতে আসার পরে বিরজাকান্ত ভেবেছিল, ঘরজামাই উপেন এবার সন্তান উৎপাদনে বিরতি দেবে। সন্তানধারণ থেকে অব্যাহতি পাবে চারুবালা। সবদিক ভেবে দুই দৌহিত্রী নীলা-মুক্তার বিয়ের টাকা আলাদা করে বাঙ্কে বিরজাকান্ত রেখে গিয়েছিল। অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র আর দেবু বোস, এসব খবর জানত। বিরজাকান্ত জানত না যে চারুবালা আরও তিনবার গর্ভধারণ করবে এবং একটা ছেলে, দুটো মেয়ের জন্ম দেবে। অজাত দুই দৌহিত্রীর বিয়ের টাকা বিরজাকান্ত রেখে না যাওয়ায় তার অদূরদর্শিতার সমালোচনা করত চারুবালা। বিয়ের জন্যে প্রথমে মালাকে পরে শীলাকে, তারপর দুজনকে একসঙ্গে ছেলেপক্ষ দেখতে এলে, তাদের সামনেই কাছে এ নিয়ে চারুবালা দুঃখ করত। মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার মত টাকার জোর না থাকলেও ছেলেপক্ষের সহৃদয়তার ওপর নির্ভর করে পাত্রী দেখাচ্ছে, তাদের বলে দিত। মেয়ে দেখার প্রথমদিনে তার মায়ের কাঁদুনি শুনে পাত্রপক্ষ বিগড়ে যেত। দু-চারদিনের মধ্যে খবর দেওয়ার কথা বলে গেলেও তারা আর যোগাযোগ করত না। গৃহকর্মনিপুণা, সুশ্রী, নরম স্বভাব মালার বিয়ের জন্যে ছেলে না জোটার কারণ বুঝতে দয়াময়ীর সময় লেগছিল। তখন তার করার কিছু ছিল না। চারুবালার বৃত্তান্ত মুখে মুখে রটে গিয়েছিল। মালা-শীলার আইবুড়ো থেকে যাওয়ার কারণ ছিল একাধিক। ঘরজামাই থাকতে উপেন ভঞ্জর অসুবিধে না হলেও, সে ঘটনা তাদের ছেলেমেয়েদের জীবনে ছায়া ফেলেছিল। ছায়াটা যে অশুভ দয়াময়ীর সন্দেহ ছিল না। ঘরজামাইয়ের মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে সহজ নয়, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। মালা-শীলাকে পাত্রস্থ না করে পৃথিবী ছেড়ে উপেন চলে গিয়ে বড় ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছিল। সমস্যা জটিলতর করেছিল। একে ঘরজামাই, তার ওপর সে মৃত হলে, তার ছেলেমেয়েদের পিতৃপরিচয়

নিয়ে কানাঘুষোর শেষ থাকে না। মালা-শীলাকে বিয়ের জন্যে হাজির করার পরে তাই ঘটেছিল। প্রয়াত উপেন ভঞ্জর তিনপুরুষের পিতৃপরিচয় জানতে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, সেই খুঁতখুঁতে বাঙালি প্রশ্নকর্তাকে জবাব শুনিয়ে খুশি করার সাধ্য চারুবালার ছিল না।

সাতাশ পেরিয়ে আটাশে পা দিয়ে গলায় ফাঁস বেঁধে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে অল্পের জন্যে মালা বেঁচে যায়। শীলা বাঁচিয়েছিল তার সেজদিকে। দরজা ভেজানো ঘরে ঢুকে ফ্যানে শাড়ি বেঁধে মালাকে গলায় ফাঁস লাগাতে দেখে চেয়ারে দাঁড়ানো সেজদিকে শীলা জাপ্টে ধরে। পায়ের তলা থেকে চেয়ারটা তখন লাথি মেরে মালা সরাতে চেষ্টা করছিল। সে চেষ্টা সফল হল না। মালা বেঁচে গেল। শীলা ভয় পেলেও হইচই করে লোক জড়ো করেনি। ছায়ার মত কতোদিন মালার পাশে থেকে তাকে আগলে রেখেছিল। এক হপ্তা পরে চারুবালাকে ঘটনাটা জানিয়েছিল। আরও পনের দিন পরে দয়াময়ীকে সে ঘটনা চারুবালা বলেছিল। ঘটনার ধার তখন মরে গেলেও দুশ্চিন্তায় দয়াময়ীর কপালে ভাঁজ পড়েছিল। মাসখানেক পরে তিনদিনের জ্বরে চারুবালা মারা গেল। কাউকে ভোগায়নি। তার বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর। সংসারের কাউকে না ভুগিয়ে পৃথিবী থেকে চারুবালার চলে যাওয়াকে আত্মীয়স্বজন 'স্বর্গারোহণ' বলার চেষ্টা করলেও তার ছেলেমেয়েরা চুপ করে ছিল। আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হলে মালা শুকিয়ে যেতে থাকল। খিটখিটে হল তার মেজাজ। তার সঙ্গে ঝগড়া করে এক দুপুরে বাড়ি ছেড়ে শীলা চলে গেল। আটাশ বছরের বোনকে খোঁজুখুঁজি করতে কান্ত-শান্তর জুতো ক্ষয়ে যাওয়া শুকতলা আরও ক্ষয়ে গেলেও আটচল্লিশ ঘণ্টায় তার হদিস পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিনে খবর এল সে রয়েছে দক্ষিণেশ্বরে দয়াময়ীর ছোট বোন সৌদামিনীর ননদের বাড়িতে। ননদের বাড়ি থেকে শীলাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দয়াময়ীর কাছে সৌদামিনী চিরকুট লিখে পাঠিয়েছিল। কান্তর সঙ্গে বড় ছেলে, অরিন্দমকে পাঠিয়ে মালাকে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল দয়াময়ী।

আমার চোখের সামনে তিন মামা, দু'মাসির বয়স বেড়ে যাচ্ছিল। আমার বয়সও থেমে ছিল না। স্কুল শেষ করে কলেজে গেলাম। কলেজ থেকে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিজের উচ্চতা অনেকবার খাটো করেও মালা-শীলার বিয়ের ব্যবস্থা দয়াময়ী করতে পারল না। বিয়ের জল না পেয়ে ত্রিশ পেরতেই মালার শরীর কাঠির মত রসকষহীন হয়ে গেল। মাথার চুলে পাক ধরল। শীলাকেও ছেড়ে যাচ্ছিল বিয়ের বয়স। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের তিন বাড়িতে যে গতিতে লোকসংখ্যা কমছিল, সেভাবে নতুন মানুষ আসছিল না। অঘোরবালার সংসারে নতুন মানুষ আসার সম্ভাবনা না থাকলেও অন্য দু'বাড়িতে কয়েক বছর নবজাত শিশুর কান্না শোনা যায়নি। চারুবালার আগে ডাক্তারদাদু পরিমল মজুমদার আর তার ছেলে বিনয়, পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছিল। ইংল্যান্ডে গাড়ি দুর্ঘটনায় বিনয় মারা যায়। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের ঘোষচৌধুরি পরিবারে আরও কয়েকজন পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছিল। তারা সকলে পুরুষ। অকালমৃত পুরুষ ছিল কয়েকজন। অঘোরবালার বাড়ির মত পুত্রসন্তানহীন বিধবার সংখ্যা তিন বাড়িতে বাড়ছিল।

মির্জাপুর স্ট্রিটে ষাঁড়ের গুঁতোতে রাস্তায় পড়ে গিয়ে অঘোরবালা যখন ভাঙা হাতে প্লাস্টার বেঁধে লেবুতলায় আমাদের বাড়িতে ছিল, তখন তার বাড়িতে অন্য নাটক শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেবু বোসকে বাড়ি থেকে তাড়াতে কান্ত-শান্ত আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছিল। ভুবনেশ্বর থেকে পাল্টুও হয়ত শলাপরামর্শ দিচ্ছিল। অঘোরবালার বাড়ির একতলায় দক্ষিণ খোলা বড় যে ঘরটায় দেবু বোস থাকত, সেই ঘরের লাগোয়া পশ্চিমে ছিল লাল সিমেন্টের চওড়া বোয়াক, রোয়াকের পেছনে বৈঠকখানা, পাশে খাবার ঘর, ছোট কলঘর, সব মিলে বাড়ির এদিকটা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। মূল বাড়ি থেকে এ দিকটা অনায়াসে আলাদা করে নিয়ে। সংসারে খরচের ঘাটতি মেটাতে কান্ত শান্ত ভাড়াটে বসাতে পারত। তাই চেয়েছিল শান্ত-কান্ত। মনের ইচ্ছেটা অঘোরবালাকে জানাতে তারা ভরসা পায়নি। দয়াময়ীকে বলার সাহস তাদের ছিল না। দেবু বোসকে তার অফিসে যাওয়ার সময়ে, রাস্তায় ধরে কথাটা শান্ত বলেছিল। শান্তর সঙ্গে তার বয়সী কয়েকজন ছেলে থাকলেও, সকলে দেবু বোসের সামনে আসেনি। রাস্তার নানা দিকে তারা ছড়িয়ে ছিল। তাদের বাবা-কাকারা ছিল দেবু বোসের সমবয়সী। তাকে চিনত, সমীহ করে কথা বলত তার সঙ্গে। শান্তর মুখে ঘর ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব শুনে দেবু বোস হকচকিয়ে গেলেও শান্ত গলায় বলেছিল, অফিস থেকে বাড়ি ফিরে কথা বলব। কান্তকেও থাকতে বলিস।

তারপর কী ঘটেছিল, পরিষ্কার জানি না। দয়াময়ীর কাছে যা শুনেছি তা এরকম। অফিস থেকে ফিরে কান্ত-শান্তর সঙ্গে কথা বলার জন্যে তাদের খোঁজ করে দেবু বোস পায়নি। হোটেল থেকে কিনে আনা রুটি-তরকারি খেয়ে, হাফ-ডাইরিতে দিনের হিসেব লিখে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত জেগে থেকেও দু'ভাইয়ের একজনও বাড়ি ফেরেনি জেনে, প্রতিদিনের মত ঘরের দুটো কপাট ভাল করে এঁটে শুয়ে পড়েছিল। ন'টার বদলে আধ ঘণ্টা দেরিতে শুলেও ঘুমের অসুবিধে হয়নি। পাঁচ মিনিটে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার আগে অঘোরবালার অনুপস্থিতিকে ছেলে দুটো বোকার মত কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে ভেবে মন খারাপ হয়েছিল। পরের দিন সকালে কান্তর সঙ্গে কথা বলে তার মুখ থেকেও দেবু বোস একই কথা শুনল। সাত দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিল কান্ত। লিখিত নোটিস নয়, মুখে নির্দেশ দিল। দুই অপোগণ্ডের কাণ্ড দেখে আদালত চষে বেড়ানো দেবু বোস মুচকি হাসল। ছ'মাস আগে, আদালতের কাগজে দলিল করে বিরজাকান্তর উইল কার্যকর করার আইনি ক্ষমতা তার হাতে অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র যে তুলে দিয়েছে, দুটো পরান্নভোজী, তা জানার কথা না। জানার দরকার তাদের ছিল না। গোলমালের মুখোমুখি হতে নিজের মনকে দেবু বোস তৈরি করল। অফিস থেকে সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরে দেখল, তার বন্ধ ঘরের দরজায়, তার তালার ওপরে অচেনা ভারি একটা তালা ঝুলছে। বৈঠকখানার দরজা, পশ্চিমের রোয়াকের দিকে তার ঘরের দ্বিতীয় দরজাতেও তালা পড়েছে। দেবু বোস অবাক হল না। চাবি আনতে দোতলায় কান্তর কাছে গেল। দোতলার পূবের ঘরে পাশাপাশি দুটো একানে খাটে কান্ত-শান্ত শোয়। বড় ঘর। দুটো থাকলেও ঘরে প্রচুর ফাঁকা জায়গা রয়েছে। কান্ত-শান্তকে ঘরে না পেয়ে মালা-শীলার ঘরে গেল। দুই বোন যখন ঘরে নেই, তখন নিশ্চয় ছাতে

তাদের দেখা মিলবে। দেবু বোস ছাতে গেল। ছাতে পেল দুজনকে। মালাকে কান্তর খবর জিজ্ঞেস করে জানলে, বিকেলে সে বেরিয়েছে। শান্ত বেরিয়েছে আরও আগে, মাঝদুপুরে। দু'বোনের মুখ দেখে, তার ঘরে তালা লাগানোর ঘটনা তারা জানে বলে মনে হল না। ভারি নিরীহ তাদের মুখ। দুজনের চোখের সামনে যে তার ঘরে তালা পড়েছে, দেবু বোসের অনুমান করতে অসুবিধে হল না। মালার কাছে সে চাবি চাইল। মালা বুঝতে পারল না, কোন চাবি মেজদা চাইছে। দেবু বোস বুঝে গেল, চাবি পাওয়া যাবে না। থানায় এজাহার লিখিয়ে তালা ভেঙে অনায়াসে ঘরে ঢোকা যায়। বাড়ির মধ্যে আইনি কোঁদল সে আনতে চাইল না।

রাত আটটা নাগাদ আমাদের বাড়িতে দেবু বোস আসতে প্রথমে দয়াময়ী, তারপর আমরা, ভাইবোনরা ঘটনাটা জানতে পারলাম। ভাঙা হাত নিয়ে কাঁদতে শুরু করল অঘোরবালা। তারপর হঠাৎ রেগে উঠে বলল, এটা কি মগেরমুলুক? ওরা যা খুশি তাই করবে? আমি এখনই বাড়িতে যাব। মজা দেখাচ্ছি ওদের।

তেড়েফুঁড়ে ওঠা বুড়ি অঘোরবালাকে মুচকি হেসে দেবু বোস বলল, মাসিমা সামন্তের মিষ্টির দোকান থেকে রাবড়ি এনেছি আপনার জন্যে। রাতে রুটির সঙ্গে খাবেন।

রাবড়ির নাম শুনে চকচক করে উঠল অঘোরবালার চোখ। বলল, তাহলে খাওয়াদাওয়া সেরেই যাব। আমার প্লাস্টারের মধ্যে লাল পিঁপড়ে বাসা করেছে। ভীষণ জ্বালাচ্ছে।

মাসিকে ঠাণ্ডা করতে দেবু বোস বলল, ডাক্তারকে বলে কালই ওষুধ নিয়ে আসব।

কাজের কথাটা শোনার জন্যে দয়াময়ী অপেক্ষা করছে টের পেয়ে তাকে দেবু বোস বলল, তোকে একবার ওখানে যেতে হবে। তুই গিয়ে দাঁড়ালে ওরা গুটিয়ে যাবে।

দয়াময়ী বলেছিল, জানি।

দশ মিনিটের মধ্যে দেবু বোসের সঙ্গে রিকশা চেপে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের দিকে দয়াময়ী রওনা হয়েছিল। অঘোরবালা যেতে চাইলে তাকে থামিয়েছিল দয়াময়ী। চন্দ্রনাথ রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে দুজনকে রিকশায় তুলে দিয়ে বলেছিল, বাড়িতে আমি আছি। দরকার হলে খবর পাঠিও।

এক সেকেন্ড না ভেবে দয়াময়ী বলেছিল, দরকার হবে না। দয়াময়ী ভুল বলেনি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে লেবুতলার বাড়িতে রাত এগারটায় রিকশা চেপে দয়াময়ী যখন ফিরল, তার পাশে বসেছিল কান্ত। দয়াময়ীকে পৌঁছতে এসেছিল সে অঘোরবালা তখনও জেগে রয়েছে। তাকে প্রণাম করে কান্ত বলেছিল, মামিমা, ভুল করে ফেলেছিলাম। আর হবে না।

কান্তর গলা জড়িয়ে ধরে অঘোরবালা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল কান্তর মুখ। তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করতে চাইছিল অঘোরবালা। তারপর মাত্র দেড় বছর, মারা যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে মাসির বাড়িতে দেবু বোস ছিল। নতুন কোনও ঝামেলা হয়নি। অঘোরবালার ছেলের মত সসম্মানে সেখানে থেকেছে।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে সেই রাতে গিয়ে দয়াময়ী কীভাবে পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল, তার পুরো বিবরণ আমার জানা নেই। দয়াময়ী কখনও বলেনি। নিজের সম্পর্কে সবচেয়ে কম বলত দয়াময়ী। নানা সময়ে তার মুখ থেকে শোনা টুকরো ঘটনা জুড়ে সে রাতের পারিবারিক মিলনসভার একটা আস্ত ছবি সাজিয়ে নিয়েছিলাম। দেবু বোসকে একতলায় খাবার ঘরে রেখে চারুবালার চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে দোতলার ঘরে কপাট এঁটে দয়াময়ী বসেছিল। দেড় ঘণ্টা পরে ঘরের দরজা খুলতে দেখা গেল চার ভাইবোন কাঁদছে। চোখে জল নিয়ে একতলায় দেবু বোসের ঘর খুলে দিয়েছিল কান্ত। তার ভাইবোনেরাও নিচে নেমে এসেছিল। দেবু বোসের কাছে মাপ চাইতে গিয়ে ভেউ ভেউ করে শান্ত কেঁদেছিল। চোখের জলে ভিজে যাচ্ছিল মালা, শীলার বুক।

নানা সমস্যায় পিতৃকূলের সংসারকে দয়াময়ী জোড়া—লাগাতে পারলেও নিজের সংসার অভগ্ন রাখতে পারল না। তার সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। বাইরে থেকে সেই ভাঙনের কারণ যারা খুঁজে বার করতে চেয়েছিল, তারা পারেনি। পরিবারে কেউ কি পেরেছিল? না, কেউ-ই পারেনি। আমাকে বাদ দিয়ে দয়াময়ীর পাঁচ ছেলেমেয়েই মায়ের আত্মবিধ্বংসী চালচলনের কারণ বুঝতে পারেনি। তারা দেখত লোহার হামানদিস্তেতে প্রিয় সংসারকে পিষে গুঁড়ো করে ফেলছে দয়াময়ী। অসহায়ের মত তারা তাকিয়ে থাকত। দয়াময়ীর অপ্রকৃতিস্থতার কারণ বুঝতে পারত না। কারণ জানতাম আমি। আমিই কারণ। আমার জন্যে দয়াময়ী প্রায় উন্মাদিনী হয়ে গিয়েছিল। সংসারে এতো মায়া কোথা থেকে আসে?

ষোল

মা, সংসারে যা যায়, তা কোথায় যায়? যা আসে, কোথা থেকে আসে? কে পাঠায়? স্নেহ, মায়া দিয়ে তৈরি এ সংসার কেন ভেঙে যায়? ভালবাসার সম্পর্কে কেন চিড় ধরে? ভাঙা সম্পর্ক কি জোড়া লাগে? কাটাছেঁড়ার দাগ কি মিলিয়ে যায়?

দয়াময়ীর মধ্যস্থতায় শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে, দেবুমামা কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। বিষয়আশয়ে ব্যস্ত, রাশভারী মানুষটাকে ভর করল উদাসীনতা। তার চালচলনে অন্যমনস্কভাব দয়াময়ীর নজর এড়াল না। রোজ সন্ধেতে হিসেবের খাতা না মিললে রাতে যার ঘুম হত না, মাঝে মাঝে সেই নিত্যকর্ম সে ভুলে যেতে থাকল। শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে অঘোরবালার পাঠানো খবরের সঙ্গে নিজের দেখাকে মিলিয়ে দয়াময়ী টের পাচ্ছিল, তার মেজদা আর আগের মত নেই। হাতের প্লাস্টার কাটিয়ে অঘোরবালা তখন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে শ্বশুরের ভিটেতে ফিরে গেছে। হাতের ভাঙা হাড় জোড়া লাগলেও কাজ করার মত জোর ফিরে আসেনি। বাঁ-হাতের মুঠোয় ছ' আনা দামের রবারের বল নিয়ে সারাদিন সেটা টেপাটেপি করে হাতের ব্যায়াম করত। দেবুমামার ঘরে তালা পড়ার ঘটনাতে নিজের

বাড়ি ছেড়ে সে আর বাইরে থাকতে চাইছিল না। তালা শেষ পর্যন্ত যারা লাগিয়েছিল, তারা খুলে নিলেও। অঘোরবালার ভয় কাটেনি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে তার ফেরা, দয়াময়ীও আটকায়নি। আমাদের লেবুতলার বাড়িতে কিশলয় তখন টাইফয়েডে ভুগছিল। দু'বার সেরে উঠে এক মাসের মধ্যে জ্বরে তৃতীয়বার বিছানা নিয়েছিল। যমে-মানুষে টানাটানি চলছিল তাকে নিয়ে। মৃত্যুর চৌকাঠ ছুঁয়ে ফিরে এসে সে কিছুটা সুস্থ হতে ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদল করতে আমরা শিমুলতলা গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে ট্রেনে রাতারাতি সেখানে পৌঁছনো যেত। স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে কলকাতার বাবুরা তখন বছরে দু-একবার সাঁওতাল পরগনার কিছু শহরে যেত। বিস্তর জমি কিনে বাড়ি বানিয়েছিল অনেকে। আমাদের দু-একজন আত্মীয়ের বাড়ি ছিল শিমুলতলাতে। তাদের একজনের বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম। ব্যবসা ফেলে চন্দ্রনাথের তখনই শিমুলতলা যাওয়ার উপায় ছিল না। দেবু বোসের মত একজন অভিভাবকের সঙ্গে বৌ-ছেলেমেয়েকে বিদেশ-বিভূঁইয়ে পাঠিয়ে চন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হতে চাইলেও কথাটা দেবু বোসকে বলতে পারছিল না। চন্দ্রনাথের হয়ে বলেছিল দয়াময়ী। দেবুমামাকে আগের মত চনমনে করে তুলতে তাকে, প্রায় জোর করে শিমুলতলাতে নিয়ে এসেছিল। দেবু বোসের আপত্তি ধোপে টেকেনি। কলকাতা ছাড়ার আগে, চন্দ্রনাথের কাছ থেকে, সাতদিনের মধ্যে সে-ও শিমুলতলা পৌঁছচ্ছে, এরকম পাকা কথা আদায় করে দেবু বোস ট্রেনে উঠেছিল। চন্দ্রনাথ শিমুলতলা গেলে দেবু বোস কলকাতা ফিরবে। আদালত-পাড়ায় দু-চারদিন হাজিরা দিয়ে দরকার হলে আবার শিমুলতলায় গিয়ে দয়াময়ী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় ফিরতে তার আপত্তি ছিল না। অঘোরবালাকেও দয়াময়ী সঙ্গে নিল। শিমুলতলায় দয়াময়ীর একমাসের বেশি থাকার উপায় না থাকলেও লটবহর কম হল না। রুগ্ন ছেলের স্বাস্থ্য ফেরানোর সঙ্গে গোটা পরিবার, এমনকি বিধবা মা পর্যন্ত হাওয়া বদল করতে গেলে পোঁটলাপুঁটলির সংখ্যা বেশি হওয়া স্বাভাবিক। বিধবাকে অনেক বাছবিচার করে চলতে হয়।

বেড়ানোর আনন্দের সঙ্গে দয়াময়ীর মনে কিছু দুশ্চিন্তা ছিল। বিয়ের তিন বছর পরে বীথিকা সন্তানসম্ভবা হয়েছে। মা হতে তার চার মাস দেরি থাকলেও তাকে আগেভাগে নিজের কাছে এনে দয়াময়ী রাখতে চায়। বীথিকার শ্বশুরবাড়িতে তার শ্বশুর আর স্বামী দুজন ডাক্তার হলেও বয়স্কা কোনও স্ত্রীলোক নেই। বীথিকার স্বামী অরূপ ছেলেবেলায় তার মাকে হারিয়েছে। সতের বছরের বীথিকাই সংসারের কর্ত্রী। চোখের সামনে স্ত্রী মারা যেতে বীথিকার ডাক্তার শ্বশুরের ধারণা হয়েছে, রুগীর চেয়ে ডাক্তার বেশি অসহায়। অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে শ্বশুর হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইছিল। কথাটা দয়াময়ীকে বলতে মানুষটা সঙ্কোচ করেনি। শিমুলতলা থেকে ফিরে বীথিকাকে দয়াময়ী বাড়িতে নিয়ে আসবে। সংসারে মায়ের বয়সী কেউ না থাকলে পোয়াতি সামলানো সম্ভব নাকি? বীথিকা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার দ্বিতীয় মাসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কারণ, অরুচি। গলা দিয়ে জল নামছে না। যা খাচ্ছে, বমি করে দিচ্ছে। বিদ্যেবুদ্ধি উজাড় করে বাড়ির দুই ডাক্তার ওষুধ খাইয়ে যাচ্ছিল বৌকে। বৌয়ের মুখে রুচি ফিরছে না। খিদে হচ্ছে না। ব্যারাকপুরে বীথিকাকে দেখতে

গিয়ে দু-একটা টোটকা দিয়ে এসেছিল দয়াময়ী। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে, টেলিফোনে সতের বছরের সন্তানসম্ভবা মেয়ের উল্লসিত গলা ভেসে এল, মা দারুণ কাজ হয়েছে। খোলামকুচি যে এত ভাল খেতে জানতাম না। খোলামকুচি খাওয়ার জন্যে রোজ হারুকে দু-তিনবার করে মিষ্টির দোকান থেকে দই, রসগোল্লা কিনতে পাঠাচ্ছি। মিষ্টিগুলো খাচ্ছে হারু, আর আমি খাচ্ছি খোলামকুচি।

খোলামকুচি খাওয়ার জন্যে নয়, পোড়া মাটি দিয়ে দাঁত মাজার জন্যে রুচি ফিরছে। দু-এক ঢোঁক পোড়া মাটি পেটে গেলে ক্ষতি নেই। তবে বেশি খাবি না। দু'বেলা পেট ভরে ভাত খাচ্ছিস তো?

হ্যাঁ

অরুচি গেছে?

একদম।

বেশ। ভাল করে খাওয়াদাওয়া কর। ফল, মিষ্টি, দুধ, যা ভাল লাগে, খা। সারাদিন ভাঁড়, খুরি, সরা, মালসা ভাঙা চিবিয়ে কয়েকবার দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নিস। ওগুলো চিবোলেই খাওয়ার ইচ্ছে ফিরে আসবে। চিবিয়ে ফেলে দিলেও খাওয়ার আরাম পাবি।

দয়াময়ী নির্দেশ বীথিকা মেনে নিয়েছিল। দু'দিন পরে বীথিকার শ্বশুর টেলিফোন করে দয়াময়ীকে বলেছিল, বেয়ান, বিলিতি ওষুধকে হারিয়ে দিয়েছে আপনার টোটকা। ছেলেবেলায় আমার মা-মাসিদের খোলামকুচি চিবোতে দেখলেও কারণটা বুঝতে পারিনি। এতদিনে বুঝলাম। পাশ করা ডাক্তারদের মুশকিল হল, প্রেসক্রিপশনে খোলামকুচি চিবোনোর পরামর্শ দেওয়ার অধিকার তাদের নেই।

শিমুলতলায় কয়েকদিন কাটতে বোঝা গেল, কিশলয় শরীরে জোর পাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে দেবুমামার মনমরা ভাব, বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে ভাঙা হাতে রবারের বল ছোঁড়াছুঁড়ি করে খেলছে অঘোরবালা। দয়াময়ীর মুখ খুশিতে ঝলমল করলেও পোয়াতি মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তায় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেত। সকলের চোখের আড়ালে তখন থাকতে চাইত। পাঁচ-সাত মিনিট একা কাটিয়ে হেঁশেলে যখন ফিরত তখন আর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ থাকত না।

শিমুলতলার বাড়িতে থাকার দিনগুলোতে পায়খানা, কলঘর, নর্দমা সাফাইয়ের দায়িত্ব নিয়েছিল দেবুমামা। বিশাল দোতলা বাড়ি, চকমেলানে উঠোন, দালান, বারান্দা, একতলা, দোতলা মিলিয়ে ডজনখানেক ঘর, খাট, বিছানা, আলমারি, দেওয়ালে টাঙানো অয়েল পেন্টিংয়ে বনেদিয়ানা মিশে থাকলেও সেই বাড়ির এক অংশে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা চালু ছিল। বাড়িতে দুটোই ছিল মাটির গামলা বসানো খাটা পায়খানা। বালতি বালতি জল আর ঝাঁটা নিয়ে দুটো পায়খানা, নিত্যদিন ভোরে দেবুমামা পরিষ্কার করত। রোজ দুপুরে ঝাড়ুদার এসে ভর্তি গামলা মাথায় নিয়ে খালি করে আনত। পায়খানা ধোয়ার কাজও ছিল তার। তাকে অব্যাহতি দিয়ে দেবুমামা স্বেচ্ছায় সে কাজ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। পায়খানা ধুয়ে, বাড়ির দু'পাশের নর্দমা ব্লিচিং পাউডার ঢেলে ঝাড়ু দিয়ে সাফ করে, দুটো স্নানঘর ভাল করে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে স্নান সেরে সকাল আটটার আগে দেবুমামা বাজার করতে বেরিয়ে যেত। দেবুমামা কোন সকালে উঠত,

জানতে না পারলেও বাজারে যাওয়ার সময়ে তার সঙ্গে আমি আর দেবপ্রতিম থাকতাম। বাজারে ঢোকার পথে হালুইকরের দোকানে আমাদের বসিয়ে গরম পুরি, তরকারি, ক্ষীরের প্যাঁড়া খাওয়াত দেবুমামা। শিমুলতলার জলের গুণে বাড়ি ফেরার মধ্যে খাবার হজম হয়ে যেত। কলকাতা থেকে চন্দ্রনাথ এসে দেবুমামার পায়খানা সাফাই আটকাতে চেয়েছিল। পারেনি। দেবুমামার ওপর চাপ কমাতে বাজার করার দায়িত্ব চন্দ্রনাথ নিয়েছিল। দেবুমামা আপত্তি করেনি। অঘোরবালার কাছ থেকে সেই প্রথম শুনলাম, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ির তিনটে পায়খানা আর দুটে কলঘর ত্রিশ বছর ধরে দেবুমামা হপ্তায় একদিন নিজে সাফাই করে। মাসমাইনের ঝাড়ুদার থাকলেও এ কাজ করে দেবুমামা আরাম পায়। আমি না জানলেও এ ঘটনা দয়াময়ীর অজানা ছিল না। দয়াময়ী বলেছিল, সবচেয়ে শক্ত কাজটা করার জন্যে মেজদার মত দু-একজন মানুষ সংসারে থাকে। তারা না থাকলে জীবন অচল হয়ে যেত।

অঘোরবালা বলেছিল, ওর ঘেন্নাপিত্তি নেই। বাড়িতে, যাকে যখন বেডপ্যান দিতে হয়েছে, দেবু দিয়েছে। নোংরা বেডপ্যান ধুয়ে রেখেছে। দরকার হলে দিনে তিন-চারবার করেছে এ কাজ। এখনও করে।

শিমুলতলার আমাদের সঙ্গে পনের দিন কাটিয়ে দেবুমামা কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল। দেবুমামার সঙ্গে তার আগে, আমরা শিমুলতলা পৌঁছনোর সপ্তম দিনে চন্দ্রনাথ সেখানে এসে পেয়েছিল। শিমুলতলাতে চন্দ্রনাথ ছিল সাতদিন। আমাদের শিমুলতলায় রেখে দু'জনে একসঙ্গে কলকাতায় ফিরেছিল। দয়াময়ীর সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিল তারাপ্রসাদ কাকা, দেবুমামা, চন্দ্রনাথ ফিরে যাওয়ার আগে তারাপ্রসাদ কাকা এসে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে শিমুলতলায় শেষ দিন পর্যন্ত তারাপ্রসাদ ছিল। তার মধ্যে কান্তমামা, মেজকাকা রাধানাথ এসে দু-তিনদিন করে দয়াময়ীর কাছে থেকে গিয়েছিল। বাড়ি জুড়ে সে কী উল্লাস! কাকা, মামাদের সঙ্গে ফুটবল পর্যন্ত খেলেছিলাম! আমাদের সমবয়সী হয়ে গিয়েছিল তারা। বয়স কম হলেও আমি টের পেতাম যার টানে এই আসা যাওয়া, সে কারও দিদিমণি. কারও বৌদি, সকলের সমান আপন, সে দয়াময়ী সেন, আমার মা। মনের গভীরে সোনালি রেখার মত শিমুলতলার যে স্মৃতি আজও জেগে রয়েছে, তা হল শুক্লপক্ষের রাতে, দোতলা বাড়ির ছাতে, মাদুরে বসে চন্দ্রনাথ, দেবু বোসের কথোপকথন। প্রাসাদের মত সেই বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল। সুইচ টিপলে আলো জ্বলত, পাখা ঘুরত, ছাতেও একটা আলোর ডুম লাগানো ছিল। আলো পারতপক্ষে কেউ জ্বালত না। ছাতে যারা আসত, তারা অন্ধকার উপভোগ করতে আসত। পঞ্চাশ পেরনো একজন আর ষাট ছুঁইছুঁই একজন, ছাতের অন্ধকারে বসে, একতলা থেকে খাওয়ার ডাক না-আসা পর্যন্ত গল্প করত। দুই প্রবীণের আসরে একের বেশিবার আমি ঢুকে পড়েছি। মাদুরে তাদের পাশে না বসলেও অনেকটা সময় ছাতে থেকে গেছি। হাতের পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে আমি দেখতাম, পেছনের বাড়ির আলো ঝলমল মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলা চলছে। ঝড়ের গতিতে ছুটোছুটি করছে ধবধবে সাদা একটা পালকের ফুল, ব্যাডমিন্টন। কনকনে শীতের দিনগুলো চলে গিয়ে বসন্ত এলেও বাতাসে সময়সন্ধির শিরশিরে ভাব ছিল। ফাল্গুনের সন্ধেতে ব্যাডমিন্টন

প্রতিযোগিতা চলছিল সেখানে। খেলা দেখতে কম ভিড় হত না। দু' সন্ধেতে খেলার মাঠে আমিও দর্শক ছিলাম। সঙ্গী ছিল দেবপ্রতিম। তাকে না পেলে ছাতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতাম। ছাত থেকে খেলা দেখাতে বেশি আরাম ছিল। অল্প দুরে মাদুরে বসে, বিষয়আশয়ের কথাতে দুই প্রবীণ মশগুল হয়ে থাকত। তাদের অনুচ্চ স্বরের টুকরো কিছু কথা শুনতে পেলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। নিজেদের কথকতায় বিভোর মানুষ দুটোও তাকাত না আমার দিকে। ফুরফুর করে হাওয়া দিত। চাঁদের আলোয় দেখা যেত একজনের চৌকো, আর একজনের গোলমুখ। ছেঁড়া মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়লে মুখ দুটো কুয়াশার ঢেলার মত হয়ে যেত। চোখ, নাক, কানবিহীন রেখাচিত্রের মত দেখাত তাদের। খেলা দেখাতে আমি মেতে থাকলেও তাদের আলোচনার দু-এক টুকরো আমার কানে আসত। সবটা না শোনার জন্যে এখন আপসোস নয়। মনে হয়, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের কথোপকথন শোনার সুযোগ নষ্ট করেছি। চন্দ্রনাথ, দেবু বোসের মত একই ভঙ্গিতে বসে সেই মহাপুরুষরাও নিশ্চয় দার্শনিক চিন্তা লেনদেন করত। ত্রিশ বছর আগে শোনা, দুই প্রবীণের কিছু সংলাপ আজও আমার মনে আছে। আকাশ আর গঙ্গার স্রোতে আচমকা এই অঝোর বৃষ্টিতে তাদের কণ্ঠস্বর, কথা, আমি শুনতে পাচ্ছি। দেবু বোস বলল, চন্দ্রনাথ, এত সিগারেট খেয়ো না। বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। ছেলেরা কী শিখবে?

সসঙ্কোচে চন্দ্রনাথ জবাব দিল, এবার ছেড়ে দেব।

আর ছেড়েছ! কুড়ি বছর ধরে শুনছি এ কথা।

চন্দ্রনাথ আর কথা বাড়াল না। ঠোঁটের তলায় দিনে দু-তিনবার সামান্য খৈনি রাখা ছাড়া দেবুমামার কোনও নেশা ছিল না। দু'কাপের বেশি চা সারাদিনে খেত না। ছাত্রজীবনে একবার একটা সিগারেট খেয়ে সাতদিন ঘুমোতে না পেরে প্রায় পাগল হতে চলেছিল। সামলে নিতে সময় লেগেছিল এক মাস। সামনে বসে এখন কেউ সিগারেট খেলে দেবুমামার মাথা ঘোরে। দেবুমামার মুখের সামনে চন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ সিগারেট টানতে সাহস পায় না। খাওয়া নিয়েও দেবুমামা বেজায় পিটপিটে। তেল, ঝাল, মশলা দিয়ে রান্না করা খাবার ছোঁয় না। অঘোরবালার হাতের রান্না কালিয়া, দম, ডালনা, মালাইকারি, তার অনুরোধে দেবুমামা চেখে দেখলেও ভাত, রুটির সঙ্গে খেত না। অঘোরবালার মনে এ নিয়ে দুঃখ ছিল। প্রতি শনিবার, সারাদিন উপোস দিয়ে সন্ধ্যের পর দেবুমামা এক গ্লাস ঘোল খেত। রাত ন'টা বাজলে শুয়ে পড়ত। পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও। শোওয়ার আগে হাফ ডাইরিতে সারাদিনের হিসেব লেখা ছিল তার বিশ বছরের অভ্যেস। হিসেব লেখা শেষ করে এক রাতে খুচরো পয়সা মেলাতে গিয়ে দেবুমামা বিপাকে পড়ল। থলিতে যা থাকার কথা, তার চেয়ে দু'আনা বেশি হয়েছিল। দু'আনা কম নয়। দুটো নিমকি, দুটো জিলিপি, দু'আনাতে পাওয়া যেত। দু'আনাতে দুটো সিঙাড়া কেনা সম্ভব ছিল। বাড়তি দু'আনার হিসেব পেতে দেবুমামা হিমশিম খেয়ে গেল। দফারফা হল ঘুমের। রাত সাড়ে ন'টায় মনে পড়ল, পোস্তার মাজনওয়ালা কাছ থেকে মাজন কিনে দাম দেওয়া হয়নি। মাজনের শিশি নিয়ে, দাম দিতে কেন ভুল হয়ে গেল, খেয়াল করতে পারল না। তখনই ধুতি-

পাঞ্জাবি পরে পোস্তা রওনা হতে অঘোরবালা জিজ্ঞেস করল, এত রাতে কোথায় চললি?

দেবুমামা বলেছিল তার গন্তব্য, দেবুমামার জবাব শুনে অঘোরবালা বলেছিল, কাল সকালে দামটা দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

ওরে বাবা! রাতে ঘুম হবে না।

ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া বোনপোর মুখের দিকে তাকিয়ে অঘোরবালা,— তাকে আটকায়নি। দেবুমামার ভাগ্য ভাল, মাজনের দোকান বন্ধের পাঁচ মিনিট আগে সেখানে পৌঁছে যায় এবং মাজনের দাম বাবদ দু'আনা দিয়ে রাত এগারটায় বাড়ি ফিরে আসে। রাতে ঘুমোতে একটু দেরি হলেও হিসেব মিলে যেতে হাঁপ ছেড়ে ভেবেছিল, যাক লিখে ফেলা ডাইরিতে কাটাকুটি করতে হল না! লেখার মত কথা বিশেষ না থাকার জন্য ডাইরিতে দেবুমামা রোজের সংসার খরচ আর পরিবারের জন্মমৃত্যুর খবর লিখত। দেবুমামার পুরনো এক ডাইরির পাতায় আমি দেখেছিলাম, ইংরেজিতে লিখত। দেবুমামার পুরনো এক ডাইরির পাতায় আমি দেখেছিলাম, ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, দয়াময়ীর একটি ছেলের আজ সন্ধে ছ'টা চল্লিশ মিনিটে জন্ম হল।

পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ডাইরির তারিখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, আমার জন্মের ঘটনা, দেবুমামা নথিবদ্ধ করেছে। ডাইরির বাঁদিকে জন্মের খবর লিখে ডানপাশে বাংলায় লেখা রয়েছে সন্দেশ ২ (দু টাকা)।

পরিবারের কারও ছেলেমেয়ে জন্মালে, তার বাড়িতে সন্দেশের বাক্স নিয়ে দেবুমামা যেমন পৌঁছে যেত, তেমনই কেউ মারা গেলে তার বাড়িতে ফলমূল নিয়ে হাজির হত। দেবুমামার ডাইরির একটা পাতার বাঁদিকে ইংরেজিতে লোখ রয়েছে, আজ দুপুর দুটো বাহান্ন মিনিটে হরিদাসবাবু মারা গেছেন।

ডাইরির সেই পাতায় ডানপাশে লেখা, কলা ও আনারস ২ (দু টাকা)।

বসন্তের শুরুতে শিমুলতলার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় পনের দিন কাটিয়ে মনমরা দেবুমামা যে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, তাকে দেখেই বোঝা যেত। রোজ সকালে দুটো খাটা পায়খানা, আর নর্দমায় ঝাড়ু লাগানো ছাড়া সন্ধেতে ডাইরিতে হিসেব লিখত। ভগ্নীপতি চন্দ্রনাথের সঙ্গে দেবু বোসের সম্পর্ক ছিল একই সঙ্গে অভিভাবক আর বন্ধুর মত। সংসারের নানা দরকারে দেবু বোসের পরামর্শ নিত চন্দ্রনাথ। শিমুলতলায় যে সাতদিন দুজনে একসঙ্গে ছিল, সন্ধ্যের পর দেড়-দু'ঘণ্টা সংসারের বিবিধ বিষয় নিয়ে তারা কথা বলত। দেবু বোসের মতামতের ওপর চন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল অগাধ। চন্দ্রনাথকে দেবু বোস স্নেহ করত। কথার মধ্যে মাঝে মাঝে বিরক্তিতে নাক-মুখ কুঁচকে বলত, আর কত চা-সিগারেট খাবে?

ছাতে বসার পর থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচটা সিগারেট, তিন-চার কাপ চা খেয়ে নিত চন্দ্রনাথ। ভগ্নীপতির অনাচারে রেগে গিয়ে তাকে ধমকাত দেবু বোস। চন্দ্রনাথ সসঙ্কোচে বলত, ব্যাস, এই শেষ, আর নয়।

কথাটা বলার এক ঘণ্টার মধ্যে চন্দ্রনাথ ফের সিগারেট ধরাত। রান্নাঘর থেকে দুজনের জন্যে চা এলেও দেবুমামা চা খেত না। চন্দ্রনাথ একা পুরো দেড় কাপ খেত।

তার মধ্যে ভগ্নীপতিকে দেবু বোস জিজ্ঞেস করে নিত, সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্সের খাতা তৈরি হল?

এইবার হাত লাগাব।

তুমি ডুববে। কোমরে দড়ি দিয়ে যখন হাজতে ঢোকাবে, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল!

দেবু বোসের ধমক শুনে চন্দ্রনাথ বিড়বিড় করে বলেছিল, একজন বিশ্বাসী, ভাল লোক না পেলে।

কেন, আমি যে ঠিকানা তোমাকে দিয়েছিলাম।

ঠিকানাটা কোথায় হারিয়ে গেল!

তুমি বাজে লোক! ট্যাক্স দেওয়ার ইচ্ছে তোমার নেই।

কী যে বলেন? ফি বছরের গোড়াতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চালানে— মোটা টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দিই। সরকারের পাওনা টাকা মেরে দেওয়ার কথা স্বপ্নে ভাবি না।

দেবু বোস মূল প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করত, ইনকামট্যাক্স উকিলের ফোন নম্বর হারিয়ে ফেলার পরে আমার কাছ থেকে আবার নিলে না কেন? তোমার সঙ্গে এর মধ্যে কম বার দেখা হয়নি।

তা ঠিক। সব কথা সময়ে মনে পড়ে না।

দেবু বোস বিষয় বদলাত। ফিসফিস করে বলত, তোমার মেজছেলে দামু (দেবপ্রতিমের ডাকনাম) তো আজকাল খুব বাডসাই টানছে।

দেবপ্রতিমের বয়াস উনিশ। কলেজে পড়ছে। তার সিগারেট খাওয়ার খবর চন্দ্রনাথের অজানা নয়। রাস্তায় দূর থেকে তাকে সিগারেট টানতে দেখেছে চন্দ্রনাথ। সে পাশে দাঁড়ালে, তার গা থেকে ভুরভুর করে সিগারেটের যে গন্ধ বেরোয়, তা চেপে রাখার মত নয়। চেপে রাখার চেষ্টা দেবপ্রতিম করে না। ছেলের গা থেকে বেরনো সিগারেটের গন্ধ নাকে ঢুকলে চন্দ্রনাথের রোমাঞ্চ লাগে। সেদিনের সেই পুঁচকে শিশুটা কী করে সিগারেট ফোঁকার বয়সে পৌঁছে গেল, ভেবে কুলকিনারা পায় না। ছেলেকে ধমকানোর চিন্তা মাথায় এলেও কাজে তা করতে পারে না। তবু দেবু বোসের মুখে খবরটা শুনে অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে চন্দ্রনাথ বলেছিল, দামু সিগারেট ধরেছে নাকি? ছোঁড়ার বড় তেল হয়েছে। মজা দেখাচ্ছি!

চন্দ্রনাথের কথা দেবু বোসের বিশ্বাসযোগ্য মনে হত না। বলত, বাপকা বেটা। যেমন বাপ,, তেমন ছেলে। বাপ সারাদিন ধোঁয়া ছাড়ছে, ছেলেও বাডসাই ফুঁকছে।

চন্দ্রনাথ চুপ করে থাকতে দেবু বোস বলেছিল, উল্টোডাঙার কাঠগোলায় দামুকে বসিয়ে দাও। কাজের মধ্যে থাকলে আড্ডা, বিড়ি-সিগ্রেট ফোঁকা কমে যাবে।

তাই করতে হবে।

কথাটা বললেও চন্দ্রনাথ জানত, তা সম্ভব নয়। সদ্য উড়তে শেখা পাখিকে আঁকশি দিয়ে মাটিতে টেনে নামাবে কে? তাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। এত নিষ্ঠুর সে হবে কী করে? তারও একদিন দেবপ্রতিমের মত বয়স ছিল। দেবপ্রতিম যে বয়সে সিগারেট ধরেছে, তার আগে সে শিখেছিল। দেবপ্রতিম কলেজে পড়ছে। লেখাপড়াতে সে খারাপ

নয়। কলেজ ছেড়ে বাবার কাঠগোলায় বসতে সে রাজি হবে না। দেবপ্রতিমকে কথাটা সে বলতে পারবে না।

ছাতের অন্ধকার কোণে, পাঁচিলে বুক ঠেকিয়ে পাশের বাড়ির মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলা দেখলেও চন্দ্রনাথ আর দেবু বোসের কথা কান খাড়া করে শুনছিলাম। আমার সম্পর্কে তারা কী বলে, শুনতে চাইছিলাম। আমি যে ছাতে রয়েছি, তারা দেখে থাকলেও খেয়াল রাখেনি। আমি শুনতে চাইলেও আমাকে নিয়ে একটা কথা তারা বলল না। বড়দের আলোচনার বিষয় হতে না পেরে কষ্ট পেয়েছিলাম। আমাদে বাদ দিয়ে তারা শিমুলতলার জল, হাওয়ার প্রশংসা করতে থাকল। শিমুলতলাতে তিনদিন থেকে যে খিদে বেড়ে গেছে, যা খাচ্ছে হজম হয়ে যাচ্ছে, চন্দ্রনাথ খোলাখুলি মেনে নিল। দেবু বোস বলল, মেজাজটা ভাল হয়ে গেছে। ভারি হালকা লাগছে নিজেকে।

সংসার থেকে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে যে দেশভ্রমণ করা উচিত, এ বিষয় একমত হল দুজন। তখনই ফি বছর ঘর ছেড়ে একবার বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত চন্দ্রনাথ নিলেও দেবু বোস চুপ করে ছিল। দূরে কোথাও কোকিল ডাকছিল। আমি দেখলাম সামনের বাড়ির অন্ধকার কার্নিশে ব্যাডমিন্টনের ককের চেয়েও ধবধবে সাদা একটা লক্ষ্মীপেঁচা বসে রয়েছে। চোখের সামনে সেই প্রথম সাদা পেঁচা দেখলাম। মনে হচ্ছিল, পাখিটা আকাশ থেকে নেমে এসেছে। দেবপ্রতিমকে সিগারেট খাওয়া নিয়ে একটা কড়া কথা চন্দ্রনাথ বলেনি। কাঠগোলায় বসতে বলতেও হয়ত ভুলে গিয়েছিল। চন্দ্রনাথের কাছে দেবুমামা প্রসঙ্গটা দ্বিতীয়বার পেড়েছিল কিনা, জানি না। তবে শিমুলতলায় গিয়ে দেবুমামার মেজাজ যে আগের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, এ নিয়ে আমার সন্দেহ নেই। হারানো স্বাস্থ্য কিশলয় ফিরে পেয়েছিল। তারাপ্রসাদ কাকার সঙ্গে আমরা কলকাতা ফিরেছিলাম।

ষোলো

গঙ্গার ধারে অঝোর বৃষ্টির মধ্যে ইংরেজ আমলের ছাউনির নিচে, পিতৃপক্ষে আমি যেন অনন্ত তর্পণে বসেছি। গোলাপবাগানে সূর্যোদয় দেখার মত শিমুলতলার স্মৃতি ঘিরে ধরেছে আমাকে। স্মৃতির মধ্যে মিশে রয়েছে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া আমার প্রিয়জনেরা। আহা! কী আনন্দে কেটেছিল দিনগুলো। দয়াময়ীর মুখে শুনেছিলাম, শিমুলতলার সেই বাড়িতে দয়াময়ী আরও একবার এসেছিল। তখনও আমার জন্ম হয়নি। প্রথম তিন সন্তান অরিন্দম, বীথিকা, দেবপ্রতিমকে নিয়ে চন্দ্রনাথের সঙ্গে শরীর সারাতে শিমুলতলা এসেছিল। দয়াময়ীর পাশে ছিল অঘোরবালা। তখনও সংসারের ঝক্কি সামলানোর মত গতর ছিল তার। শিমুলতলা আসার আগে অসুস্থ মেয়েকে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে নিজের কাছে এনে তিন মাস রেখেছিল। বুকে জল জমে বিছানাবন্দী হয়ে গিয়েছিল দয়াময়ী। অঘোরবালার ভাষায় জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত আমার মেয়েটা হাড় জিরজিরে হয়ে গিয়েছিল? গেঁড়ি-গেঁড়ি তিন ছেলেমেয়ের

প্লুরিসি রোগাক্রান্ত মাকে বাঁচাতে বিধবা অঘোরবালা শরীরপাত করে শুশ্রূষা করেছিল। সবচেয়ে বেশি দৌড়ঝাঁপ করেছে দেবুমামা। দয়াময়ীর পরিচর্যাতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়েছিল। মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও যে অফিস কামাই করার কথা ভাবতে পারত না, অসুস্থ বোনের জন্যে ওষুধবদ্যিতে আটকে গিয়ে দিনের পর দিন তাকে অফিসে যাওয়া বন্ধ রাখতে হয়েছে। ডাক্তারের নির্দেশে মুরগীর মাংস না খেলেও দেবুমামার সনির্বন্ধ অনুরোধে দয়াময়ীকে মুরগির ডিম খেতে হয়েছিল। বিধবা অঘোরবালা মুরগীর ডিম ছুঁত না। অল্প গরম একগ্লাস দুধে দু'চামচ মধু ডিমের কুসুম গুলে রোজ সকালে দয়াময়ীকে দেবুমামা সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াত। নাক টিপে পাঁচনের মত সেই দুধ এক নিঃশ্বাসে খেয়ে প্রথম দু-একদিন দয়াময়ী ওয়াক তুললেও বমি করেনি। ওয়াক তোলা কয়েকদিন পরে বন্ধ হয়েছিল। নাক টিপে খাওয়া ছেড়েছিল আরও কিছুদিন পরে। মাস কাবার হওয়ার আগে এক নিঃশ্বাসে গ্লাস শেষ করাব বদলে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে খেতে লাগল। দেবুমামা তা দেখে বলেছিল, বাজার ঘুরে সুন্দরবনের খাঁটি মধু জোগাড় করা সার্থক হল।

দয়াময়ীকে সারিয়ে তুলতে পথ্য ওষুধের সমান জরুরি, দেবুমামা জানত। দয়াময়ীর জন্য চাঁদনি চক থেকে কিনে আনত কাশ্মীরী আপেল আঙুর বেদানা। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে যে হিং দিত, সেই কাবুলিওয়ালাকে ফরমাশ করে আখরোট, পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ আনিয়েছিল, কয়েকবার। আরোগ্যের দিনগুলোর কাহিনী শোনাতে শুরু করলে, শেষ বয়সেও দয়াময়ীর চোখ দুটো ছলছল করত। বলত, কোন ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছিলাম মনে নেই। বাবার অভাব মেজদা বুঝতে দেয়নি। সংসার আর আমার সংসার ছাড়া মেজদা কাউকে চিনত না।

দয়াময়ীর কথাতে যে সামান্য ভুল নেই, আমি জানতাম। সংসার ছেড়ে প্রায় বিনা নোটিসে দেবুমামা চলে গিয়েছিল। আকাশ ভেঙে পড়ার মত সেই ঘটনার আগে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে ছিঁচকে চোরের উৎপাত বেড়েছিল। তার আগে কমে গিয়েছিল বাড়ির লোকসংখ্যা চারুবালার মেয়ে আর ছোট ছেলে, মালামাসি আর শান্তমামা এক বছরের মধ্যে মারা গেল। বত্রিশ বছরের শান্ত রাতে ঘুমের মধ্যে মারা যাওয়ার দু'মাস পরে মালামাসি পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। বিয়াল্লিশ বছরের মালামাসির কঙ্কালের মত প্রাণহীন শরীর দেখে আমার মনে হয়েছিল, এক বছর সে উপোস করে আছে। আসলে তা নয়। মালামাসির লিভার শুকিয়ে যাচ্ছিল। খেতে পারত না। গলা দিয়ে খাবার নামত না। জোর করে খেয়ে কখনও বমি করত, কখনও পেটের ব্যথায় মুখ থুবড়ে বিছানায় সারাদিন শুয়ে থাকত। বাঁচার ইচ্ছে চলে যেতে তার রুচি, খিদে উধাও হয়েছিল। চোখের সামনে তিলে তিলে মালাকে মরতে দেখে দয়াময়ী যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। লেবুতলার বাড়িতে মালাকে এনে তিন-চারদিনের বেশি রাখতে পারেনি। মালাকে বিশেষ ডাক্তার দেখিয়ে, তার জন্যে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করেও ক্ষয় থেকে তাকে বাঁচাতে পারেনি। মরার পক্ষে বিয়াল্লিশ বছর বয়স যথেষ্ট না হলেও আগাম মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে মালা মরতে শুরু করেছিল। ঘুমের মধ্যে শান্তমামার মারা যাওয়া ঘটনাতে বেঁচে থাকার শেষ বিন্দু আগ্রহ সে হারিয়ে ফেলে। শান্ত মারা যাওয়ার

কিছুদিন পরে দয়াময়ীকে মালা বলেছিল, শান্তর পরমায়ুটা বোধহয় আমি খেয়ে বসে আছি। সংসার থেকে আমি চলে গেলে শান্ত বেঁচে যেত।

ছোট বোনকে ধমক দিতে গিয়ে দয়াময়ী কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল, বেঁচে থেকে তোর কেন অপরাধী লাগছে নিজেকে? তোদের দিদিমণিকে কি তোরা আর চাস না? আমার বেঁচে থাকা কি তাহলে অপরাধ?

দয়াময়ীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মালা বলেছিল, পায়ে পড়ি দিদিমণি, এসব কথা মুখে এনো না। তোমাকে কাঁদালে আমার নরকে গতি হবে না। তুমি আমার নিজের দিদিদের চেয়ে বেশি। আমি জানি, আমি মরে গেলেও তুমি আমাকে ভুলবে না।

মালাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দয়াময়ী বলেছিল, আমার সামনে মরার কথা আর কখনও বলবি না।

দয়াময়ীর নির্দেশ মালা মেনে দিয়েছিল। ছ'মাসের মধ্যে মরার কথা মুখে না এনে নিজেই মারা গিয়েছিল। অল্পবয়সী দুজন মানুষ পরিবার থেকে চিরকালের মত চলে যেতে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে পাকাপাকিভাবে শীতের মরসুম নেমে এসেছিল। স্থায়ী সেই শীত থেকে বাড়ির কারও রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না। দোতলা বাড়ির চোদ্দটা ঘরের বেশিরভাগ খালি পড়ে থাকত। সন্ধের পর একতলাতে দেবুমামা ছাড়া কেউ থাকত না। সকাল-সন্ধ্যে রান্নার জন্যে দু'সংসারের রান্নাঘরদুটো দু-আড়াই ঘণ্টার জন্যে জেগে উঠত। উনুনে আগুন পড়ত, বাসনের ঠুংঠাং আওয়াজ শোনা যেত। দুজনের ভাত-তরকারি নিয়ে রাতের মত শীলা একতলায় উঠে গেলেও দেবুমামাকে রাতে না খাইয়ে অঘোরবালা দোতলায় উঠত না। রাত আটটায় দেবুমামা খেত। অঘোরবালার খেতে ন'টা বেজে যেত। খাওয়ার পরেও কাজ থাকত। রান্নাঘর যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে, মনুর মা-র মাজার জন্যে রান্নার বাসন, এঁটো থালাবাটি এক জায়গায় রেখে, রান্নাঘরে তালা এঁটে অঘোরবালা দোতলায় উঠত। দোতলায় ছিল তার শোয়ার ঘর। মান্ধাতা আমলের যে খাটে অঘোরবালা ঘুমোত, সেটা যে তার ফুলশয্যার খাট নয়, অঘোরবালা জানত। খাটটা কে কিনেছিল, কখনও খোঁজ করেনি। চারুবালার দু'ছেলেমেয়ে চোখের সামনে মারা যেতে অঘোরবালা সন্তান হারানোর শোক পেয়েছিল। পাতলা হয়ে গিয়েছিল রাতের ঘুম। শোক ভুলতে বেশিরভাগ সময়ে দয়াময়ীর বাড়িতে চলে যেত। কখনও-সখনও যেত ছোট মেয়ে সৌদামিনীর কাছে। দয়াময়ীর সংসারে থেকে বেশি আনন্দ পেত। নব্বই পেরনো অঘোরবালা টের পাচ্ছিল, সংসারে তার অনেকদিন কেটে গেল। তার দীর্ঘায়ু হওয়াকে কমবয়সী কেউ কেউ ভাল চোখে দেখছে না। বিরজাকান্তর উইল অনুযায়ী সে মারা গেলে বাড়িটা ভোগদখল করার জন্য যারা পাবে, সেই কান্ত, পান্থ, মালার চাউনি বদলে যাচ্ছে। বুড়িটা কতদিন জ্বালাবে, তারা হিসেব পাচ্ছে না। চারুবালার ছেলেমেয়েদের মনের খবর অঘোরবালার সঙ্গে আরও একজন, দেবু বোস ভালরকম টের পেলেও মুখে কুলুপ এঁটেছিল। অঘোরবালাকে নিয়ে দেবু বোসের দুশ্চিন্তা বাড়লেও মা আর ভাইবোনদের আগের চেয়ে বেশি যত্নে দয়াময়ী আগলে রাখতে চেয়েছিল।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়ি খালি হতে থাকার খবর, পাড়ার মানুষের চেয়ে

এলাকার চোরেরা বেশি করে জেনেছিল। রাত বারোটা বাজলেই তাদের আনাগোনা শুরু হয়ে যেত। বাড়ির উঠোন, দালান সামনের-পেছনের রোয়াকে তারা ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াত। সকালে বাড় বাড়ির উঠোন, দালান ঝেঁটিয়ে এককাঁড়ি পোড়া বিড়ি জড় করে মনুর মা গজগজ করত। বিড়ির পরিমাণ দেখে দেবুমামা অনুমান করত, রাতে দু-তিনজন চোর যাতায়াত করছে। তার শোয়ার ঘরের পাশে অন্ধকার রোয়াকে বসে তারা নিয়মিত কয়েক ঘণ্টা আড্ডা দেয়। আড্ডা দেওয়া ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না। চুরি করার মত যা ছিল, কাঁসার বাসন থেকে পায়খানার গাড়ু পর্যন্ত বন্ধ ঘরের বাইরে যা থাকত, সব নিয়ে গিয়েছিল। বৈঠকখানা ঘরের পেছনে একফালি জমিতে দেবুমামার পোঁতা কয়েকটা দোপাটি গাছের চারা, থোবা গাঁদার কয়েকটি নবীন গাছও তারা ফেলে যায়নি। রোজ রাতে খাজনা নেওয়ার মত করে তারা আসত এবং হাতের কাছে যা পেত, নিয়ে যেত। নিরীহ চোর ছিল তারা। ঘরের দরজা-জানলা ভেঙে কখনও চুরি করেনি। বাড়ির দালান, উঠোন থেকে নেওয়ার মত যখন কিছু থাকল না, তখন ছেঁড়া চটি, পুরনো ঝাঁটা, নিয়ে যেত। বাসন চুরি যেতে থানায় এজাহার লেখাতে গিয়েছিল দেবুমামা। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। মাদুর, সতরঞ্চি, জলের বালতি, তেলের বাটি চুরির অভিযোগ নিয়ে থানায় যাওয়া যায় না। চুরি করার মত যখন কিছুই থাকল না তখন দেবুমামার ঘরের বন্ধ জানলায় মাঝরাতে তাদের কেউ টোকা দিতে শুরু করল। সাবেক আমলের বাড়িতে কাঠের পাল্লা আর কাচের পাল্লা লাগানো, দুরকম জানলা ছিল। কাঠের জানলার পাল্লা, বাইরের দিকে আর শার্সিলাগানো পাল্লা ভেতরের দিকে খুলত। রাতে শার্সি বন্ধ করে দেবুমামা ঘুমোত। কাচে টোকা দিয়ে চোর যে গৃহস্থের ঘুমের গভীরতা মাপছে দেবুমামা বুঝতে পারত। দেবুমামা সাড়া করত না। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে, তক্তপাশে শুয়ে ঘুম জড়ানো চোখে দেখতো, বন্ধ জানলার কাচের ওপাশে মাথায় ঝাঁকড়া চুল, খোঁচাখোঁচা দাড়িওলা একটা অস্পষ্ট মুখ। প্রথম দিন দেখে চমকে গিয়েছিল। ভয় পেলেও হইচই করে লোক জড় করেনি। কয়েক রাত নজর করে দেবুমামা বুঝেছিল, পরখ করতে লোকটা জানলায় টোকা দেয় না। ঘরের পূর্ব-দক্ষিণের দুটো বন্ধ জানলার কোনটা খোলা পাওয়া যায় কিনা, রোজ রাতে আলতো ঠেলা দিয়ে পরীক্ষা করে। লোকটার অসীম ধৈর্য। জানলার ছিটকিনি লাগাতে আধবুড়ো গৃহস্থ একদিন ভুলে যেতে পারে, সে ধরে নিয়েছিল। অভিজ্ঞতা থেকে হয়ত জেনেছিল, সব গৃহস্থ এরকম ভুল এক-আধবার করে। চোরটার ওপর দেবুমামা বিরক্ত হচ্ছিল। তার থোড়াই কেয়ার ভঙ্গিটা দেবুমামার আত্মভিমানে ঘা দিয়েছিল। মাঝরাতে তার ঘরের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে লোকটা ফস করে দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরায়, তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উতি। দু-তিনবার দেশলাই জ্বালত সে। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির আলোয় তার মুখ রোজ রাতে বেশ কয়েকবার দেখে দেবুমামার চেনা হয়ে গিয়েছিল। চেনা হয়ে লাভ কী রাস্তায় চিনতে পারলে ঘাড় ধরে থানায় ঢোকানো সম্ভব ছিল না। অনেক ভেবেচিন্তে ষাট বছরের মানুষটা চোর ধরার মতলব করল। সময়মত খেয়ে বিছনায় শুয়ে সে রাতে দেবুমামা জেগে থাকল। দক্ষিণের, জানলার পাশে শোয়ার ঘরের দক্ষিণমুখো বন্ধ দরজাটার খিল

ছিটকিনি খুলে, পাল্লা দুটো শুধু ভেজিয়ে রাখল। দরজার বাঁদিকে দু'হাত দূরে জানলা। মাঝরাতে ভেজানো দরজার পাল্লা খুলে চোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, তার পালানোর উপায় থাকবে না। অন্ধকার বিছানায় শুয়ে রাত বাড়ার সবরকম সঙ্কেত পাচ্ছিল দেবুমামা। বাড়ির আলো নিভিয়ে মানুষ শুয়ে পড়ছে। পাড়ার হল্লা অনেক আগে থেমে গেছে। গলিটা নিঝুম। বন্ধ শার্সির বাইরে অন্ধকার ঘন হচ্ছিল। সামনের উঠোনে চেনা বেড়ালটা দু-তিনবার ডেকে থেমে গেছে। পুবের জানলায় খুটখুট শব্দটা হতে বিছানায় শুয়ে লোকটাকে দেবুমামা দেখতে পেল। লোকটার কাজের ধরন দেবুমামা জেনে গিয়েছিল। পুবের জানলা পরে দক্ষিণের জানলা ঠেলাঠেলি করে খুলতে না পারলে সেই জানলার পাশে দাঁড়িয়ে লোকটা বিড়ি ধরাবে। হাতের পাতা আড়াল করে বিড়ি টানবে। জ্বলন্ত বিড়ির মিটমিটে আগুন তবু লুকোনো যেত না। দেবুমামা দেখতে পেত। চোর ধরার পরিকল্পনা সেভাবে করেছি। বিড়িতে আগুন দেওয়ার আগে চোর ধরতে হবে। বিছানা থেকে নেমে ভেজানো দরজার পেছনে নিঃশব্দে দেবুমামা গিয়ে দাঁড়াল। খালি গা। শক্ত করে লুঙ্গির কষি বেঁধে নিল। পুবের জানলা ছেড়ে লোকটা দক্ষিণের জানলায় এসে বন্ধ কাচের ওপর হাতের পাতা রাখতে দরজার একটা পাল্লা দেবুমামা আলতো করে খুলে চোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'হাতে তাকে জাপটে ধরতে লোকটা প্রথমে একটু ভড়কে গেলেও তখনই দেবুমামার লুঙ্গির কষি ধরে এক টান দিল। কোমরের নিচে লুঙ্গিটা মুহূর্তে নেমে যেতে চোরকে ছেড়ে দেবুমামা লুঙ্গি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পাশের বাড়ির পাঁচিলের ওপর লাফিয়ে উঠে চোখের নিমেষে অন্ধকারে মানুষটা মিশে গেল। দেবুমামা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেও চোরের বুদ্ধির তারিফ না করে পারেনি।

দেবুমামার মুখে পরের দিন তার চোর ধরার কাহিনী শুনে দয়াময়ী হাসবে, না কাঁদবে, ভেবে পেল না। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে ভেবে, দেবুমামাকে কড়া ধমক দিয়েছিল। মাঝরাতে ছোরা-ছুরির ঘায়ে অপঘাতে মেজদার প্রাণ যাওয়ার চিন্তায়, দয়াময়ীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। দেবুমামার দু'হাত ধরে বলেছিল, মেজদা, দোহাই, এরকম ছেলেমানুষী আর কর না।

দেবুমামার চোর ধরার কাহিনী, ঝড়ের বেগে পরিবারের সকলে জেনে গিয়েছিল। অনেকে মনে রেখেছে। দেবুমামার নৈশ অভিযান ব্যর্থ হলেও সেই রাতের পর থেকে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে চোর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রাণের মায়া, চোরদের কম ছিল না। অন্ধকার রাতে বিশাল একটা শরীরের তলায় চাপা পড়তে তাদের কেউ নিশ্চয়ই রাজি ছিল না। দেবুমামার ওজন ছিল কম করে আড়াই মণ। মারকুটে এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে তার দু'দিকের কণ্ঠার হাড় দেবুমামা ভেঙে দিয়েছিল। আইন দেবুমামার টিকি ছুঁতে পারেনি।

বাড়িতে চোরের উৎপাত কমে গেলেও একতলার দক্ষিণের ঘর ছেড়ে বছর শেষের আগে দেবুমামা চিরদিনের জন্যে চলে গেল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ভিজে ছোলা, আদাকুচো খেয়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে পায়চারি করতে গিয়েছিল। প্রথম পাক শেষ করে, দ্বিতীয় পাক দেওয়ার মাঝপথে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। পার্কে চেনাজানা প্রাতঃভ্রমণকারীরা

দেবুমামাকে বাড়িতে আনার পরে কান্ত ডাক্তার ডাকল। রুগীকে পরীক্ষা করে, হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিল ডাক্তার। ট্যাক্সি নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ী চলে এসেছিল। দয়াময়ীকে দেখে, দেবুমামা বিছানায় শুয়ে। তার যে কিছু হয়নি, পেটের বায়ু থেকে মাথা ঘুরে গেছে, এরকম নানা কথা শোনাচ্ছিল। দেবুমামার সব কথাতে সায় দিলেও তাকে হাসপাতালে পাঠানোর আয়োজন করছিল দয়াময়ী। অ্যাম্বুলেন্সে তুলে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে শুনে দেবুমামা কেঁদে ফেলেছিল। দয়াময়ীকে বলেছিল, অ্যাম্বুলেন্সে আমি যাব না। হাসপাতালে যেতে হলে ট্যাক্সিতে যাব।

শেষ পর্যন্ত তাই রফা হল। দেবুমামাকে চেয়ারে বসিয়ে ট্যাক্সি পর্যন্ত নিয়ে যেতে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের গাট্টাগোট্টা কয়েকজন ছেলে এসে গেলেও তাদের সাহায্য দেবুমামা নিল না। বাড়ি থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত গটগট করে হেঁটে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। দেবুমামার পাশে চন্দ্রনাথ, পেছনে দয়াময়ী। দয়াময়ীর হাতে ক্যাম্বিশের ব্যাগে দেবুমামার লুঙ্গি, ফতুয়া, গামছা, নিমদাঁতন, মাজনের কৌটো, জলের গ্লাস, চিরুনি, আরও টুকিটাকি জিনিস। সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিছানায় দেবুমামা পৌঁছে গেল। চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হয়নি। শেষবিকেলে হাসপাতালে দয়াময়ী এসেছিল তার মেজদাকে দেখতে। একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল মেজদাকে। কথা বলার সুযোগ তাকে দয়াময়ী না দিলেও, দেবুমামা জোর করে দু-একটা কথা বলার সময়ে দয়াময়ীর মনে হয়েছিল, মেজদার হাঁপ ধরছে। কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। দেবুমামার বড়দা, কানাই বোসও খবর পেয়ে দেখতে এসেছিল ছোটভাইকে। দয়াময়ীকে বড়দা বলেছিল, মনে হচ্ছে, ভয়ের কিছু নেই। দু-চারদিন শুয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে।

বড়দার কথাটা দয়াময়ীর শুনতে ভাল লাগলেও মনে সাহস পায়নি। ডাক্তারের ঘর থেকে ডাক পেতে দয়াময়ী সেখানে গিয়েছিল। মায়ের পাশে আমি ছিলাম। দয়াময়ীর হাতে ওষুধের একটা ফর্দ দিয়ে ডাক্তার বলেছিল, রাতে বাড়ির কেউ যেন থাকেন! শুকনো মুখে দয়াময়ী জিজ্ঞেস করেছিল, কোনও বিপদ ঘটতে পারে?

হার্টে এতবড় একটা অ্যাটাকের পরে কিছু কি চট করে বলা যায়?

দয়াময়ী আর প্রশ্ন করেনি। মাকে বলেছিলাম, রাতে হাসপাতালে আমি থাকব। ওয়ার্ডের কাছে এসে দেখলাম, চন্দ্রনাথ এসেছে। সঙ্গে রয়েছে তারাপ্রসাদ।

তারাপ্রসাদকে দেখে জেনে গেলাম, রাতে এখানে আমার থাকা হচ্ছে না। হাসপাতালে রাত জাগার লোক এসে গেছে। পরের দিন কাকভোরে লেবুতলার বাড়িতে দেবুমামার মৃত্যুসংবাদ, তারাপ্রসাদ পৌঁছে দিয়েছিল। মেজদার মারা যাওয়ার খবর শুনে দয়াময়ী পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল।

দেবুমামা মারা যাওয়ার পরে, আরও দশ বছর অঘোরবালা বেঁচেছিল। বিরজাকান্ত ঘোষচৌধুরির ভূসম্পত্তির ভোগাধিকার পেতে হা-পিত্যেশ করে থাকা কান্ত, পান্থ, শীলার বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছিল। ছোট ভাই, শান্ত মারা যাওয়ার পরে ভুবনেশ্বরের চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে পান্থ ফিরে এসেছিল। তিন ভাইবোনের

কেউ অম্বলে, কেউ গেঁটে বাতে ভুগছিল। নবনীতাকে বিয়ে করার মাসখানেক পরে নতুন বৌ নিয়ে অসুস্থ অঘোরবালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এক মজার খেলায় আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। নবনীতার মুখে তার দিদিমার বয়স সাতানব্বই শুনে উননব্বই বছরের শয্যাশায়ী অঘোরবালা বিছানায় উঠে বসেছিল। চকচক করছিল তার দু'চোখ। তার চেয়ে বেশি বয়সের এক বুড়ি এই শহরে বেঁচে আছে, সে নিজের হাতে ছুঁচে সুতো পুরে সেলাই করে, কড়মড় করে চিবিয়ে ছোলাভাজা খায়, শুনে খুশিতে অঘোরবালা বলেছিল, দাঁড়া, তোদের জন্যে কয়েকটা নুচি ভেজে আনি।

বিছানাবন্দী অসুস্থ অঘোরবালাকে আমি ঠেকিয়েছিলাম। মায়ের জন্যে কাপে করে এক দাগ লাল মিকশ্চার নিয়ে দয়াময়ী ঢুকে অঘোরবালাকে বিছানায় বসে হেসে হেসে কথা বলতে দেখে অবাক হয়েছিল। ভেবেছিল, ভেল্কি নাকি! অঘোরবালার দিকে প্রথমে তাকিয়ে, তারপর আম্যর সঙ্গে নবনীতাকে নজর করে চাপা গলায় বলেছিল, বুড়ি একটু আগে শুষছিল। আমি ভাবলাম, আজই শেষ। নাতবৌ পেয়ে দেখছি, চাঙ্গা হয়ে উঠল।

দয়াময়ীর এক মিনিট পরে নবনীতাকে দেখতে মাসি, মামারা ঘরে এল। কান্ত, পান্থ, শীলা ঘরে ঢুকে মুমূর্ষু অঘোরবালাকে বিছানায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে নাতবৌ-এর সঙ্গে গল্প করতে দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিল। কালো হয়ে গিয়েছিল কান্ত, পান্থর মুখ। নতুন বৌ-এর সঙ্গে বিরস মুখে দু-একটা কথা বলে ঘর থেকে তারা বেরিয়ে গিয়েছিল। হতাশায় দুই মামার ভেঙে পড়ার কারণ বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। চিতার দিকে এক পা এগিয়ে, ফের যদি বুড়িটা ফিরে আসে, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ কি? আশ্রিত ভিখিরির মত তাদের বেঁচে থাকতে হবে। মামা, মাসিদের জন্যে দুঃখ হলেও আমার কিছু করার ছিল না। বরং সম্পত্তির লোভে আমার একানব্বই বছরের দিদিমার যারা মৃত্যু কামনা করছে, তাদের ওপর বিরক্ত হচ্ছিলাম। তখনও সেই অভিশপ্ত রাতের ঘটনা ঘটেনি। দয়াময়ীর সংসার তখন আস্ত ছিল। চন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়নি। সংসারের নানা ঘটনাতে মজা খুঁজে পেতাম। মজা করার মত ঘটনা বানিয়ে তুলতেও অসুবিধে হত না। অঘোরবালার অসুখবিসুখে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে নবনীতার সাতানব্বই বছরের দিদিমার সুস্বাস্থ্যের কাহিনী যে জীবনদায়ী ওষুধের কাজ করবে, সেই বিকেলে বুঝে গিয়েছিলাম। অঘোরবালাকে বাঁচানোর গোপন এই টোটকার খবর, নবনীতাকে বলেছিলাম। নবনীতা শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। দয়াময়ীকেও ঘটনাটা আমরা দুজন জানাইনি। দরকার মত অঘোরবালার ওপর সেই টোটকা প্রয়োগ করতে থাকলাম।

পাড়ার ওড়িয়া তেলেভাজাওলার দোকান থেকে বেগুনি, ফুলুরি কিনতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে একানব্বই বছরের অঘোরবালার ঠাণ্ডা লেগে গেল। সর্দিতে ঘড়ঘড় করতে থাকল বুক। জ্বর হল। ব্যারাকপুরে, বড় মেয়ে বীথিকার বাড়িতে গিয়েছিল দয়াময়ী। অঘোরবালার সাধারণ সর্দি-জ্বর হয়েছে, মনে করে প্রথম দিনে তাকে খবর দেয়নি কেউ। অঘোরবালাকে অক্ষয় বট ভেবে আমাদের লেবুতলার বাড়ির কেউ মাথা ঘামায়নি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ সর্দি-জ্বর যে প্রায় নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে

পারে, এ ধারণা কারও ছিল না। শেষ বিকেলে অফিস থেকে ফিরে অঘোরবালার বাড়াবাড়ির খবর শুনে তখনই নবনীতাকে নিয়ে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে চলে গেলাম। ব্যারাকপুর থেকে মেয়ে-জামাই-এর সঙ্গে মায়াপুরে সাহেব-বৈষ্ণবদের মঠ দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিল দয়াময়ী। রাতে সেখানে অতিথিনিবাসে থেকে যাওয়ার কথা। দয়াময়ীকে আনতে দুপুরের আগে মায়াপুর রওনা দিয়েছিল দেবপ্রতিম। নবনীতাকে নিয়ে অঘোরবালার ঘরে ঢুকে দেখলাম তার নাভিশ্বাস উঠেছে। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। অঘোরবালার বালিশের পাশে তামার কোষাকুষি রেখে, সেখান থেকে চামচে তুলে তার মুখে গঙ্গাজল দিচ্ছে কান্তমামা। কান্তমামার পর পান্থমামা দিল। আমাকে দেখে কান্তমামা বলল, ঠিক সময়ে এসে গেছিস। দিদিমার মুখে গঙ্গাজল দে।

অঘোরবালার বিছানার পাশে বসে এক চামচ জল তুলে তার মুখে ঢালতে গিয়ে দেখলাম, ব্যগ্র চোখে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অক্ষিকোটর থেকে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলেও আমার মুখ থেকে সে কিছু শুনতে চায়। অঘোরবালার মনের বাসনা বুঝতে আমার দেরি হয়নি। অঘোরবালার কাছে নবনীতাকে নিয়ে প্রথম আসার পর থেকে গত দেড় বছরে আরও চার-পাঁচবার এখানে এসেছি। আমাদের লেবুতলার বাড়িতে অঘোরবালা কয়েকবার গেছে। নবনীতাকে পেলে তার একটাই প্রশ্ন, তোর দিদিমা কেমন আছে রে নাতবৌ?

নবনীতা ভাল বললে আমি তা দশগুণ বাড়িয়ে বলতাম। অঘোরবালার দু'চোখের হলদেটে জমি খুশিতে ঝিকমিক করত। জিজ্ঞেস করত, সে বুড়ির যেন কত বয়স হল? সাড়ে সাতানব্বই?

নবনীতা থামলে আমি বলতাম, নবনীতার দিদিমা 'সেঞ্চুরি' না করে থামবে না।

সেঞ্চুরি শব্দের মানে আঁচ করলেও অঘোরবালা জিজ্ঞেস করত, কথাটার মানে কি?

একশ।

মানে বলে আমি যোগ করতাম, নবনীতার দিদিমার সঙ্গে তোমাকে কিন্তু পাল্লা দিতে হবে। একশ বছরের আগে তুমি সরে পড়লে শ্বশুরবাড়িতে আমি মুখ দেখাতে পারব না। আমার মান রেখ।

ফোকলা মুখে একগাল হেসে অঘোরবালা বলত, কী যে বলিস, সে বুড়ি কত পুণ্যবতী!

তুমি কম কীসে?

বোস্, তোদের দুটো নুচি ভেজে দিই।

আমি কিছু বলার আগে জিজ্ঞেস করত, নুচির সঙ্গে আলু না বেগুনভাজা? ঘরে পটলও আছে। ভেজে দিতে পারি।

নবনীতা চেষ্টা করেও অঘোরবালাকে 'নুচি' বানানো থেকে আটকাতে পারত না। দেড়মাস আগেও অঘোরবালার হাতের নুচি, বেগুনভাজা আমরা খেয়ে গেছি। অঘোরবালার মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার সঙ্গে তাকে যে কথাটা শোনাতে চাইছিলাম,

বিছানার পাশে দু'মামা, এক মাসি থাকার জন্য বলতে পারছিলাম না। ঘর খালি হওয়ার জন্যে যতটা সম্ভব ধীরে আমি গঙ্গার জলের চামচ খালি করতে চাইছিলাম। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল চামচ থেকে। চামচ খালি হওয়া পর্যন্ত দাঁড়ানোর সময় কান্ত, পান্থর ছিল না। প্রথমে কান্ত, তারপবে পান্থ চলে যেতে ঘর থেকে শীলাও বেরিয়ে গেল। ঘর খালি হতে অঘোরবালার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, নবনীতার দিদিমা জিজ্ঞেস করছিল তোমার কথা।

প্রথমবার বলার পরে অঘোরবালার নাভিশ্বাসের ঘড়ঘড়ানি কমে এল। দিদিমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার দু'চোখের জমির অস্বচ্ছ পর্দা ছিন্নভিন্ন করে মণি দুটোতে আলো ফুটল। কথাটা একটু জোরে আমি দ্বিতীয়বার বলতে জলে ভিজে উঠল অঘোরবালার দুটো চোখ। শ্লেষ্মা-জড়ানো গলায় প্রশ্ন করল, কী বলছিল সে বুড়ি?

তোমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে আসবে। বিছানায় মিশে থাকা অঘোরবালার শরীরে মুহূর্তের জন্য ঢেউ খেলে গেল। জিজ্ঞেস করল, কবে আসবে? কবে?

নিঃশ্বাসের ঘড়ঘড় আওয়াজের সঙ্গে উত্তেজনা মিশে অঘোরবালার গলার স্বর প্রায় বুজে এল। আমি বললাম, দিনটা বলেনি, তবে আসবে।

জবাব শুনে অঘোরবালার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে থাক। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, সে বুড়ি এখন কোথায়?

চন্দননগরে। নবনীতার মাসির কাছে।

আসবে কী করে?

প্রথমে ট্রেনে আসবে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে বাস, মিনিবাস, যা পাবে।

বাসে এখনও উঠতে পারে?

কেন পারবে না?

বুকের ঘড়ঘড়ানি কমে যেতে অঘোরবালার নিঃশ্বাসে কোনও কষ্ট নেই। কান্তমামা ঘরে ঢুকে অঘোরবালার মুখের চেহারা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুপথযাত্রিণী বুড়িটা হঠাৎ কীভাবে এত সতেজ হয়ে উঠল বুঝতে না পেরে ব্যাজার মুখে আমাকে বলেছিল, বড়মামিমাকে বেশি বকাসনি চন্দন। ডাক্তারের বারণ আছে।

কার সাধ্য তখন অঘোরবালার বকুনি থামায়? অঘোরবালা বলছিল, সে বুড়ি এখনও ট্রেনে, বাসে যাতায়াত করে! বলিস কি? সে এখানে এলে তার পায়ের ধুলো নেব!

অঘোরবালাকে আর একটু ঝাঁকুনি দিতে আমি বললাম, নবনীতার দিদিমা রোজ রিকশা চেপে গোঁদলপাড়ার ঘাটে গিয়ে গঙ্গায় চান করে। ফরমাশ খাটার একগণ্ডা লোক বাড়িতে থাকতে নিজের হাতে কলসি থেকে জল গড়িয়ে খায়।

নবনীতার দিদিমার কাহিনী শুনে অঘোরবালা কুঁইকুঁই করে কাঁদতে শুরু করল। কান্নাভেজা গলায় বলল, সে বুড়ি, কত ভাগ্যবতী! তাকে সেবাযত্ন করার কত লোক আছে। আমার কেউ নেই। বাড়িতে যারা আছে তারা আমার মৃত্যু চায়। তাড়াতাড়ি আমি মরলে তাদের হাড় জুড়োয়।

অঘোরবালার বাক্যবাণ এড়াতে কান্ত দৌড়ে ঘর থেকে চলে যেতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে খোঁড়াতে থাকল। কান্না থামিয়ে অঘোরবালা বলল, তোরা, আমার নাতিরাও খোঁজ রাখিস না, দিদিমা বেঁচে আছে, না মরে গেছে।

অঘোরবালাকে থামাতে আমি বললাম, মাসখানেক আগে, মাঝরাতে নবনীতার দিদিমা একটা চোর ধরেছিল।

চোখ দুটো বড় বড় করে অঘোরবালা বলল, বলছিস কি?

ঘটনাটা আমি শোনানোর আগে শীলা ঘরে ঢুকতে, তাকে অঘোরবালা বলল, কোষাকুষি এখানে আর রাখার দরকার নেই। ভাল করে মেজে ঠাকুরঘরে রেখে দে।

কোষাকুষি নিয়ে শীলা ঘর থেকে বেরবার আগে নবনীতাকে অঘোরবালা জিজ্ঞেস করল, কী এনেছ আমার জন্য?

সন্দেশ। নরম পাকের সাদা সন্দেশ।

দাও। আমার খিদে পেয়েছে।

বাক্স খুলে একটা সন্দেশ বার করে সযত্নে দিদিশাশুড়িকে নবনীতা খাওয়াল। অঘোরবালা বলল, আর একটা দাও।

কোষাকুষি হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অঘোরবালার দুটো সন্দেশ খাওয়া দেখে ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল শীলার দু'চোখ। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অঘোরবালার সন্দেশ খাওয়া দেখছিল কান্তমামা। তার মুখে একরাশ ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ছিল। দুটো সন্দেশ শেষ করে কয়েক ঢোক জল খেয়ে অঘোরবালা বলেছিল, রাতে কয়েকটা নুচি, আলুভাজা খাব। মনুর মাকে বললে সে-ই করে দেবে।

কথাটা কানে যেতে দরজার বাইরে দাঁড়ানো কান্ত, কোথায় যে মিলিয়ে গেল, তাকে আর দেখতে পেলাম না। আমি টের পাচ্ছিলাম অঘোরবালাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য দয়াময়ীর তিন পিসতুতো ভাইবোন আমার ওপর চটে যাচ্ছে। আমার কিছু করার ছিল না। জীবনের অদেখা গভীর খেলাতে কলকাঠি নাড়ার সুযোগ ঘটে যাওয়ায় মজা পেয়েছিলাম। আরও দেড়-দু ঘণ্টাবাদে বিছানার ওপর অঘোরবালা সোজা হয়ে বসল। বিকেলের পর থেকে অঘোরবালাকে যে-সব আত্মীয় দেখতে আসছিল, তাদের কেউ কেউ চলে গেলেও বাকিরা তাকে ঘিরে সন্ধে পর্যন্ত বসেছিল। নবনীতাকে নিয়ে আমি যেতে ঘরে ঢুকতে তারা ঘর থেকে বেরবার সুযোগ পেয়েছিল। অঘোরবালার খবর নিতে ঘরের মধ্যে আসা-যাওয়া করছিল কান্ত, পান্থমামা। আমাকে যে তারা পছন্দ করছিল না, বুঝতে পারছিলাম। তাদের নির্বিকার লুকনো ঘৃণা আমার নজর এড়ায়নি। সে ঘটনার পর থেকে অঘোরবালার সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলে দু' মামা, এক মাসি আমার ওপর নজর রাখত। তাদের ধারণা হয়েছিল, অঘোরবালাকে তুকতাক করে আমিই বাঁচিয়েছি। আমাকে পেলে অঘোরবালাও নাকি সুরে নিজের দুর্ভোগের কাহিনী শোনাত। বলত, বুড়ি দিদিমাকে ভুলে তোরা কী করে থাকিস? যমের অরুচি আমি। না হলে কবে মরে যেতুম। আরও কত দুর্গতি আমার কপালে আছে, কে জানে!

অঘোরবালাকে সান্ত্বনা দিতে আমি বলতাম, কোন দুঃখে মরবে তুমি? তোমার চেয়ে সাত বছরের বড় নবনীতার দিদিমা যদি বেঁচে থাকতে পারে, তুমি কেন পারবে

না? তার তুলনায় তুমি তো যুবতী!

দিদিশাশুড়ির কথা আমি তুললেই অঘোরবালা চনমনে হয়ে উঠত। তারপর সেই বুড়ির সম্পর্কে শুরু করত হাজার প্রশ্ন। নবনীতার দিদিমা সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠে, রাতে কী খায়, একাদশীতে কী খায়, কী পরে, স্মৃতি কেমন, বই পড়তে চশমা লাগে কিনা, হাঁটার সময় কতটা কুঁজো হয়, অঘোরবালার প্রশ্ন ফুরতে চাইত না। মাঝে মাঝে আমি ক্লান্ত বোধ করতাম, বিরক্ত হতাম। সোনার কৌটোয় বন্দী সেই মৌমাছিটাকে বার করে একটা একটা করে পা, পালক, মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলে মজার খেলাটা শেষ করে দিতে চাইতাম। পারিনি। শেষ পর্বটা বলতে শুরু করে মাঝপথে থেমে গেছি কয়েকবার। নবনীতার দিদিমা যে আটানব্বই ছোঁয়ার আগে মারা গেছে, বলতে গিয়ে থেমে গেছি। কথা ঘুরিয়ে নিয়েছি। প্রথমদিনে, শুরুতে বলেছিলাম, নবনীতার দিদিমার শরীর ভাল নয়।

আঁতকে উঠে অঘোরবালা প্রশ্ন করেছিল, কী হয়েছে?

তেমন কিছু নয়। শরীর একটু খারাপ।

কাঁপা কাঁপা গলায় অঘোরবালার প্রশ্ন ছিল, খারাপ কেন? রোগটা কী?

জ্বর।

বিছানা নিয়েছে?

এতটা নয়।

তবে?

দাঁত উঠছে। বত্রিশটা দাঁতের যে দুটো পড়ে গিয়েছিল, সে দুটো আবার গজাচ্ছে।

খিলখিল করে হেসে উঠে অঘোরবালা প্রায় গড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিল, পোড়া কপাল আমার! নাতবৌকে বলিস ঘটা করে দিদিমার মুখে ভাত দিতে। আমাকে যেন নেমন্তন্ন করে। আমি যাব।

আমি আর কথা বাড়াইনি। নবনীতার দিদিমার কাহিনী শুনিয়ে অঘোরবালার সঙ্গে আমার খেলাটা যে বিপজ্জনক খাদের দিকে চলে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিলাম। অঘোরবালার সঙ্গে দেখা হলে আমি যে দিদিশাশুড়ির গল্প শোনাই, দয়াময়ী জেনেছিল। দয়াময়ী একদিন বলেছিল, নবনীতার দিদিমার কথা উঠলে মা আর থামতে চায় না। এত গল্প কেন শোনাস?

হাসিমুখে দয়াময়ী কথাটা বললেও আমি দমে গিয়েছিলাম। কাজটা যে ঠিক হচ্ছে না, বেশি করে অনুভব করলাম আরও কয়েকদিন পরে। অফিস থেকে বেরিয়ে ধর্মতলায় নবনীতার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সিনেমার দুটো টিকিট ছিল পকেটে। নতুন বৌ নিয়ে ছবি দেখার দিনগুলো তখনও ফুরোয়নি। রাস্তার ভিড়ের ওপর চোখ রেখে ঘাড় সোজা করে জিরাফের মত দাঁড়িয়েছিলাম। নবনীতা কোনওভাবে নজরের আড়ালে চলে গেলে, জনস্রোতের ভেতর তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হতে পারে। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ এক চেনা মুখ, কান্তমামাকে দেখতে পেলাম। কান্তমামার পাশে এক মহিলা, ষাটের কাছাকাছি বয়স, ভিড়ের ঠেলা এড়িয়ে দুজন ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটছে। গম্ভীর, ভাঙাচোরা দুটো মুখ, কেউ কথা বলছে না। চাকরি-করা এক মহিলার সঙ্গে কান্তমামার সম্পর্কের কথা কানাঘুষোয় শুনলেও বিশ্বাস করিনি। কোমরে গামছা

জড়িয়ে জ্বলন্ত বিড়ি ঠোঁটে চেপে, অ্যালুমিনিয়ামের গাড়ু হাতে যে লোকটা সকালে পায়খানায় যায়, সে প্রেম করতে পারে, বিশ্বাস হয়নি। পঁচিশ বছর আগে শোনা গল্পটা যে মিথ্যে ছিল না, বুঝতে প্রেমিকার সঙ্গে কান্তমামাকে নিজের চোখে দেখতে হল। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের প্রেম তখনও পাকেনি। বিয়ে না হলে পাকবে কী করে? অঘোরবালার মরার জন্য অপেক্ষা করে কান্ত আর তার প্রেমিকা বুড়ো হয়ে গেলেও প্রেম পাকল না। প্রেম কি আর আছে? জানি না। পেকে গিয়ে হয়তো দরকচা পাকিয়ে গেছে। শান্ত মারা যাওয়ার পরে, অঘোরবালার মরার অপেক্ষায় না থেকে প্রেমিকাকে কান্ত বিয়ে করে সংসার পাততে চেয়েছিল। দাদার বিয়েতে পান্থ গররাজি না থাকলেও শীলা বেঁকে বসেছিল। তার বিয়ে না দিয়ে বাড়িতে কোনও দাদা বৌ আনলে, সে কেলেঙ্কারি করার ভয় দেখিয়েছিল। শীলাকে বোঝাতে দয়াময়ীকে ধরেছিল কান্ত। দয়াময়ীর চেষ্টাতে দাদার বিয়েতে প্রথমে মত দিয়েও শীলা পরে বেঁকে বসে। বিয়ে ভেস্তে যায়। কান্তমামা এখন সারাদিন একচোখে ঠুলি লাগিয়ে বিকল ঘড়ির স্তূপে ডুবে থাকে। হারিয়ে যাওয়া ত্রিশ বছরকে ঘড়ির খোলের মধ্যে হয়ত খুঁজে বেড়ায়।

শেষ বিকেলের নিস্তেজ আলোয় ষাট পেরনো একজন পুরুষের সঙ্গে পঞ্চাশের শেষ কিনারে ঠেকা তার প্রেমিকাকে দেখে ব্যথায় চিনচিন করছিল আমার বুক। অঘোরবালার সঙ্গে খেলা শেষ করতে চেয়েছিলাম আমি। তখনই একদিন নবনীতার দিদিমা সজ্ঞানে স্বর্গে চলে গেল। আটনব্বই বছরে পা দিয়েছিল আমার দিদিশাশুড়ি। অল্পের জন্যে 'সেঞ্চুরি' করতে পারল না। অঘোরবালাকে দিদিশাশুড়ির মারা যাওয়ার খবর না দেওয়ার কথা দয়াময়ীকে বলতে গিয়েও আমি পেছিয়ে এসেছিলাম। মৃত্যুসংবাদ নিয়ে লুকোছাপা, দয়াময়ী আদৌ পছন্দ করবে কিনা, আমার সন্দেহ ছিল। দিন পনের পরে নবনীতাকে নিয়ে অঘোরবালার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। বাড়ি থেকে বেরনোর আগে নবনীতা বলেছিল, আমার দিদিমার মারা যাওয়ার খবর ওনাকে দিও না।

নবনীতার কথা শুনে আমি কিছু বলিনি। ট্যাক্সিতে বসে নবনীতা আবার খবরটা চেপে যাওয়ার কথা বলতে আমি বললাম, দেব।

এত নিষ্ঠুর হোয়ো না।

খবরটা না জানানো আরও বড় নিষ্ঠুরতা।

মানে?

ও বাড়ির অনেকগুলো মানুষের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

নব্বই বছরের একজন বৃদ্ধা বেঁচে থাকলে কার কী ক্ষতি হয়?

কান্তমামা বিয়ে করতে পারছে না।

দাদার বৌকে শীলামাসিই তো বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

আমি কথা বললাম না। দিন শেষ হয়ে কুয়াশার মত সন্ধে ছড়িয়ে পড়ছিল। নাতি-নাতবৌকে দেখে অঘোরবালা বেজায় খুশি হল। বলল, কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম গো?

আমার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে এরকম সুখের মুহূর্তটা নষ্ট না করার জন্যে নবনীতা অনুরোধ করল। নবনীতার শব্দহীন অনুরোধ এড়ানো আমার পক্ষে

সম্ভব ছিল না। চিড়ে ভেজে আমাদের খাওয়াতে অঘোরবালা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। দিদিশাশুড়িকে ঠেকাতে নবনীতা বলছিল, গরম সিঙাড়া আর সন্দেশ নিয়ে এসেছি।

রাখ তোমার সিঙাড়া।

নিস্তব্ধ বাড়ি। বাইরের দালান থেকে আমার ওপর নজরদারি করার কেউ ছিল না। কান্তর বিয়ে ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার পর তিন ভাইবোন যেন বুঝে গেছে, তাদের জীবনে নতুন কিছু ঘটবে না। অঘোরবালার চালচলনে আমি অবাক হচ্ছিলাম। নবনীতাকে নিয়ে আমি এলে দু-চার কথার পরে যে মানুষটা আমার দিদিশাশুড়ির খবর জিজ্ঞেস করত, সেই বিষয় কেন সে এড়িয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলাম না। বাঁচার ঘোরটা অঘোরবালার মাথা ছেড়ে চলে গেছে ভেবে, নবনীতার দিকে না তাকিয়ে বলে ফেললাম, খারাপ খবর আছে একটা। আমার দিদিশাশুড়ি গত মাসে হঠাৎ চলে গেলেন।

খবরটা শুনে অঘোরবালা শান্ত গলায় বলল, জানি। তোর মা এসেছিল। সে বলেছে।

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। নবনীতার কাঁধে হাত রেখে অঘোরবালা বলল, এক দিদিমা চলে গেলেও আর এক দিদিমা এখানে বসানো রইল। মাঝে মাঝে এসে দেখে যেও।

আমি অবাক হয়ে অঘোরবালাকে দেখছিলাম। আরো অবাক হয়েছিলাম দয়াময়ীর আচরণে। অঘোরবালাকে যে খবর শোনাতে ছ'মাস আমি সময় নিয়েছি, কতো সহজে আমার আগে দয়াময়ী তা জানিয়ে দিয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে অঘোরবালা বলল, তোর দিদিশাশুড়ির সমবয়সী না হয়ে আমি মরছি না। আরও পাঁচ বছর আমার পাওনা আছে। পাওনা উসুল করে, তারপর যাবো।

অঘোরবালার পাওনা কে মেটাবে, তাকে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলাম না। নবনীতার আনা গরম সিঙাড়া খাওয়ার আধঘণ্টা পরে, অঘোরবালার হাতে তৈরি বাদাম, নুন, মরিচ মেশানো, ধোঁয়া ওড়া চিঁড়ে ভাজা খাওয়ার সময়ে জানতাম না, 'পাওনা উসুল' না করে পৃথিবী ছেড়ে অঘোরবালাকে চলে যেতে হবে। বছর শেষ হওয়ার আগে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের শ্বশুরের ভিটে থেকে অঘোরবালা চিরবিদায় নিয়েছিল।

পিতৃপক্ষের সকালে গঙ্গার ধারে ভিজে বাতাসে অঘোরবালার হেঁশেলের হিংয়ের গন্ধ পেলাম। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে কাছাকাছি কোথাও অঘোরবালা কি কচুরি ভাজতে বসল?

আঠার

মা, জন্মভূমির মধ্যে তোমাকে কখনও খুঁজতে চেষ্টা করিনি। স্বর্গের সঙ্গে কখনও মেলাতে যাইনি চন্দ্রনাথ সেনকে। স্বর্গ দেখার সুযোগ আমার ছিল না। মা, তোমাকে দেখেছিলাম, বাবাকে দেখেছিলাম। দেবভূমি স্বর্গের চেয়ে তোমরা যে পূজ্যতর, তখনই বুঝতে না পারলেও সময়ের ব্যবধান যত বেড়েছে, তত বেশি করে অনুভব করেছি।

চন্দ্রনাথ সেন মারা যাওয়ার পরে, পাঁচ বছর ধরে বারবার চেষ্টা করে যে কথাটা তোমাকে বলতে পারিনি, আমার সেই অকথিত কাহিনীকে তুমি অবান্তর করে দিয়েছিলে। দয়াময়ী মারা যাওয়ার একমাসের মধ্যে সে কাহিনীর কোনও দাম থাকল না। নতুন সত্যের মুখোমুখি আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মৃত দয়াময়ী, আমার পাপমুক্তি ঘটিয়েছিল। আমার শরীর-মনে সাপের মত জড়িয়ে থাকা গ্লানি খসে পড়েছিল। আমি পরিশুদ্ধ হয়েছিলাম।

শরতের শুরুতে সেদিন মাঝদুপুরে ঘনঘোর করে বর্ষা নামলেও সকালের দিকটা আকাশে, মেঘ রোদ্দুর পাশাপাশি ছিল। দরকারি কাজ সারতে চেতলা থেকে শিয়ালদায়, ব্যাঙ্কের দরজায় বেলা সাড়ে এগারটায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। ভ্যাপসা গরমে ঘেমে উঠেছিল শরীর। ট্রাম, বাস, রাস্তাতে হাঁসফাঁস করছিল মানুষ। বোঝা যাচ্ছিল, বৃষ্টি হবে। বৃষ্টিতে ভেসে যাবে চারপাশ। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছে, কাচের দরজা ঠেলে বাতানুকূল ব্যাঙ্কে ঢোকার আগে, কাঁধের ঝোলায় রাখা কাগজপত্র আরও একবার দেখে নিতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বুকের সামনে ঝোলাটা এনে, ঝোলার মুখ খুলে ভেতরে নজর চালালাম। বই, কাগজপত্রের মাঝখানে নীল প্লাস্টিকের প্যাকেটে পনের হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট, পাসবই, অন্য সব কাগজ ঠিকমত ছিল। কাগজপত্রের মধ্যে ছিল দয়াময়ীর ডেথ সার্টিফিকেটের অনুলিপি, শ্রাদ্ধের চিঠি, আমার আত্মপরিচয়জ্ঞাপক রেশনকার্ড এবং আরও কিছু নথি। ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেটটা সাতদিন আগে পেয়েছিলাম। তার আগের হপ্তায় এক দুপুরে দয়াময়ীর অস্থাবর সম্পত্তি যা ছিল, আমরা ছ'ভাইবোন ভাগ করে নিয়েছিলাম। মধ্যবিত্ত পরিবারের তিয়াত্তর বছরের বিধবার আর কত সম্পত্তি থাকতে পারে? তবু যা ছিল, কম নয়। চন্দ্রনাথ সেন মারা যাওয়ার পরে কিছু টাকা পেয়েছিল দয়াময়ী। বৈধব্যজীবন শুরুর অল্পদিনের মধ্যে নিজের যা গয়না ছিল, বিক্রি করে দিয়েছিল। গয়না বিক্রির টাকা কিছুটা ব্যাঙ্কে রেখে বাকি টাকা দিয়ে সরকারি সঞ্চয় সার্টিফিকেট কিনেছিল। হিসেবি এবং মিতব্যয়ী ছিল দয়াময়ী। জমানো টাকা চার ছেলে, দু'মেয়েকে সমানভাবে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিল। পনের হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের উত্তরাধিকার সরাসরি আমাকে দিতে, আমার সঙ্গে যৌথ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। আমার পাঁচ ভাইবোনের জন্যে একই ব্যবস্থা করেছিল। দয়াময়ীর কাজকর্ম ছিল নিখুঁত। আলমারিতে, ছয় ছেলেমেয়ে, প্রত্যেকের নাম লেখা, আলাদা বাদামি খামে রাখা ছিল তার ভাগের কাগজপত্র। আমি জানতাম, আমার সঙ্গে দয়াময়ীর যৌথ ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট ভাঙাতে অসুবিধে হবে না। শুধু আমি কেন, পাঁচ ভাইবোন, সকলে জানত।

ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দরকারি কাগজগুলো পরখ করে, ব্যাঙ্কে ঢুকে অ্যাকাউন্ট্যান্ট অমল করের টেবিলের সামনে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম। লেজার খাতা থেকে চোখ তুলে আমাকে দেখে অমলের ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে গিয়েছিল। বলেছিল, বসুন।

দয়াময়ীর সঙ্গে যৌথ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়ে পনের হাজার টাকা তুলে নেওয়ার জন্যে কাল এলেও দরকারি কিছু কাগজ সঙ্গে না থাকায় টাকা পাইনি। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, শ্রাদ্ধের চিঠি না আনার অছিলাতে আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা অমল

ধরে রাখতে চাইছে। নানা কথা বলে সে বোঝাতে চাইছিল, মাতৃস্মৃতি এভাবে মুছে ফেলার আগে আরও একবার ভেবে দেখা উচিত। চেতলাবাসী কারও পক্ষে শিয়ালদায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালু রাখা যে সম্ভব নয়, আমি বলতে পারিনি। জমা টাকা তুলে, অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে আমানতকারী চলে গেলে সব ব্যাঙ্কই ক্ষুণ্ণ হয়। অমলও হয়েছিল। আমার কিছু করার ছিল না। অমলের সঙ্গে দয়াময়ীর সম্পর্ক ছিল চন্দ্রনাথের আমল থেকে। দয়াময়ীর নামে অ্যাকাউন্ট খুলিয়েছিল চন্দ্রনাথ। দয়াময়ীকে 'মাসিমা' বলে অমল ডাকত। কণ্ঠস্বরে সম্ভ্রম মিশে থাকত। দু'বছর আগে দয়াময়ীর সঙ্গে যৌথ অ্যাকাউন্ট খুলতে এসে তার কাছ থেকে আমিও কম খাতির পাইনি। সবটা দয়াময়ীর জন্যে বুঝতে পারছিলাম। আমার সঙ্গে হেসে হেসে অমল কথা বলেছিল। সুদের টাকার অঙ্ক, নিজের পাসবই-এ তুলতে প্রতি তিন মাস অন্তর দয়াময়ী একবার ব্যাঙ্কে আসত। সামনের চেয়ারে তাকে বসিয়ে অমল সব কাজ করে দিত। দয়াময়ী চেক কেটে বসে থাকলে, তার কাছে টাকা এসে যেত। দয়াময়ীর পাসবই, চেকবই, ডেথ সার্টিফিকেট নাড়াচাড়া করতে করতে কাল এসব কথা অমল বলেছিল, মায়ের সঙ্গে ছেলের যৌথ অ্যাকাউন্ট কম কথা নয়। বলা যায়, মাতৃস্মৃতি, যতদিন পারেন রেখে দিন। মা-বাবার আশীর্বাদ ক্রমশ বাড়তে থাকবে।

অমলের কথাতে ফিকে যন্ত্রণায় টনটন করছিল আমার বুক। বলেছিলাম, রাখার ইচ্ছে তো ছিল, পারলাম কই!

অমল কথা বাড়ায়নি। বলেছিল, কাগজপত্র রেখে যান, টাকা কাল পেয়ে যাবেন। শ্রাদ্ধের চিঠিটা নিয়ে আসবেন।

ব্যাঙ্ক থেকে আমি ফিরে এসেছিলাম। পরের দিন আমি যে টাকাটা সত্যি তুলে নেব, অমল ভাবতে পারেনি। আমাকে দেখে সে গম্ভীর হয়েছিল। আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে, বসতে বলে, লেজার খাতায় মুখ গুঁজেছিল। লেজার খাতায় টুকটুক করে টাকার অঙ্ক লিখে যাচ্ছে। আমাকে সামনে বসিয়ে রেখেছে, খেয়াল নেই। আমিও চুপ। আগের দিন দুপুরে অমলের মুখে 'মাতৃস্মৃতি' শব্দটা শোনার পর থেকে আমার বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ করছিল। তখনই আমি যেন প্রথম টের পেলাম, দয়াময়ী নেই, এক মাস আগে মারা গেছে। দয়াময়ীকে যে কথাটা বলার ছিল, বলা হয়নি। চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর থেকে পাঁচ বছর ধরে বলার সুযোগ খুঁজেছি। হাতের কাছে সুযোগ এসেও সরে গেছে। বলার আগের মুহূর্তে, কখনও সেখানে কেউ এসে যেত, কখনও দরকারি কাজে দয়াময়ী উঠে পড়ত।

চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে দয়াময়ী যে সুখে ছিল না, আমি জানতাম। চন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই যৌথ সংস্কারের বাঁধন আলগা হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রনাথ চলে যেতে বাঁধনের সুতো পর্যন্ত বাতাসে মিলিয়ে গেল। লেবুতলার বাড়ি থেকে আমি, বড়দা, নিজের নিজের ঠিকানায় চলে গেলেও পৈতৃক ভিটে খালি ছিল না। নতুন মানুষ এসে গিয়েছিল সেখানে। দেবপ্রতিমের ছেলে ভিক্টর স্কুলে যেতে শুরু করেছিল। নাতি-নাতনিদের অন্ধের মত দয়াময়ী ভালবাসত। নিজের ছয় ছেলেমেয়ের মত করে ভিক্টর আর আমার মেয়ে চুমকিকে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করে দয়াময়ী হাঁটতে শিখিয়েছিল। আমাদের স্বাবলম্বী করতে দয়াময়ীর যেমন চেষ্টার অন্ত ছিল না, তেমনি আমরা সংসারী

হওয়ার পরে তার মনে কোথাও অভিমান জন্মেছিল। স্বাবলম্বী ছেলেদের সংসারের দিকে তাকিয়ে হয়ত ভাবত, তারা কেন আগের মত মা-নির্ভর নয়? তারা কেন স্বাধীন হয়ে তার সংসার ছেড়ে আলাদা সংসার পাতল? স্নেহ দিয়ে, শাসন করে, লেখাপড়া শিখিয়ে, তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে দয়াময়ী যে নিজে উৎসাহ দিয়েছে, একথা সে ভুলে যেত। তাকে কথাটা মনে করানোর কেউ ছিল না। আমি কখনও-সখনও দয়াময়ীকে যতটা সহজ করে সম্ভব, কথাটা বলতাম। দয়াময়ী বুঝত না, এমন নয়। বেশি লেখাপড়া না শিখলেও দয়াময়ীর বাস্তববোধ ছিল প্রখর। তার ছেলেমেয়েরাও যে পঁচিশ বছর পরে নিজেদের ছেলেমেয়ের সংসারের দিকে তাকিয়ে অভিমানী হয়ে উঠবে, দয়াময়ী জানত। তবু অর্থহীন অভিমান তাকে ঘিরে থাকত। কষ্ট পেত। চন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই সংসার সম্পর্কে সে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। স্বামী মারা যেতে নিজের মধ্যে আরও গুটিয়ে গেল। চন্দ্রনাথের হেঁশেল থেকে বেরিয়ে এসে দোতলায় নিজের ঘরে রেঁধে খাওয়া শুরু করেছিল পাঁচ বছর আগে। রান্নার যৎসামান্য আলাদা আয়োজন করেছিল। প্রাইমাসের কেরোসিন স্টোভ ছিল একটা। ছোট একটা হিটারও ছিল। পারতপক্ষে হিটার ব্যবহার করত না। খুব দরকার হলে দুই ছেলেকে লুকিয়ে করত। স্টোভে রেঁধে স্বস্তি পেত। তবু ইলেকট্রিক বিল বেশি এলে দুই ছেলে দুষত দয়াময়ীকে। দু'ছেলে আধাআধি করে ইলেকট্রিক বিল জমা করার আগে প্রায়ই মাকে গঞ্জনা করত। তাদের মধ্য রেযারেষিও কম ছিল না। বাড়িতে অশান্তি লেগে থাকত। তাদের কলহে মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়তে হত দয়াময়ীকে। কারও অন্যায় দেখলে ছেড়ে কথা বলত না। তার স্বভাবে একচোখমি ছিল না। স্পষ্টবাদী, ন্যায়পরায়ণ ছিল। ছেলেদের বকাঝকা করলেও তাদের বিপদে বুক দিয়ে আগলাত। তবু দয়াময়ী একা হয়ে যাচ্ছিল, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল সংসার থেকে। অল্পে ধৈর্য হারাচ্ছিল, অস্থিরতা বাড়ছিল। যোধপুর পার্কে বড় ছেলে অরিন্দমের ফ্ল্যাটে অথবা চেতলায় আমার ফ্ল্যাটে দশ-পনের দিনের জন্যে গিয়ে তিন-চারদিনের বেশি থাকতে পারত না। লেবুতলায়, নিজের বাড়িতে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। বহুজাতিক সংস্থায় উঁচুপদে চাকরি করে বড় ছেলে অরিন্দম। এয়ারকন্ডিশন করা বিশাল ফ্ল্যাটে থাকে। ফ্ল্যাটের জানলা-দরজা সব সময় বন্ধ, ভেতরে হাওয়া খেলে না, জানলা খুলে আকাশ দেখার সুযোগ নেই। অরিন্দমের ফ্ল্যাটে ঢুকলে দয়াময়ীর দম বন্ধ হয়ে আসত। শাশুড়ির কথাতে তোলা হাঁড়ির মত হয়ে যেত অরিন্দমের বৌ সুপর্ণার মুখ। অস্বস্তি বোধ করত দয়াময়ী। লেবুতলার বাড়িতে পালানোর সুযোগ খুঁজত। তাকে আটকে রাখতে অরিন্দম, সুপর্ণা জেদাজেদি করত না। নিজের গাড়িতে তুলে, ড্রাইভার দিয়ে লেবুতলায় পাঠিয়ে দিত। স্বামীর ভিটেতে ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত দয়াময়ী। চেতলায় আমার বাড়িতে এলে একই অসুবিধে অন্যভাবে ঘটত। আমার ছিমছাম সাজানো, পরিচ্ছন্ন সাতশ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটে জায়গার অভাব, দয়াময়ীকে কষ্ট দিত। ফ্ল্যাটের সব দরজা-জানলা খুলে রেখেও দয়াময়ী যথেষ্ট হাওয়া পেত না। চারপাশের লম্বা লম্বা ফ্ল্যাট বাড়ির যে কোনও বারান্দায় দাঁড়ালে আমার শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, কলঘর, এমনকি কমোড পর্যন্ত দেখা যায়। আব্রু বজায় রাখতে ফ্ল্যাটের সব দরজা-জানলাতে ভারি পর্দা ঝোলাতে হয়েছে। আমার ফ্ল্যাটের যে কোনও জানলাতে ভারি পর্দা ঝোলাতে হয়েছে। আমার যে কোনও জানলা,

একচিলতে বারান্দায় দাঁড়ালে পাশের বাড়ির রান্নাঘর, কলঘর, রং ওঠা দেওয়াল ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। কসরত করে আকাশ দেখতে হয়। তবু চেতলার ফ্ল্যাটে এলে দয়াময়ীকে অনেক হাসিখুশি দেখাত। আমার সাত বছরের মেয়ে চুমকির সঙ্গে খেলায় মেতে উঠত। ঠাকুমার গলা জড়িয়ে, তার কোলে বসে চুমকি গল্প শোনার জন্য আবদার করত। নাতনির সান্নিধ্য দয়াময়ী উপভোগ করত। গল্পের ঢল নামত তার মুখে। আমার বৌ, নবনীতার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করে কয়েকদিন খোশমেজাজে থাকত। আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে, কেমন আছে, খবরাখবর দিত। নবনীতাও শুনতে ভালবাসত। সকলের সঙ্গে দয়াময়ী যোগাযোগ রাখার জন্যে লেবুতলার বাড়িতে অতিথি আসার কামাই ছিল না। দয়াময়ীর সঙ্গে রোজ কেউ না কেউ দেখা করতে আসত। পালঙ্কের ওপর নিজের পাশে বসিয়ে তার সংসারের খোঁজখবর করত দয়াময়ী। দুঃস্থ আত্মীয়দের গোপনে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করত। গল্পের ঝোঁকে নবনীতাকে বলত, অরিন্দমের বাড়ির আদব-কায়দা আলাদা। প্রায় রাতে তারা বাড়িতে খায় না। ক্লাবে খায়, পার্টিতে খায়। অরিন্দমের ফ্ল্যাটটা, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ক্লাবঘর। অরিন্দম, সুপর্ণা, এমনকি তাদের ছেলেমেয়ে, সকলে সেখানে বাইরের লোক, যেন বেড়াতে এসেছে। দু-তিন দিনের বেশি সেখানে থাকলে, আমার হাঁপ ধরে। লেবুতলায় ফিরে শান্তি নেই। আমাকে দেখলে দেবপ্রতিম, তুলিকা গম্ভীর হয়ে যায়। ভাবে, বুড়িটা আবার জ্বালাতে এল।

আমাকে এসব কথা দয়াময়ী বলেনি। বলেছিল, নবনীতা। মেজ ছেলে, মেজ বৌমার গম্ভীর হওয়ার কারণও নবনীতাকে দয়াময়ী বলেছিল। দয়াময়ীর ঘরে দেবপ্রতিমের ছেলে ভিক্টর লেখাপড়া করত। দয়াময়ী আপত্তি করেনি। চোখের সামনে সকাল-সন্ধে তের বছরের নাতিকে বই-খাতা খুলে লেখাপড়া করতে দেখে খুশি হয়েছিল। পেটের ছেলের চেয়ে নাতি কম নয়। ছেলে-মেয়ের চেয়ে নাতি-নাতনির আদর বেশি। ঠাকুমার ঘরে নাতি যদি দু'বেলা বসে লেখাপড়া করতে চায়, তার চেয়ে আহ্লাদের কথা কী হতে পারে। ভিক্টরের পড়ার টেবিল-চেয়ার রাখার জায়গা করে দিয়েছিল দয়াময়ী। দয়াময়ীর ঘরে তারপর ঢুকল ভিক্টরের বইয়ের আলমারি। দয়াময়ীর সঙ্গে কথা না বলে, তার ঘরে ছেলের সঙ্গে ধরাধরি করে আলমারি ঢুকিয়ে দিয়েছিল দেবপ্রতিম। দয়াময়ী চুপ করে দেখেছিল। কিছু বলেনি। কাচের আলমারির চারটে তাকের একটায় ভিক্টরের বই, বাকি তাক খালি। তিনটে খালি তাক ধীরে ধীরে দেবপ্রতিমের ফাইল, কাগজপত্রে ভরে গেল। কী ঘটতে চলেছে, দয়াময়ী বুঝেছিল। দেবপ্রতিমকে এক সকালে ডেকে বলেছিল, আমার ঘরে আর কিছু ঢোকাসনি।

মানে?

চলাফেরা করতে অসুবিধে হচ্ছে।

ভিক্টরের এখানে পড়া বন্ধ করতে চাও?

ও যেমন পড়ছে, পড়বে। নতুন কোনও আসবাব ঘরে ঢোকাতে চাই না।

রেগে টং হয়ে দেবপ্রতিম যে ইংরেজি শব্দটা উচ্চারণ করেছিল, মানে না জানলেও সেটা দয়াময়ী মনে রেখেছিল। তার ঘরে দু'দিন ভিক্টর পড়তে ঢুকল না। নাতিকে তৃতীয় দিন সকালে দয়াময়ী, নিজে ডেকে নিল। ঠাকুমার ডাক পাওয়ার অপেক্ষা

করছিল ভিক্টর। একলাফে দয়াময়ীর ঘরে ঢুকে সে পড়তে বসে গেল। তার মা-বাবা একটা কথা বলল না। স্কুলের সময় হতে চেয়ার ছেড়ে ভিক্টর যখন উঠল, দয়াময়ী জিজ্ঞেস করেছিল, দাদুভাই 'উইচ' মানে কী?

ঠাকুমার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে ভিক্টর বলেছিল, ডাইনি।

দয়াময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভিক্টর জিজ্ঞেস করেছিল, 'উইচ' কথাটা তুমি কোথা থেকে শিখলে ঠাম্মা?

তোমার বাবার কাছ থেকে।

অবাক হয়ে ঠাকুমাকে দেখছিল ভিক্টর।

কথোপকথন সমেত ঘটনাটা নবনীতার কাছে শুনে আমি বলেছিলাম, আমাকে না জানালেই পারতে!

তুমিই তো জানতে চাইলে মায়ের খবর।

আমি আর কথা বাড়াইনি। দয়াময়ীর সঙ্গে দেবপ্রতিমের খিটিমিটি ঝগড়া অনেকদিন আগে থেকে চললেও মাকে 'ডাইনি' বলার সাহস চন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে তার হয়নি। চন্দ্রনাথের সঙ্গে দয়াময়ীকে সমান সমীহ করে বাড়ির সবাইকে চলতে হত। সংসার খরচের পাই-পয়সা পর্যন্ত চন্দ্রনাথ দিত। চন্দ্রনাথের বড় ছেলে, অরিন্দম মোটা মাইনের চাকরি করলেও সংসারের জন্যে মাসকাবারি টাকা দিতে গিয়ে বিফল হয়েছিল। চন্দ্রনাথ বলেছিল, ব্যাঙ্কে নিজের নামে রেখে দাও। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

অরিন্দমের বিয়ের পরে, এমনকি দু'ছেলেমেয়ে হওয়ার পরে, পুরনো নিয়ম বহাল থাকল। বাবার হোটেলে মিনিমাগনা থাকাতে চন্দ্রনাথের ছেলেরা অভ্যস্ত হয়ে গেল। ছেলেদের টাকা না নেওয়াটা ছিল চন্দ্রনাথের অহমিকা। ঘনিষ্ঠদের কাছে চন্দ্রনাথ বলত, মা-বাবা ছাড়া সারাজীবনে কারও কাছে হাত পাতিনি। ছেলেদের কাছে পাতব কেন? আমার রোজগেরে ছেলেরাও নিখরচায় আমার কাছে থাকে।

কথাটা বলার সময়ে বাড়তি আত্মগরিমা ফুটে উঠত তার মুখে। নানা জায়গা ঘুরে চন্দ্রনাথের মন্তব্য ছেলেদের কানে একটু বাঁকাভাবে গিয়ে পৌঁছত। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে লেবুতলার বাড়িতে সাত-আট বছর ফোকটে কাটিয়ে অফিসের ফ্ল্যাটে অরিন্দম যখন চলে গেল, দেবপ্রতিমের বিয়ে তখন দু'বছরের পুরনো হয়ে গেছে। তার ছেলে ভিক্টরের বয়স পাঁচ মাস। বাতাসে ভেসে তার কানে চন্দ্রনাথের কথাটা আগে এসে পৌঁছলেও অরিন্দম বাড়ি থেকে চলে যেতে তার আত্মসম্মান জেগে উঠল। চন্দ্রনাথের হাতে দেড়শ টাকা গুঁজে দেওয়ার জন্য সকাল-সন্ধে সে এমন ঘ্যানঘ্যান করতে থাকল, যে, সে টাকা নিতে তিতিবিরক্ত চন্দ্রনাথ বাধ্য হল। আড়াই জনের রাহাখরচ বাবদ, মাসে দেড়শ টাকা সংসারে দিয়ে দেবপ্রতিমের দেমাক প্রায় আকাশ ছুঁয়েছিল। হেঁশেলে খাবারের ভাগবাঁটোয়ারায় সে নাক গলাতে শুরু করল। সংসারে দেড়শ টাকা দেওয়ার জন্যে আইনত রুই মাছের সবচেয়ে বড় তিনটে পেটি যে তাদের তিনজনের প্রাপ্য, রাঁধুনিকে জানিয়ে দিয়েছিল। ভিক্টরও ততদিনে ভাত খেতে শুরু করেছে। রান্না করা মাছের সাইজ মাপতে দেবপ্রতিম একদিন নিজের ঘর থেকে মাপার ফিতে নিয়ে এসেছিল। বাড়িতে ডিমের ডালনা হলে সবচেয়ে বড় তিনটে ডিম রাঁধুনিকে দিয়ে সে খুঁজে বার করে আলাদা করে রাখতে ব'লে দিত। মেজবাবুর কাণ্ড দেখে দয়াময়ীকে

রাঁধুনি বলত, আচ্ছা মানুষ বটে মেজদা! বাড়ির আর কেউ এমন নয়।

দেবপ্রতিমের হালচাল দেখে রাগে দয়াময়ীর মুখ লাল হয়ে উঠলেও সে কথা বলত না। চন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন তার মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেছে। কালরাত্রি নেমেছিল আমাদের সংসারে। দয়াময়ীর সঙ্গে চন্দ্রনাথের বিরোধের সময়ে সবচেয়ে বেশি সুযোগ নিয়েছিল দেবপ্রতিম। তাকে চালাচ্ছিল তুলিকা। সংসারে উদাসীন হয়ে রান্নাঘরে ঢোকা দয়ামযী প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। আড়াইতলার ঠাকুরঘরে সকালে বেশি সময় কাটাত। লালপাড় গরদের শাড়ি পরে ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীর ছবির সামনে সকাল-সন্ধে কয়েক ঘণ্টা বসে থাকত। ঠাম্মার খুব ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল তিন-চার বছরের ভিক্টর। দয়াময়ীর সঙ্গে তার লেপ্টে থাকা যে মা-বাবা পছন্দ করছে না, বোঝার বয়স, তার ছিল না। আদরের নাতিকে দয়াময়ী এড়াতে পারত না। ঠাম্মার সঙ্গে দুবেলা ঠাকুরঘরে যেত। প্রসাদের সন্দেশ বাতাসা না খেয়ে সেখান থেকে নড়ত না। দয়াময়ীর সংসারের সঙ্গে তার ঠাকুরঘরও তখন অগোছাল হচ্ছিল। বাড়িতে মন বসছিল না। ছেলেমেয়েদের কারও বাড়ি গিয়ে পাঁচ-সাত দিনের বেশি সেখানে থাকতে পারছিল না। সংসার, ঠাকুরঘর দু জায়গা থেকেই মন সরে যাচ্ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কোন জিনিস কোথায় রাখছে, পরে মনে করতে পারত না। গঙ্গাজল তোলার তামার ছোট একটা চামচ খুঁজে পেল না একদিন। ভাবল, ঠাকুরঘরে লোহার তোরঙ্গে রাখা তামার বাসনের মধ্যে কোথাও আছে। লোহার তোরঙ্গ খুলে চামচ খোঁজার উৎসাহ হারিয়েছিল। খোঁজার মত সময় তাই পেল না। তামার একটা গ্লাস আর একদিন পুজোর জায়গায় না দেখে মনে হল, ঠাকুরঘরে কোথাও রয়েছে। দরকার মত খুঁজে নিলেই চলবে। খোঁজার ঝক্কি এড়াতে গঙ্গাজলের গ্লাসটার দরকার কমিয়ে দিল। পেতলের প্রদীপ, তামার কোষাকুষি এবং আরও কিছু পুজোর বাসন ঠাকুরঘর থেকে এভাবে অদৃশ্য হতে দয়াময়ীর টনক নড়ল। মনে হল, পুজোর বাসন ক্রমাগত কেউ হাতসাফাই করছে। কে করতে পারে? চোর ধরতে না পেরে দয়াময়ী এক সন্ধেতে নিজের ঘরে বসে তুমুল চেঁচামেচি করে ঠাকুরঘরে তালা লাগাল। ঠাকুরঘরে সন্ধেপ্রদীপ জ্বালল না। শোওয়ার ঘরে ধুনুচি জ্বেলে ধুনো দিল না। সংসারের শেকড় আলগা হয়ে গেছে টের পেয়ে তার দু'চোখে জল এসেছিল। পাশের পুরকায়স্থ বাড়িতে তখন কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে মহাসমারোহ সন্ধ্যারতি চলছিল। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল উলুধ্বনি। দয়াময়ী ভাবছিল, যে বাড়িতে পুজো-অর্চনার বালাই ছিল না, সেখানে হঠাৎ ভক্তির জোয়ার এল কোথা থেকে? বস্তুবাদী পুরকায়স্থদের ধর্মে মতি হতে দেখে অবাক হয়েছিল। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে ভূপেন পুরকায়স্থর বৌ অরুণা এসে, তাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো দেখতে যাওয়ার নেমন্তন্ন করে যেতে দয়াময়ী জেনে গিয়েছিল ঘটনার কার্যকারণ। তিনদিন বাদে বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমার সন্ধেতে পুরকায়স্থদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর অনুষ্ঠানে ভিক্টরকে নিয়ে প্রথমে দয়াময়ী, আধঘণ্টা পরে তুলিকা, মানবী পৌঁছে গিয়েছিল। বসার ঘরে আসবাবপত্র সরিয়ে, মেঝে জুড়ে পিটুলি গোলার আলপনা এঁকে পুজোর আয়োজন হয়েছিল। ঘরের যে দেওয়াল ঘেঁষে জলচৌকি পেতে নতুন গামছা বিছিয়ে সত্যনারায়ণ শিলা রাখা হয়েছিল, সেখানে ঝুলছিল 'কলির নারায়ণ' নামে খ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় এক গুরুর ছবি। দয়ামযী শুনেছিল কিছুদিন আগে ভূপেনকে দীক্ষা নেওয়ার

জন্য গুরু স্বপ্নাদেশ দেয়। আদেশ পেয়ে এক হপ্তার মধ্যে সস্ত্রীক দক্ষিণ ভারতে গিয়ে ভূপেন দীক্ষা নিয়ে এসেছিল। স্বপ্নে দেখা গুরু সশরীরে দীক্ষা দিয়েছিল তাকে। কলকাতায় ফিরে পুরকায়স্থ দম্পতি ভক্তির স্রোতে ভাসতে থাকে।

সত্যনারায়ণ পুজোর আসরে গিয়ে এ বিবরণ, নানা জনের কাছ থেকে দয়াময়ী শুনছিল। দুই বৌমা এসে পাশে বসতে দয়াময়ী খুশি হয়েছিল। নবনীতা খবর পেলে যে চলে আসত, দয়াময়ীর সন্দেহ ছিল না। পরে, আমার সঙ্গে দেখা হতে সেই সন্ধের ঘটনা দয়াময়ী বিশদে বলেছিল। পূর্ণিমার সেই সন্ধেতে দু'ঘণ্টা ধরে দয়াময়ী দেখেছিল, তার ঠাকুরঘর থেকে হারানো বাসনগুলো দিয়ে পুরকায়স্থদের সত্যনারায়ণ পুজো হচ্ছে। তিরিশ বছর ধরে সকাল-সন্ধে দু'বেলা যে বাসন নাড়াচাড়া করেছে, সেগুলো চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়। দয়াময়ী ভুল করেনি। ফিসফিস করে প্রথমে তুলিকা, তারপব মানবীকে বলেছিল, দেখ তো, বাসনগুলো চিনতে পার কিনা!

পুরকায়স্থদের বাসনের মধ্যে দয়াময়ীর পুজোর বাসন চিনতে তুলিকা, মানবীর অসুবিধে হয়নি। বাসনগুলো তারা শুধু চোখে দেখেছে এমন নয়, অসংখ্যবার ব্যবহার করেছে। মানবীর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। তুলিকার মুখে কথা সরেনি। দয়াময়ীর সামনে এসে প্রতিবেশি ভূপেন পুরকায়স্থর বৌ অরুণা চাপা গলায় তখন গুরুর অলৌকিক মহিমার কাহিনী বলতে শুরু করেছিল। পুজোর বেশিরভাগ বাসন আকাশ থেকে একটা একটা করে তাদের উঠোনে নেমে এসেছে। বারবার বলছিল, আপনি হয়তো শুনে বিশ্বাস করবেন না, সব আমাদের গুরুর কৃপা। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। প্রথমে এল তামার চামচ, তারপর গঙ্গাজল রাখার গ্লাস, পেতলের প্রদীপ, কোষাকুষি, পঞ্চপ্রদীপ, আমার ঠাকুরঘর সাজাতে যা দরকার গুরুর কৃপায় সব এসে গেল। সকালে উঠোনে পা দিলেই চোখে পড়ত নতুন বাসন। গলায় আঁচল জড়িয়ে চোখ বুজে দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকিয়েছিল অরুণা।

পুরকায়স্থ গিন্নির কথার মধ্যে সরল গলায় চার বছরের ভিক্টর বলেছিল, ওগুলো সব ঠাম্মার বাসন। ঠাম্মার ঠাকুরঘরের জানলা দিয়ে আমি ফেলতাম।

তার কথাগুলো তুলিকা স্পষ্ট শুনলেও অরুণার কানে গেছে কিনা, দয়াময়ী বুঝল না। ব্যস্তসমস্ত হয়ে পুরোহিতকে কিছু বলতে সে উঠে গেল। সত্যনারায়ণের সিন্নি খেয়ে দুই পুত্রবধূ, নাতি নিয়ে দয়াময়ী বাড়ি ফিরলেও প্রতিবেশীদের কাছে নিজের পুজোর বাসনগুলো কখনও ফেরত চাইতে যায়নি। তার রুচিতে আটকেছিল। পুজোর বাসন ভ্যানিশ করে দেওয়ার জন্যে নাতিকেও কিছু বলেনি। বরং আরও বেশি স্নেহে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। বাসন খোয়া যাওয়া নিয়ে গোড়াতে যে হইচই করেছিল, সেই ঘটনার সঙ্গে নাতি জড়িয়ে আছে জানলে করত না। তখন তাকে কিছু কটু কথা দেবপ্রতিম শুনিয়েছিল। সোনার গয়নার মত বাসন যে দয়াময়ী বেচে দিয়েছে, এমন অভিযোগ করেছিল। দয়াময়ী কথাটা শুনে কষ্ট পেয়েছিল। হারানো বাসনের প্রসঙ্গ আর তোলেনি। ভূপেন পুরকায়স্থের বাড়িতে জাঁকজমকের পুজো বেশিদিন চলল না। ট্রাম দুর্ঘটনায় ভূপেনের হাঁটু থেকে ডান পা বাদ যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে এনকেফেলাইটিসে তার বউ অরুণা মারা গেল। তিনদিনের জ্বরে পৃথিবী থেকে সে চলে গেল। পুরকায়স্থ পরিবারের শোকের ঢেউ দয়াময়ীকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ঠাকুরঘরে ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীর পটের দিকে দু'চোখ বুজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে, পুরকায়স্থদের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করত।

উনিশ

বাতানুকূল ব্যাঙ্কে, অমল করের টেবিলের সামনে বসে ঘুমে আমার দু'চোখ যখন জুড়ে যাচ্ছে কেউ বলল, সই করুন।

আমার সামনে সার্টিফিকেট বাড়িয়ে দিয়ে অমল কর তাকিয়েছিল। ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেটে আমি সই করলাম। ফাঁকা নীল প্লাস্টিক প্যাকেটটা টেবিলের এক পাশে পড়েছিল। ব্যাঙ্কের ছাপানো ভাউচারে টাকার অঙ্ক লিখে আমাকে দিয়ে আবার সই করাল অমল। কাগজ দুটো পিনে গেঁথে সাব-স্টাফের হাতে ম্যানেজারের ঘরে পাঠিয়ে দিল। দ্বিতীয় লেজার খাতায় ডুব দেওয়ার আগে আমাকে অমল বলল, ভাউচারে ম্যানেজার সই করে দিলে ফিক্সড ডিপোজিট আর পাসবইয়ের টাকা যোগ করে একটা চেকে তুলে নিন। তারপর পাসবই, চেকবই নিয়ে আমার কাছে আসুন।

চেয়ার ছেড়ে আমি উঠে দাঁড়াতে অমল বলেছিল, কাউন্টারে কাগজপত্র না যাওয়া পর্যন্ত এখানে বসতে পারেন। আমি বসে গিয়েছিলাম। ভয়ও হচ্ছিল। মাতৃস্মৃতি শব্দটা অমলের মুখ থেকে আর শুনতে চাইছিলাম না। রঙিন কাচের বন্ধ জানলা দিয়ে ঠা-ঠা রোদে পোড়া আকাশটা মেঘলা দেখাচ্ছিল। হয়ত মেঘ জমেছিল আকাশে। সবটা রঙিন কাচের কারসাজি নয়। ক্লিপ করা সাদা, নীল, হলুদ কাগজের গোছা থেকে একটা করে কাগজ খুলে নিয়ে লেজারে টাকার অঙ্ক লিখছিল অমল। মাতৃস্মৃতি নিয়ে আপাতত সে কিছু বলবে না। তবু শব্দটা আগের দিন থেকে বুকের মধ্যে বেজে যাচ্ছিল। দয়াময়ী মারা যাওয়ার একমাস পরে মাতৃহীন হওয়ার যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দয়াময়ীকে ঢোকানোর সময়ে এত কষ্ট হয়নি। পাঁচ বছর ধরে যে কথাটা চেষ্টা করেও বলতে পারিনি, সেই ব্যর্থতার কথা ভেবে আপসোস হচ্ছিল। চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়েনি। মায়ের নিষ্প্রাণ মুখের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। ঘটনার দুর্বোধ্যতা পাথর করে দিয়েছিল আমাকে। মাতৃহীনের যতটা শোকাতুর হওয়া উচিত, কেন হতে পারছি না ভেবে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

ম্যানেজারের সই হয়ে কাগজগুলো ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। হাওয়াকল লাগানো ম্যানেজারের ঘরের ঘষা কাচের দরজা যতবার খুলছিল, তাকাচ্ছিলাম। দরজা খুলছিল, বন্ধ হচ্ছিল, আবার খুলছিল। ঘর থেকে যারা বেরচ্ছিল, তাদের বেশিরভাগ ব্যাঙ্কের আমানতকারী। দু-একজন ব্যাঙ্ককর্মী বেরলেও আমার কাগজগুলো তাদের হাতে ছিল না। তীর্থের কাকের মত বসে থেকে আমি ক্লান্ত হচ্ছিলাম। মাতৃস্মৃতি কথাটার বিষাদ চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। বিষাদ রূপান্তরিত হচ্ছিল শোকে। শ্রাবণের জলভরা মেঘের মত বুকের মধ্যে শোক ঘন হচ্ছিল। রঙিন কাচের জানলার বাইরে ধূসর আকাশে সত্যি মেঘ জমেছে কিনা, বুঝতে পারছিলাম না। দরজা-জানলা বন্ধ, শব্দদুর্ভেদী ঘরে মেঘের ডাক শোনার উপায় ছিল না। হয়ত মেঘ ডাকছিল।

আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল গুড়গুড় ধ্বনি। তন্দ্রায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া মাথার মধ্যে দয়াময়ী ফিরে আসছিল।

চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে জীবনের শেষ পাঁচ বছর সংসারে দয়াময়ীর একদম মন ছিল না। যা কিছু ভাবনাচিন্তা, সব ছিল পঁচানব্বই বছরের অঘোরবালার জন্যে। অঘোরবালাকে দেখাশোনা করার জন্যেই যেন সে বেঁচেছিল। দয়াময়ী প্রায়ই বলত, মা না মরা পর্যন্ত আমার রেহাই নেই। আমাকে বাঁচতে হবে।

বাস্তবে তাই ঘটেছিল। ধুমধাম করে অঘোরবালার মৃত্যুর প্রথম বাৎসরিক পালন করার দু'দিন পরে দয়াময়ী মারা গেল। ভাউচার লাগানো ফিক্সড সার্টিফিকেট অমলের টেবিলে দিয়ে গেল এক সাব-স্টাফ। ভাউচার সই করে অমল বলল, চেকে আঠার হাজার সাতশ বাহাত্তর টাকা তুললে ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপনার হিসেব চুকে যাবে। টাকা নিয়ে এখানে একবার আসবেন। চেকবই জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে যাবেন। পাসবই এনডোর্স করে দেব।

অমলের টেবিলে বসে আঠার হাজার সাতশ বাহাত্তর টাকার চেক লিখে, সেটা ছিঁড়ে চেকবইটা অমলকে দিতে গিয়ে দেখলাম, খাতায় লেখাজোখা করছে সে। টাকা নিয়ে পাসবইয়ের সঙ্গে চেকবই দিয়ে যাব ঠিক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কাউন্টারে চেক জমা করে পেতলের টোকেন নিয়ে ভিড় থেকে সামান্য সরে দাঁড়ালাম। ভর্তি বেঞ্চ ছেড়ে একজন উঠে যেতে সেখানে বসলাম। কাউন্টার থেকে আমার টোকেন নম্বর হাঁকলে শুনতে অসুবিধে হবে না। বেঞ্চের গা ঘেঁষে জানলা। বেঞ্চে বসে, আকাশে ভালরকম মেঘ জমেছে বুঝতে অসুবিধে হল না। দয়াময়ীর সঙ্গে দু'বছর আগে ফিক্সড ডিপোজিট করে ব্যাঙ্ক থেকে ফেরার পথে, বাসে উঠে সেদিন যে চিন্তা মাথায় এসেছিল, পকেটে পেতলের টোকেন নিয়ে বসে থাকার সময়ে তা মনে পড়তে আমার পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠেছিল। মাথা ঝিমঝিম করছিল। কাপড়ের ঝোলা কোলের ওপর নিয়ে আমি চোখ বুজেছিলাম।

পনের হাজার টাকার সুদ তিন মাস অন্তর যৌথ অ্যাকাউন্ট থেকে দয়াময়ী তুলে নিত, আমি জানতাম। সব সময়ে যে এই নিয়ম দয়াময়ী মানত, এমন নয়। পনের হাজার টাকার সুদ বাবদ কত টাকা জমতে পারে, আমি আন্দাজ করতাম। কুণ্ডলীপাকানো সাপের মত একটা প্রশ্ন মনের অতলনিহিত গুহা থেকে ধীরে ধীরে ফণা বিস্তার করত। পনের হাজার টাকা কবে আমার হাতে আসবে, ভাবতাম। টাকার জরুরি দরকার থাকলে প্রশ্নটা নরুনের ডগার মত বুকের ভেতরে খোঁচাত। অবশ্যম্ভাবী আরও কিছু প্রশ্ন সামনে এসে যেত। দয়াময়ী কতদিন বাঁচবে? প্রচলিত নানা সংস্কার মনে ঘোরাফেরা করত। গঠনের দিক থেকে মেয়েরা সাধারণত পিতৃমুখী হলেও তাদের পরমায়ু হয় মায়ের সমান। উল্টোও ঘটতে পারে। তিরানব্বই বছরের অঘোরবালার সমান পরমায়ু দয়াময়ী পেলে টাকাটার জন্যে আরও একুশ-বাইশ বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। এরকম টাকা পাওয়ার মানে কী? নবনীতার দিদিমা মারা যাওয়ার খবর পেয়েও অঘোরবালা তখনও বেঁচে ছিল। পাপ চিন্তা করছি জেনেও মনের রাশ টানতে পারতাম না। ইতর, ছোটলোক মনে হত নিজেকে। অশিষ্ট মনকে চাবকে সিধে করতে চাইতাম। কখনও পারতাম, কখনও পারতাম না। মনের গুহাতে লুকনো সাপটা প্রায়ই উৎপাত করত।

দয়াময়ীর কাছে দোষ স্বীকার করার বদলে তার মৃত্যু নিয়ে অধঃপতিতের মত ভাবতাম এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতাম। দয়াময়ীর আগে আমি মরে গেলে ঘটনা কী দাঁড়াবে, এ চিন্তাও মাথায় আসত। তেমন ঘটলে টাকাটা দয়াময়ীর হাতে থেকে যাবে। সেটাই স্বাভাবিক। মাথায় সে চিন্তা কখনও এলেও চলে যেত। নিজেকে ফিক্সড ডিপোজিটের মালিক ভাবতে শুরু করেছিলাম আমি। আমার স্বত্বের মধ্যে অন্যায়ভাবে দয়ামযী ঢুকে রয়েছে। লেবুতলার বাড়িতে দয়াময়ীর কাছে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলাম। মাসে একবার যেতাম কিনা সন্দেহ। নানা সূত্রে খবর পাচ্ছিলাম, বাড়িতে অশান্তি চলেছে। দয়াময়ীর শরীর ভাল নেই। দয়াময়ীর শরীর খারাপ শুনে পরের রবিবারে নবনীতা-চুমকিকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মেজদি বিপাশা, মেজজামাইবাবু লোকনাথও দেখতে এসেছিল দয়াময়ীকে। পালঙ্কে দয়াময়ীর পাশে আমি আর নবনীতা বসেছিলাম। চুমকিকে ডেকে নিয়েছিল ভিক্টর। সাদা থান মোড়া দয়াময়ীকে আগের চেয়ে রোগা দেখাচ্ছিল। সরু হাত। বলিরেখা বোঝাই মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দয়াময়ীর স্বাস্থ্য এত ভেঙে গেছে, আগে খেয়াল করিনি। আমাকে পেয়ে বিপাশা বলেছিল, এ বাড়িতে যা কাণ্ডকারখানা চলছে, কহতব্য নয়। যে কেউ অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। ভাবছি, মাকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখব।

ছোট ছেলে, কিশলয়ের সঙ্গে মাঝে একদিন কথা কাটাকাটিতে দয়াময়ী অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। দয়াময়ীর দোষের মধ্যে তার নামে বেহালায় চন্দ্রনাথের কেনা তিন কাঠা জমির দলিলটা সে চেয়েছিল কিশলয়ের কাছে। পনের-ষোল বছর আগে দয়াময়ীর নামে জমিটা কিনেছিল চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে তার ব্যক্তিগত লোহার সিন্দুক খুলে লেবুতলার বাড়ির দলিল, অন্য সব দরকারি কাগজ ঠিকঠাক পাওয়া গেলেও বেহালার জমির দলিলটা পাওয়া যায়নি। আলমারি খোলার সময়ে চন্দ্রনাথের চার ছেলে, দুই মেয়ে সেখানে ছিল। দয়াময়ী শুয়ে ছিল নিজের ঘরে। মৃত স্বামীর আলমারি খোলার সময়ে সদ্য বিধবা দয়াময়ীকে সেদিন কেউ ডাকেনি। ডাকলেও দয়াময়ী যেত কিনা সন্দেহ। অঘটন কিছু ঘটেছে, আঁচ করে আমি চুপ করে ছিলাম। দেবপ্রতিম বলেছিল, আলমারি থেকে আগে কত কাগজ উধাও হয়েছে কে জানে!

বড়দি, বীথিকা বলেছিল, বাবার উইল কোথায়?

বাবা কি উইল করেছিল?

বিপাশার প্রশ্ন শুনে বীথিকা বলেছিল, করেছিল। আমার বাড়িতে বসে বাবা নিজে বলেছে।

দয়াময়ীকে তখনই জিজ্ঞেস করার জন্যে দেবপ্রতিম জেদাজেদি করলেও অন্য ভাইবোনদের সঙ্গে আমি রাজি হইনি। শোকাতুর মাকে সেই মুহূর্তে ব্যস্ত করতে আমাদের সঙ্কোচ হয়েছিল। মাস তিনেক পরে দয়াময়ী বলেছিল, আমি যতদূর জানি, বেহালার জমির দলিল, কর্তা সিন্দুকেই রেখেছিল।

গেল কোথায়?

দেবপ্রতিমের প্রশ্নের জবাব তখন দয়াময়ী দেয়নি। চিবুক শক্ত করে বসেছিল। চন্দ্রনাথ মারা যেতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল তার ছোট ছেলে কিশলয়। চন্দ্রনাথ সেনের কাঠের ব্যবসা, খালধারের কাঠগোলা, করাতকল কিশলয় পেয়ে গেল।

চন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ব্যবসা, চার বছর ধরে সে দেখাশোনা করছিল। চাকরিজীবী তিন ছেলে পৈতৃক ব্যবসার বিন্দুবিসর্গ জানত না। বড়দা আর আমার জানার ইচ্ছে ছিল না। দেবপ্রতিমের প্রবল ইচ্ছে থাকলেও ব্যবসা দেখার মত সময় পেত না। আয়কর বাঁচাতে ব্যবসার একাংশ, চন্দ্রনাথ, কাগজপত্রে কিশলয়ের নামে চালান করেছিল। ব্যবসার দায়িত্ব ধীরে ধীরে কিশলয়কে বুঝিয়ে দিয়ে নির্ভার হতে চাইছিল। পঁচাত্তর বছর বয়স হয়েছিল তার। শুরুতে ব্যবসার অল্পস্বল্প স্বত্ব পেলেও চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার আগেই ষোল আনার মালিক হয়ে গিয়েছিল কিশলয়। তার মালিকানাতে আমরা কেউ নাক গলাইনি। তবে বেহালার জমির দলিল নিয়ে রহস্য থেকে গিয়েছিল। পাঁচিল ঘেরা বেহালার জমি অবশ্য যথাস্থানে ছিল এবং হু-হু করে তার দর বাড়ছিল।

অফিস থেকে ফিরে, দয়াময়ীর ঘরে কয়েকটা চেনা গলা শুনে দেবপ্রতিম দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখে ঘরে ঢুকে দয়াময়ীকে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

ভাল।

আমরা যেতে শয্যাশায়ী দয়াময়ী বিছানায় উঠে বসেছিল। মা যে আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে, ধরে নিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে দেবপ্রতিম বলেছিল, ছোটভাই বলতে তোমরা গলে যাও, আসলে কিশলয় কী চিজ, এতদিনে ধরা পড়ল!

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে দয়াময়ীকে দেবপ্রতিম বলেছিল, সাতদিন আগে কিশলয়কে মুখের ওপর যে কথা বলেছিলে, এদের জানিয়েছ?

দয়াময়ী চুপ। দেবপ্রতিমের মুখের দিকে আমি তাকিয়েছিলাম। বিপাশা বিব্রত। লোকনাথও তাই। জানলা দিয়ে আকাশ দেখছিল নবনীতা। দেবপ্রতিম চুপ করে যাওয়ার লোক নয়। বলল, পাঁচ বছরের পুরনো সত্য, সাতদিন আগে জানতে পারলাম। মা-ই ফাঁস করে দিল। নার্সিংহোমে বাবার ডেডবডি ঘিরে সকলে যখন কান্নাকাটি করছে, করাতকল থেকে তখন হাসপাতালে না গিয়ে কিশলয় সোজা বাড়িতে চলে এসেছিল। পনের মিনিট আগে নার্সিংহোম থেকে বাবার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে মা বাড়ি ফিরেছিল। বাবার ঘরে মাকে রেখে, তখনই নার্সিংহোমে চলে গিয়েছিল বিজুদা। ফাঁকা ঘরে, বাবার খাটে মা চোখ বুজে শুয়েছিল। মায়ের দু'চোখ বেয়ে অনর্গল জল পড়ছিল। মায়ের সামনে বাবার সিন্দুক খুলে একতাড়া কাগজপত্র বার করে নিয়েছিল কিশলয়।

দেবপ্রতিম এক সেকেন্ড থেমে বলেছিল, মানলাম, মায়ের তখন কথা বলার মত মনের অবস্থা ছিল না, তবু এতবড় জোচ্চুরি পাঁচ বছর কীভাবে চেপে থাকল? কিশলয়ের সঙ্গে জমির দলিল নিয়ে সেদিন মায়ের কথা কাটাকাটি না হলে সিন্দুক লোপাটের খবর জানতে পারতাম না।

গম্ভীর মুখে দয়াময়ী বসেছিল। দেবপ্রতিমের কাণ্ড দেখে আমি হতবাক। বাড়ি ফেরাব জন্যে বিপাশাকে লোকনাথ তাড়া লাগিয়েছিল। দয়াময়ীর পিঠে হাত রেখে বিপাশা জিজ্ঞেস করেছিল, কবে আসব তোমাকে নিতে?

বুড়ি মা-টার কী হবে?

দয়াময়ীর গলায় অঘোরবালার জন্যে ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিল। বুড়ি মা ছাড়া দয়াময়ীর অন্য চিন্তা ছিল না। চুরানব্বইয়ের অঘোরবালার অনন্যোপায় নির্ভরতা হয়ত দয়াময়ীর নিজের জীবনের শূন্যতা ভরে রেখেছিল। ছেলেমেয়েদের মত স্বাবলম্বী হয়ে

তাকে ছেড়ে অঘোরবালা অন্তত চলে যায়নি। মায়ের নির্ভরশীলতা দয়াময়ীকে সজাগ আর দায়িত্ব সচেতন রেখেছিল। তবু বিপাশার বাড়িতে দয়াময়ীর যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল। লোকনাথ বলেছিল, মাছ-মাংস খেয়ে মুখ হেজে গেছে। আপনি গেলে কয়েকদিন বড়ির ঝাল, বাটিচচ্চড়ি খাওয়া যাবে।

ক্লান্তির হাসি ফুটেছিল দয়াময়ীর মুখে। আলমারি খুলে দুটো মেয়েলি ব্যাগ বের করে একটা বিপাশা, একটা নবনীতাকে দিয়ে দয়াময়ী বলেছিল, দুই নাতনির জন্যে কিনেছিলাম। কলেজ-স্কুলে ওরা নিয়ে যেতে পারবে।

লোহার আলমারির পাল্লা দুটো হাট করে খুলে দয়াময়ী বলেছিল, আমার যা কিছু সব এই আলমারিতে রয়েছে। আমি মারা গেলে শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে তোমরা ভাগ করে নিও।

বিপাশা বলেছিল, এসব কথা ছাড়। মনে রেখ, তোমার মা বেঁচে আছে। দিদিমা বেঁচে থাকতে তোমার মরা চলবে না।

জানি।

লম্বা শ্বাস ফেলে দয়াময়ী বলেছিল, বুড়িটা কতদিন বাঁচবে, কে জানে। তার জন্যে আমাকেও বাঁচতে হবে। কী শাস্তি!

আমরাও তো আছি। আমাদের জন্যে তোমার বাঁচতে ইচ্ছে হয় না?

বিপাশার কথাতে করুণ মুখে দয়াময়ী বলেছিল, ভাল করে কিছুই আর ভাবতে পারি না।

বিপাশা কথা বলল না। দয়াময়ীর আলমারির ভেতরটা আমি দেখছিলাম। আলমারির মধ্যে ধবধবে সাদা বরফ জমে আছে। চারটে তাক আগাগোড়া সাদা, থান ছাড়া কিছু নেই। দয়াময়ীর রঙিন সব শাড়ি, বিয়ের ঝলমলে বেনারসী, ছেলেবেলার দেখা সেই সব ঢাকাই, কাঞ্জিভরম কোথায় গেল? লকারে কী আছে জানতাম না। আমার নামে যৌথভাবে করা ফিক্সড্ ডিপোজিট সার্টিফিকেটটা যে ছিল, পরের বছর শেষ হতে জেনেছিলাম। বিপাশা-লোকনাথ চলে যেতে নবনীতার সঙ্গে আমাকে পাশে বসিয়ে চেতলার সংসারের খবর নিয়ে দয়াময়ী বলেছিল, তোদের কাছে গিয়ে কয়েকদিন থাকব। কবে যাবেন, জানতে চেয়ে নবনীতা বলেছিল, খবর দিলে আমি এসে নিয়ে যাব আপনাকে। চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে, চার বছর ধরে যে ঘটনা, দয়াময়ীকে জানাতে চাইছিলাম, নবনীতা পাশে না থাকলে সেদিন বলতে পারতাম। অসুস্থ দয়াময়ীকে দেখতে প্রায় এক মাস না আসার জন্যে আমার আপসোস হচ্ছিল। দয়াময়ী বলছিল, এখানে থাকতে প্রায় এক মাস ভাল লাগে না।

দু'চোখ ভিজে উঠতে, কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার বলেছিল, কাল দেবপ্রতিম বলল, আমার জন্যে তার ছেলের লেখাপড়া করতে অসুবিধে হয়। ঘরে একজন মানুষ ঘুরঘুর করলে, রান্নাবান্না করলে, ক্লাস এইটের একজন ছাত্রের লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। অসুবিধের কথা ভিক্টর নাকি তার মা-বাবাকে বলেছে।

গুম হয়ে বসেছিল দয়াময়ী। আমি বলেছিলাম, ঘরটা তোমার। সেখানে বসে কারও লেখাপড়া করতে অসুবিধে হলে, সে অন্য ঘরে পড়বে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দয়াময়ী বলেছিল, আমাকে আড়াইতলার ঠাকুরঘরে

পাঠাতে চায় দেবপ্রতিম। তার ধারণা, আমার সঙ্গে সাট করে বেহালার জমির দলিল, গায়েব করেছে কিশলয়।

কেন হল এ ধারণা?

দলিল হারানোর এজাহার লেখাতে আমাকে নিয়ে থানায় যেতে চেয়েছিল দেবপ্রতিম। আমি যাইনি। পেটের ছেলেকে জেলে পাঠাব নাকি?

এক সেকেন্ড থেমে দয়াময়ী বলেছিল, কিশলয় আবার ভাবছে,এই বাড়িটা দেবপ্রতিমকে আমি লেখাপড়া করে দিয়েছি। ভিক্টর এ ঘরে বসে লেখাপড়া শুরু করার পর থেকে কিশলয়ের মনে সন্দেহ ঢুকেছে।

কথা না বাড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কবে যাবে আমার বাড়ি?

বিপাশার বাড়ি থেকে ঘুরে এখানে ফিরে এসে, তারপর। মায়ের কাছেও তো একবার যেতে হবে।

ব্যাঙ্কের কাউন্টার থেকে যে আমার টোকেন নম্বর হাঁকা হচ্ছে আবছা তন্দ্রার মধ্যে বুঝতে পারিনি। সম্ভবত তৃতীয় হাঁক শুনে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালাম। কাউন্টারে গিয়ে টোকেন জমা করে আঠার হাজার সাতাশ বাহাত্তর টাকা নিয়ে, টাকার গোছা, আমি ঝোলাতে ঢোকানোর মুহূর্তে কাউন্টারের কর্মী বলল, গুনে নিন।

দরকার নেই।

টাকার দরকার থাকলেও টাকা গুনে-গেঁথে নেওয়ার আগ্রহ আমার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। পাথরের ভার অনুভব করছিলাম বুকে। আঠার হাজার সাতশ বাহাত্তর টাকার জন্যে দু'বছর আগে, অপেক্ষা করে, আপাতত দয়াময়ীর মরার সম্ভবনা নেই জেনে বিরক্ত হয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু কামনা করেছিলাম। দয়াময়ী নেই। অদৃশ্য এক দাঁড়িপাল্লার একদিকে আঠার হাজার সাতশ বাহাত্তর টাকা, অন্যদিকে দয়াময়ীকে রেখে ওজন করতে গিয়ে যন্ত্রণায় আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিলাম। সেই প্রথম টের পেলাম, আমি মাতৃহীন হয়েছি। মনে মনে বললাম, মা টাকা চাই না। তুমি ফিরে এস।

আমার আলটপকা মা-ভক্তির কোনও দাম ছিল না। মৃত মা ফিরে আসে না জেনেই আমি হয়ত দয়াময়ীর পুনর্জীবন প্রার্থনা করার করেছিলাম। চেকবই, পাসবই জমা করতে অমলের টেবিলে এসে দেখলাম, টেবিলে অমল নেই। কাছে কোথাও গেছে অনুমান করে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসলাম। জমা করার কাগজগুলো রাখলাম টেবিলের ওপর। দেওয়াল ঘড়িতে বেলা একটা। সাড়ে এগারটায় ব্যাঙ্কে ঢুকেছিলাম। কাজ সারতে দেড় ঘণ্টা লেগেছিল। তখনও কাজ শেষ হয়নি। অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে, পাসবই-এ সিল ছাপ্পা লাগিয়ে ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আয়করদাতা চাকরিজীবীদের কাগজপত্র ঠিকমত না রাখতে পারলে বিপদ। দয়াময়ীর সঙ্গে যৌথ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার তথ্যটা আয়করের ফিরতি চালানে না জানানো পর্যন্ত রেহাই নেই। তিন-চার মিনিটের মধ্যে অমল চেয়ারে ফিরল। বলল, বাইরে গিয়েছিলাম। মেঘ করেছে। বৃষ্টি হতে পারে।

প্রবল বর্ষণে আমি ভেসে যেতে চাইছিলাম। বৃষ্টির কথা শুনে জানলার রঙিন কাচ দিয়ে আকাশ দেখে মনে হয়েছিল, ভালরকম মেঘ জমেছে। বৃষ্টি হবে।

টাকা তুলেছেন?

অমলের প্রশ্নে বললাম, হ্যাঁ।

আমার পাসবই, চেকবই নিয়ে আনুষ্ঠানিক যা যা করার অমল করল। আমানতকারীর ব্যবহারের জন্যে পাসবই-এ রাখা শেষ দুটো ঘরকাটা পাতা ফরফর করে ছিঁড়ে আমাকে দিয়ে অমল বলেছিল, রাখুন, পাতা দুটোতে দয়াময়ী সেনের হাতের লেখা রয়েছে। পরে দেখলে আপনার ভাল লাগবে। যতই হোক মাতৃস্মৃতি!

শব্দদুর্ভেদী ঘরে বাজ পড়ার আওয়াজ শুনলাম। শক্ত করে দরজা-জানলা আটকানো ব্যাঙ্কের ভেতরে তাহলে শব্দ ঢোকে! বাজের আওয়াজ হয়ত শোনা যায়। আমার কানে তালা লেগে গিয়েছিল। ঘরকাটা পাতা দুটোয় ছড়িয়ে রয়েছে দয়াময়ীর খুদিখুদি হস্তাক্ষর। কত নাম, টাকার কত অঙ্ক। ফাউন্টেন পেনে লিখত দয়াময়ী। হাত কাঁপত। কালি ধেবড়ে গেছে দু-এক জায়গায়। ছাপমারা পাসবই অমল ফিরিয়ে দিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ব্যাঙ্কের বাইরে না গেলে আমার কানের তালা খুলবে না। অমলকে বললাম, আমার জন্য অনেক করেছেন। মনে রাখব।

অমল কথা বলল না। কাচের বন্ধ দরজা ঠেলে ব্যাঙ্কের বাইরে এসে দেখলাম, মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। যে কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। বিদ্যুতের আলোয় ফালাফালা হয়ে গেল মেঘ। বাজ পড়ল। বাজের আওয়াজে খুলে গেল আমার কানের তালা। কানে কি আদৌ তালা লেগেছিল? বোধহয় না। 'মাতৃস্মৃতি' শব্দটা সাময়িকভাবে বধির করে দিয়েছিল আমাকে। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট ধরে আমি হাঁটছিলাম। শিয়ালদায় এসে লেবুতলার বাড়িতে একবার যাওয়া উচিত। মনের ভেতর থেকে টান আসছিল। দয়াময়ীর ঘরে ঢুকে তার পালঙ্কে পাঁচ-সাত মিনিট বসব। সত্যি মাতৃহীন হয়েছি কিনা যাচাই করব। রাস্তার মাঝ বরাবর পৌঁছতে তুমুল বৃষ্টি নামল। ভিজে বাতাসার মত জলের ফোঁটা মাথায় পড়ে গলে যেতে থাকল। মেঘ, বিদ্যুৎ পিলে চমকানো বাজের আওয়াজে আগে থেকে রাস্তায় লোকচলাচল কমতে শুরু করেছিল। বৃষ্টি নামতে নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল চারপাশ। রাস্তার দুধারে মাথা বাঁচানোর মত জায়গার অভাব নেই। ফুটপাতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, সোনার দোকানের সারি লাগানো ঝুলবারান্দার তলা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। সেদিন সম্ভব ছিল না। অন্যরকম বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। জলস্তম্ভের মত এরকম জমাট বৃষ্টি হতে আমি আগে দেখিনি। দমকা বাতাসে জলস্তম্ভ ভেঙে গিয়ে নতুন স্তম্ভ তৈরি হচ্ছিল। রাস্তায় আমি একা। গাড়ি কমে গিয়েছিল। ভরদুপুরে হেডলাইট জ্বেলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল ডালহৌসির বাস, মিনিবাস। ফুটপাতের পাশ দিয়ে কলকল করে বয়ে যাচ্ছিল বৃষ্টির জল। ভিজে জামা-প্যান্ট সেঁটে ধরেছিল আমার শরীর। মাথা, মুখ, ঘাড় দিয়ে স্রোতের মত জল নেমে চামড়ার প্রতিটা কোষ ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আমি দাঁড়ালাম। কলেজ স্ট্রিটের দিকে একবার, পরের মুহূর্তে আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে তাকালাম। সামনে-পেছনে ঝুলবারান্দার তলায় গাদাগাদি ভিড়। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় মানুষ থাকবে কেন? আমি ছিলাম। বৃষ্টিতে ভিজে লাট খেয়ে গেলেও রাস্তা ছেড়ে নড়িনি। বাতাসার মত ফোঁটাগুলো ধরে রাখতে কাপড়ের ঝোলার মুখ ফাঁক করে দিয়েছিলাম। দরকারি-অদরকারি

কাগজপত্রের সঙ্গে ভিজছিল একতাড়া নোট। ভিজুক! দয়াময়ী-চন্দ্রনাথের সংসারে আমি যে পাপ ছিটিয়েছিলাম, তা ধুয়ে যাক। অপরাধের পর অপরাধ করেছি। সামান্য কিছু টাকার জন্যে দয়াময়ীর মৃত্যু চেয়েছিলাম।

জলে ভরে গিয়ে কাপড়ের ঝোলা চালের বস্তার মত ভারি হয়ে উঠেছিল। ঝোলার ভেতরে বই, কাগজ, টাকার বান্ডিল জলে ডুবে গিয়েছিল। হুড়হুড় করে জল পড়ছিল ঝোলা থেকে। যা পড়ছিল, তার বেশি জমছিল। আমি চাইছিলাম, বৃষ্টির জলে ধুয়ে বই, কাগজ, টাকার বান্ডিল, নিষ্কলঙ্ক সাদা পাতার মত হয়ে উঠুক। দু'ফুটপাতের গাড়িবারান্দার তলা থেকে আমাকে দেখছিল অসংখ্য মানুষ। পাগল ভাবছিল। তা ভাবুক। আমি তার চেয়ে খারাপ। আমাকে পাগল ভাবলে, কমই ভাবা হবে।

লেবুতলার বাড়ির সদর দরজা খুলে ভিজে কুঁকড়ে যাওয়া আমাকে সামনে দেখে কিশলয়ের স্ত্রী মানবী, প্রথমে চিনতে পারেনি। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, ওমা, সেজদা! ভিজে কী দশা হয়েছে। আসুন, তোয়ালে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাথা মুছুন। পোশাক পাল্টান। আপনার ভাইয়ের পাজামা-পাঞ্জাবি দিচ্ছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মায়ের ঘর খোলা আছে?

কথা তো খোলা থাকার।

আমি ওখানে আছি।

শুকনো সিঁড়ি জলে ভাসিয়ে আমি দোতলায় উঠে গেলাম। নিস্তেজ বাড়ি। দেবপ্রতিম, কিশলয়, ভিক্টর, কারও তখন বাড়ি থাকার কথা নয়। কিশলয়ের তিন বছরের মেয়ে দোলা নিশ্চয় মেঘলা দুপুরে ঘুমিয়েছিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, রোজ দুপুরে দিবানিদ্রা ছাড়া দেবপ্রতিমের বৌ, তুলিকার চলে না। সেই দুপুরেও নিশ্চয় সেও ঘুমোচ্ছিল। দয়াময়ীর ঘরের খোলা দরজার সামনে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। দয়াময়ীর ফাঁকা ঘর, শূন্য পালঙ্কের দিকে তাকিয়ে পরিপাটি করে পাতা বিছানা, চাদর ঢাকা বালিশের স্তূপ, পালঙ্কের নিচে গৃহস্থালির জিনিসপত্রের সঙ্গে মায়ের মুখটা খুঁজছিলাম। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। অঝোর বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। জামা, প্যান্ট, ঝোলা থেকে তখনও জল ঝরছে। পোশাক না বদলে ঘরে ঢুকতে চাইছিলাম না। তখনই শুকনো তোয়ালে, ধোপাবাড়িতে কাচানো পাজামা পাঞ্জাবি, আমাকে দিয়ে মানবী বলল, চা করে আনছি।

আমি বললাম, এখন নয়, যাওয়ার আগে খাব।

দালানের পশ্চিমে নিজের ঘরে যাওয়ার আগে মানবী জিজ্ঞেস করল, সেজবৌদি কেমন আছে? চুমকির অ্যানুয়াল পরীক্ষা কবে শুরু হচ্ছে?

আমার কাছ থেকে প্রশ্নের জবাব পেয়ে মানবী তার ঘরে চলে গেল। পোশাক বদলাতে আমি কলঘরে ঢুকলাম। মাথা, শরীর মুছে, কিশলয়ের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে কলঘরের মধ্যে বালতিতে আমার ভিজে পোশাক রেখে দিলাম। দড়িতে টানটান করে মেলে দিলেও ভিজে পোশাক বাড়ি ফেরার আগে শুকোত না। পরে একদিন এসে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। জল খেয়ে ঢোল হয়েছিল কাপড়ের ঝোলা। চড়া রোদে ফেলে রাখলেও শুকোতে তিন-চারদিন লাগবে। ভিজে ঝোলা নিয়ে কীভাবে বাড়ি ফিরব, ভেবে পেলাম না। ঝোলা নিয়ে দয়াময়ীর ঘরে ঢুকলাম। খড়খড়ি খোলা,

কাচের শার্সি বন্ধ। লালচে কালো আকাশ দেখা যাচ্ছে। ঘরে আবছা অন্ধকার। পালঙ্কের ডানদিকে দেওয়াল ঘেঁষে স্টোভ, হিটার বাসনকোসন গোছানো রয়েছে। পালঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, দয়াময়ী বাড়িতে আছে। এখনই ঘরে আসবে।

পালঙ্কের ধার ঘেঁষে এমনভাবে বসলাম যে দয়াময়ী ঘরে ঢোকার আগে, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। তখনই মনে পড়ল, মা নেই।

কুড়ি

বাইশ দিন আগে রাত দেড়টার দু-পাঁচ মিনিট আগে, অথবা পরে মেজ মেয়ে বিপাশার বাড়িতে দয়াময়ী শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। মা মারা গেছে, বিছানায় তার পাশে শুয়ে বিপাশা বুঝতে পারেনি। ঘণ্টাখানেক আগে দুটো ঘুমের বড়ি গুঁড়ো করে দয়াময়ীকে সে খাইয়েছিল। ভেবেছিল, ওষুধ খেয়ে মা ঘুমোচ্ছে। আলো জ্বেলে রেখেছিল ঘরে। ওষুধ খাইয়ে দয়াময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে পাঁচ-সাত মিনিট বিপাশা বসেছিল। দয়াময়ীর ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসতে ভেবেছিল, মা ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্তর্পণে দয়াময়ীর পাশে শুয়ে পড়েছিল। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিল বিপাশার মেয়ে স্বাতী। চারদিন আগে অফিসের কাজে লোকনাথ দিল্লি গিয়েছিল। দু-একদিনের মধ্যে ফেরার কথা।

সকালে দয়াময়ী যখন বিপাশার বাড়ি এসেছিল, তাকে ক্লান্ত দেখালেও অসুস্থ মনে হয়নি। সারাদিন স্বাভাবিক ছিল। বিপাশা-স্বাতীর সঙ্গে গল্প করেছে, হাসিঠাট্টা করেছে, দুপুরে ভাত খেয়েছে, সন্ধের মুখে মুড়ি-বাদামভাজা খেয়েছে আর সারাক্ষণ শুনিয়েছে অঘোরবালার সাড়ম্বরে বাৎসরিক কাজের বিবরণ। আগের বছর যেভাবে ঘটা করে অঘোরবালার শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেছিল, তার সঙ্গে বাৎসরিক কাজ বেমানান হয়নি। শ্রাদ্ধে বৃষ উৎসর্গ করে পুরোহিতকে বৃষের মূল্য ধরে দিয়েছিল দয়াময়ী। বাৎসরিকে পুরোহিতকে কাঁসার ঘড়া কিনে দিয়েছিল। অঘোরবালার শ্রাদ্ধে একান্নজন ব্রাহ্মণকে ভূরিভোজ খাইয়ে ধুতি উড়নি গীতা, একান্নটা কাঁচা টাকা দক্ষিণা দিয়েছিল। বাৎসরিক এগারজন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রচুর খাইয়ে প্রত্যেককে এগার টাকা করে দক্ষিণা দিয়েছিল দয়াময়ী। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের মত আমন্ত্রিতের সংখ্যা তিনশ না থাকলেও বাৎসরিক কাজে ষাট-সত্তরজন আত্মীয়-বন্ধু এসেছিল। লোকনাথ দিল্লিতে থাকার জন্যে স্বাতীকে নিয়ে বিপাশা গিয়েছিল। লুচি, রাধাবল্লভি, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল, ধোঁকার ডালনা, ছানার ডালনা, আলুবখরার চাটনি, দই, কাঁচাগোল্লা, অঘোরবালার প্রিয় পদগুলো অতিথিদের খাওয়ানো হয়েছিল। বাৎসরিক অনুষ্ঠানের তদারকিতে দয়াময়ীকে সাহায্য করেছিল ছোটবোন সৌদামিনী, মেয়ে বিপাশা। দয়াময়ীর মুখ দেখে বিপাশা টের পেয়েছিল মায়ের হাড়ভাঙা খাটুনি যাচ্ছে। মায়ের ধকল কমাতে সে যতটা সম্ভব কাজে হাত লাগিয়েছিল। কীর্তনের আসর বসেছিল অঘোরবালার ঘরে। কীর্তন করতে তারকেশ্বর থেকে দয়াময়ীর কিশোরীকালের বন্ধু, ফুলের মালার পুত্রবধূ পলা এসেছিল তার দলবল নিয়ে। ফুলের মালা তখন পৃথিবীতে না থাকলেও দয়াময়ীর

কাছে অপরিশোধ্য ঋণে পলা জড়িয়ে ছিল। ফুলের মালার ছেলে শোভেনের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল, মামিমা দয়াময়ী। পলা ছিল চন্দ্রনাথের দিদির মেয়ে। দয়াময়ীকে হাঁপ ছাড়ার সুযোগ করে দিতে তাকে কীর্তনের আসরে বসিয়ে দিয়ে বিপাশা বলেছিল, পলা দারুণ গাইছে। তুমিও একটু শোন। ও খুশি হবে।

পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি আসরে বসার ধৈর্য দয়াময়ীর ছিল না। ভিয়েন, ভাঁড়ার, অতিথিদের দেখাশোনা করতে আসর থেকে উঠে পড়েছিল। পান থেকে চুন খসতে দেয়নি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িতে সৌদামিনী আর তার ছোট ছেলেকে রেখে পরের দিন নিজের বাড়িতে দয়াময়ী ফিরেছিল। রাতটা বাড়িতে কাটিয়ে সকালে চলে এসেছিল বিপাশার কাছে। দয়াময়ীকে দেখে বিপাশা খুশি হয়েছিল। লোকনাথ দিল্লি চলে যেতে বাড়িটা ক'দিন যত ফাঁকা লাগছিল, দয়াময়ী আসাতে তা কিছুটা কাটল। চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর থেকে দয়াময়ী যে ক্রমশ একা হয়ে যাচ্ছে, বিপাশা জানত। আমাকে কয়েকবার সে কথা বিপাশা বলেছে। আমিও বুঝতে পারতাম দয়াময়ীর একাকীত্ব। অঘোরবালার মৃত্যুতে দয়াময়ী যে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে, আমরা দুজনেই টের পেয়েছিলাম। দয়াময়ীকে কিছুদিন চেতলার বাড়িতে এনে রাখার চিন্তা আমার মাথায় ছিল। দয়াময়ী তার আগে চলে গিয়েছিল বিপাশার কাছে। দয়াময়ীকে দেখে মেঘ না চাইতে জল পেয়ে গেল বিপাশা। ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে তার বাড়িতে এসে দয়াময়ী যে সবচেয়ে বেশি শান্তি পায়, বিপাশা জানত। দুই দাদা, দুই ভাইকে বিপাশা ভাল চেনে। ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছাপোষা হয়েও বাপকেলে সম্পত্তিতে আমার বিশেষ লোভ নেই, বিপাশা জানত। মোটা মাইনের চাকরি করলেও বড়দা অরিন্দমের সম্পত্তির লোভ যে কম নয়, এটাও বিপাশার অজানা ছিল না। সম্পত্তির জন্যে দেবপ্রতিমের হ্যাংলামিকে সে ভীষণ অপছন্দ করত। বাড়ির পরিবেশ দেখে দয়াময়ী মাঝে মাঝে বলত, বিষয়, না বিষ। ঘেন্না ধরে গেল আমার।

অরিন্দমের বাড়িতে দয়াময়ী থাকলে তার কথায় সায় দিত অরিন্দম। বলত, ঠাকুরের কথা, মিথ্যে হওয়ার নয়।

রামকৃষ্ণ ঠাকুরের গুণগান করে লেবুতলার বাড়ি, বেহালার জমি, নিজের নামে লিখিয়ে নেওয়ার জন্যে দয়াময়ীর ওপর সূক্ষ্ম চাপ তৈরি করত অরিন্দম। অরিন্দমের বৌ, সুপর্ণা, কয়েকদিন তোয়াজ করত শাশুড়িকে। তারপর স্বামী-স্ত্রী দুজনে জুড়িয়ে যেত। সম্পত্তি নিয়ে দয়াময়ী কী করতে চলেছে, বুঝতে না পেরে বাঁকা বাঁকা কথা বলতে শুরু করেছিল অরিন্দম। মাকে বলত, তোমার এখন ধর্মকর্ম করার বয়স। বিষয়-সম্পত্তিতে জড়িয়ে আছ কেন?

দয়াময়ী চুপ করে থাকত। এক সকালে বলত, আজ লেবুতলা ফিরব।

দয়াময়ী বাড়ি ফিরে, পরের দিন সকালে বিপাশার বাড়ি চলে যেত। সন্ধেবেলায় লোকনাথ অফিস থেকে ফিরলে বলত, লাখখানেক টাকা দিলে জীবনের বাকি কটা দিন আমাকে থাকতে, খেতে দেবে, বুড়োবুড়িদের থাকার এরকম কোনও ঠিকানা দিতে পার?

পারি।

দয়াময়ীকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে মুচকি হেসে লোকনাথ নিজের বাড়ির ঠিকানা

বলত। তাকে ধমক দিয়ে থামাত বিপাশা। দয়াময়ী মুচকি হাসত। লোকনাথ বলত, খোঁজ করব। তবে আমি বলি, এখানে থেকে যান। মেয়ের বাড়িতে মা থাকতেই পারে।

দয়াময়ী কয়েকদিন থাকত। তারপর কেমন লজ্জা করত। বাড়ির জন্যে হু-হু করত মন। বিয়ের পরে পঞ্চাশ বছর যে বাড়িতে কাটিয়েছে, সে জায়গার মায়া যে ইহজীবনে কাটানো যাবে না, দয়াময়ী জানত। এক সকালে হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসত।

চেতলা এমন একটা জায়গা, যেখানে রাতের যে কোনও সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া যায়। কয়েক পা হেঁটে সেতু পেরলে, শ্মশানের রাস্তার মুখে চব্বিশ ঘণ্টা লাইন দিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। টেলিফোনে দয়াময়ীর মৃত্যুর খবর শুনে রাত তিনটেতে ট্যাক্সি পেতে আমার অসুবিধে হল না। ভোর পৌনে চারটেতে সল্টলেকে বিপাশার বাড়িতে নবনীতা-চুমকিকে নিয়ে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে হাউহাউ করে বিপাশা কেঁদে উঠেছিল। অবাক হয়ে চুমকি দেখছিল মেজপিসিকে। বিছানায় প্রাণহীন দয়াময়ীর পায়ের কাছে আমি বসলাম। মনে হল, ঘুমন্ত মায়ের বিছানায় বসলাম। হাত রাখলাম মায়ের পায়ে। ঠাণ্ডা পা। মানুষের শরীর যে এরকম ঠাণ্ডা হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। তবু আমার মনে হচ্ছিল দয়াময়ী যে কোনও মুহূর্তে ঘুম থেকে জেগে গিয়ে আমাকে দেখে বিছানায় উঠে বসবে। দয়াময়ীর মাথার কাছে বিপাশা বসেছিল। পাশে নবনীতা। চুমকিকে নিয়ে স্বাতী চলে গেল নিজের ঘরে।

দয়াময়ীর জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছিল বিপাশা। মৃত দয়াময়ীর কপালে হাত বুলিয়ে কেঁদে উঠছিল মাঝে মাঝে। গলা বসে যাচ্ছিল। সাড়ে দশটায় রাতের খাওয়া সেরে ক্লান্ত দয়াময়ী ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে গেল সাড়ে এগারটায়। হাঁসফাঁস করছিল। বিপাশা বুঝতে পেরেছিল দয়াময়ীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। অক্সিজেন দেওয়া দরকার। বাড়িতে লোকনাথ নেই। দশদিন অকেজো হয়ে ছিল টেলিফোন। বিপাশা ভয় পেয়েছিল। স্বাতীর ঘুম ভাঙিয়ে একতলা থেকে চৌধুরিমাসিমাকে ডেকে আনতে বলেছিল। চৌধুরিমাসিমা, ছেলে রাতুলকে নিয়ে পাঁচ মিনিটে এসে গিয়েছিল। বিছানায় তখন উঠে বসেছে দয়াময়ী। কষ্টে দু'চোখ বেরিয়ে আসছে, জিভ ঝুলে পড়েছে। দয়াময়ীর মাথার নিচে তিনটে বালিশ দিয়ে তাকে শুইয়ে দিল বিপাশা। মাসিমা হাত বুলোচ্ছিল দয়াময়ীর বুকে। টেলিফোনের পাশে বসে রাতুল নম্বর ঘোরাচ্ছিল। বিপাশা জানত, টেলিফোন খারাপ। সকালেও টেলিফোনে সাড়াশব্দ ছিল না। ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে রাতুলকে কথা বলতে দেখে যেমন অবাক হল, তেমনি ভরসা পেল। ডাক্তারকে ধরা গেছে। আর ভয় নেই। রাতুল বলছিল, দয়া করে একবার আসুন ডাক্তারবাবু। হ্যাঁ, আমার মাসিমা। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। ফি যা লাগবে, দেব।

ডাক্তার কী বলল, বিপাশা শুনতে পেল না। তার হাতে রিসিভার দিয়ে রাতুল বলেছিল, কথা বলুন।

পাড়ার সবচেয়ে নামী ডাক্তার নিরঞ্জন গোস্বামীর সঙ্গে বিপাশা কথা বলেছিল। বিপাশাকে চিনতে পেরেছিল ডাক্তার গোস্বামী। তার বাড়িতে আগেও ডাক্তার কয়েকবার এসেছে। বাড়ি চিনে আসতে তার অসুবিধে হবে না। ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিল, পেশেন্ট আপনার কে?

মা।

কষ্ট কি?

বিপাশা বলতে ডাক্তার যা নির্দেশ দিল, তার সারমর্ম হল, রোগীকে দুটো ঘুমের বড়ি খাইয়ে অক্সিজেন দেওয়া দরকার। অক্সিজেন সিলিন্ডার আসার মধ্যে ডাক্তার নিজে পৌঁছে যাওয়ার আশ্বাস দিল। ঘুমের বড়ি গেলার অবস্থা দয়াময়ীর ছিল না। দুটো ট্যাবলেট গুঁড়ো করে জলে গুলে বিপাশা খাইয়ে দিল দয়াময়ীকে। কিছু পেটে গেল, কষ বেয়ে কিছুটা বালিশে পড়ল। দয়াময়ীর গলায় শ্লেষ্মা জমে যাওয়ার মত ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছিল। ঘামে ভিজে উঠছিল শরীর। সমানে দয়াময়ীর বুকে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল মাসিমা। বিপদের মুহূর্তে টেলিফোন চালু হয়ে যেতে বিপাশা স্বস্তি পেয়েছিল। টেলিফোনে দুই দাদা, দুই ভাই আর দিদিকে মায়ের খবরটা দিতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়। মেয়ের বাড়িতে এসে দয়াময়ীর কিছু হলে বাপের বাড়িতে সে মুখ দেখাতে পারবে না। সকলে দায়ী করবে তাকে।

লেবুতলার বাড়িতে ফোন করতে গিয়ে বিপাশার মনে পড়ল, সেখানকার টেলিফোনের সংযোগ, দুমাস হল কেটে দিয়ে গেছে টেলিফোন দপ্তর। ফোনের বিল বাকি পড়েছিল। বিলের টাকা কে মেটাবে, ফয়সালা করতে বসে দেবপ্রতিম-কিশলয়ে হাতাহাতি হতে বাকি ছিল। বিল মেটানোর দায়িত্ব তারা নতুন করে দয়াময়ীর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছিল। দয়াময়ী দায়িত্ব নেয়নি। চন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পরে প্রথম বছরটা বাড়ির ট্যাক্স, টেলিফোনের বিল, সব সে দিয়েছিল। জমানো টাকা ভেঙে চালিয়েছিল এ সব খরচ। টেলিফোনের হাজার টাকা, মাসের বিদ্যুৎ খরচ সাত-আটশ টাকা সে মেটাত। তিন মাস অন্তর বাড়ির ট্যাক্স বাবদ দিত তেরশ ত্রিশ টাকা। এক বছরের বেশি এই হাতির খরচ টানা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রথমে টেলিফোন বিল, পরের মাসে বিদ্যুৎ খরচ দেওয়া বন্ধ করেছিল। বাড়ির জন্যে পুরকরের টাকা অবশ্য নিয়মিত দিয়ে গেছে। দয়াময়ীকে কিশলয় বোঝাতে চেয়েছিল চন্দ্রনাথ সেনের যাবতীয় ভূসম্পত্তির কর মেটানোর দায় দয়াময়ীর। কারণ দয়াময়ীই সব কিছুর মালিক।

চন্দ্রনাথের উইল দয়াময়ী দেখতে চাইলে কিশলয় বলেছিল, বাবা কোনও উইল না রেখে গেলেও স্থাবর সব সম্পত্তি, যে তোমার নামে কিনেছিল, আত্মীয়, বন্ধু সকলে জানে। সম্পত্তি দেখভালের দায়, শেষদিন পর্যন্ত তোমার।

কিশলয়ের যুক্তিতে দয়াময়ী তেলেবেগুনে জ্বলে গেলেও মুখ খোলেনি। দেবপ্রতিম এককাঠি সরেস। দয়াময়ীর সঙ্গে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের খরচের অর্ধেক কিশলয়ের ঘাড়ে সে চাপাতে চাইল।

টেলিফোনে লেবুতলার বাড়ি পাওয়া যাবে না, খেয়াল হতে রাত সাড়ে বারোটায় যোধপুর পার্কে অরিন্দমকে বিপাশা ফোন করল। ফোন বেজে গেল। কেউ ধরল না। সুইচ টিপে আলো, পাখা নেভানোর মত অরিন্দমের বাড়িতে টেলিফোন বোবা করে রাখার সুইচ আছে। রাত এগারটায় সুইচ টিপে টেলিফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাড়ির টেলিফোন তখন নিষ্কর্মা হয়ে যায়। অরিন্দমকে না পেয়ে রাত পৌনে একটায় বিপাশা ফোন করেছিল আমাকে। আমার টেলিফোন বাজেনি। কেন বাজল না, আমি জানি না।

রাত বাড়ছিল। শ্বাসকষ্টের মধ্যেও ছেলেদের কাউকে টেলিফোনে পাওয়া গেল

কিনা, জানার জন্যে দয়াময়ী কান খাড়া করেছিল। করুণ হয়ে উঠেছিল তার দৃষ্টি। পাঁচ ভাইবোনের কোনও একজনকে পেতে একটার পর একটা নম্বর বিপাশা ঘুরিয়ে যাচ্ছিল। সংযোগ করতে না পেরে হতাশায় অস্থির হচ্ছিল। দয়াময়ীকে ঘুম পাড়াতে চাইছিল চৌধুরিমাসিমা। বলছিল, দিদি, একটু ঘুমনোর চেষ্টা করুন। অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে রাতুল এখনই এসে যাবে। আপনাকে আর কষ্ট পেতে হবে না।

ভয়ে কাঁপছিল বিপাশা। স্বাতীকে ডেকে ফোনে বসিয়ে সে বিছানায় দয়াময়ীর কাছে গেল। গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ না কমলেও দয়াময়ী ছটফট করছিল না। মায়ের পায়ে হাত রাখতে পাতা দুটো বিপাশার ঠাণ্ডা লাগল। দয়াময়ীর পায়ের পাতা দুটোকে হাত ঘষে সে গরম করতে চাইছিল। ধীরে ধীরে গরম হচ্ছিল দুটো পা। স্বাতী হঠাৎ বলেছিল, মা, ফোনে যোধপুর পার্কের মামি।

স্বাতী কথা শেষ করার আগে ফোনের কাছে বিপাশা পৌঁছে গিয়েছিল। সুপর্ণাকে বলেছিল, বড়দাকে দাও।

পরশু টোকিও গেছে। সেখান থেকে যাবে হংকং। তরশুর পরের দিন ফিরবে।

এক মুহূর্ত থেমে সুপর্ণা জিজ্ঞেস করেছিল, কী হয়েছে বল তো?

অরিন্দমের বিদেশে থাকার খবর শুনে বিপাশার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। কান্না গিলে দয়াময়ীর অসুস্থতার খবর দিয়ে বলেছিল, লোকনাথ দিল্লিতে। লেবুতলার ফোন অকেজো। চেতলায়, টেলিফোনে চন্দনকে পাচ্ছি না। অথৈ জলে পড়ে গেছি। জয়কে নিয়ে তুমি কি আসতে পারবে?

সুপর্ণা বলেছিল, এত রাতে কী করে যাব? আমাদের ড্রাইভার আসবে সকাল আটটায়। সে এলেই রওনা দেব।

রিসিভার রেখে বিপাশা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। অরিন্দমের উনিশ বছরের ছেলে জয়দীপ যে গাড়ি চালাতে ওস্তাদ, বিপাশা ভুলে গিয়েছিল। কাছাকাছি যে দুটো ওষুধের দোকান রাতে খোলা থাকে, সেখানে কোথাও অক্সিজেন সিলিন্ডার না পেয়ে রাতুল ফিরে এসেছিল। আধঘণ্টা কেটে গেলেও ডাক্তার গোস্বামীর দেখা নেই। দয়াময়ীর গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ কমেছে। স্বাভাবিক হয়েছে শ্বাসপ্রশ্বাস। পায়ের পাতা আগের মত ঠাণ্ডা নয়। বিপাশার মনে হল, দয়াময়ী ঘুমিয়ে পড়েছে। চৌধুরিমাসিমাকে ফিসফিস করে বিপাশা বলেছিল, মা ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনাকে আর আটকাব না। আপনি ঘুমোতে যান।

রাতুলকে নিয়ে চৌধুরিমাসিমা নিঃশব্দে চলে যাওয়ার আগে বিপাশাকে বলেছিল, দরকার হলে ডেক।

টেলিফোন বেজে উঠল। তৃতীয়বার বাজার আগে রিসিভার তুলে নিল বিপাশা। ডাক্তার গোস্বামী জিজ্ঞেস করল, পেশেন্ট কেমন?

মনে হচ্ছে ঘুমিয়েছে।

ঘুমোতে দিন। জানতাম, যাওয়ার দরকার হবে না। বেরনোর আগে ফোন করলাম। সকালে আবার খবর দেবেন।

টেলিফোনের কাছে কিছুক্ষণ বসে থেকে রাত সওয়া একটায় দয়াময়ীর পাশে এসে বিপাশা শুয়েছিল। তন্দ্রা আসছিল, আবার ছুটে যাচ্ছিল। পাঁচ-সাত মিনিটের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত দুটো নাগাদ জানতে পারল, মা নেই।

বাইরে অঝোর বৃষ্টির মধ্যে দয়াময়ীর পালঙ্কে আমি ভূতের মত বসেছিলাম। ফাঁকা ঘরে ছড়িয়ে ছিল মাতৃস্মৃতি। পালঙ্কের মাথার কাছে সবগুলো বালিশ স্তূপাকার করে সাজিয়ে সাদা চাদরে দয়াময়ী ঢেকে রাখত। বালিশের স্তূপ আগের মত রয়েছে। দেওয়ালে অঘোরবালার ছবিতে ঝুলছে শুকনো ফুলের মালা। বাৎসরিকের দিন সকালে মায়ের ছবিতে মালা পরিয়েছিল দয়াময়ী। জানলার হলুদ রঙের হাফ পর্দা লাগিয়েছিল পুজোর আগে। বৃষ্টিতে ভিজে সপসপ করছিল পশ্চিমের জানলার পর্দা। আবছা অন্ধকার ঘর। সবুজ দেওয়ালে ঝুলছে পিতৃ-মাতৃকুলের তিনপুরুষের ছবি। পালঙ্কের ওপর ধীরে ধীরে আমি শরীর এলিয়ে দিলাম। ছেলেবেলায় যে পালঙ্কে দয়াময়ীর পাশে শুয়েছি, সেখানে পাতা গদি, লেপ, চাদরের স্তরে স্তরে ছড়ানো মায়ের শরীরের গন্ধ পাচ্ছিলাম। নির্বাণ ধূপের মত সেই গন্ধ। চন্দন সুবাসিত এই ধূপ বহু বছর দয়াময়ী ব্যবহার করেছে। দয়াময়ীর শরীরে এই গন্ধ লেগে গিয়েছিল। আমি অনুভব করলাম, গন্ধটা প্রখর হচ্ছে। কেউ যেন ধূপটা জ্বেলে ঘরে রেখে গিয়েছিল। আবছা তন্দ্রার মধ্যে গন্ধের সঙ্গে মিশে এসে হাজির হচ্ছিল কত যে মাতৃস্মৃতি। পালঙ্কের নিচে কোনও কৌটোতে খানিকটা ডালিয়া হয়ত পড়ে আছে। আলাদা কাচের শিশিতে আছে ঝালের বড়ি, ভাজার বড়ি। আচার, কাসুন্দি সারা বছর থাকত। ছোট শিশিতে মজুত গাওয়া ঘি কখনও ফুরত না। ঘরের কোনাতে আমার ভিজে ঝোলার মধ্যে ছিল দয়াময়ীর লেখা হিসেবের দুটো পাতা। চেকবই থেকে পাতা দুটো ছিঁড়ে, দুপুরে অমল কর নামে এক ব্যাঙ্ককর্মী দিয়েছিল আমাকে। মাতৃস্মৃতি শব্দ তখনও ঝমঝম করে মাথাতে বাজছিল। দয়াময়ীর হাতে লেখা হিসেবের পাতা দুটো ব্যাঙ্কে অমলের সামনে না দেখলেও পালঙ্কে বসেই মুহূর্তে দেখতে ইচ্ছে করেছিল। পালঙ্ক থেকে নেমে ঝোলা খুলে সন্তর্পণে বই, কাগজপত্র টাকার বান্ডিল এক এক করে বার করলাম। জলে ভিজে তাল পাকিয়ে গেছে খুচরো কাগজ। প্রতিটা কাগজ সাবধানে আলাদা করে হিসেবের কাগজ দুটো পেলাম। চোখের সামনে কাগজের টুকরো দুটো সযত্নে ধরে দয়াময়ীর হস্তাক্ষর দেখতে চাইলাম। দুটো কাগজে কোথাও দয়াময়ীর হস্তাক্ষর নেই। কালিতে লেখা সংখ্যা, বৃষ্টিতে ধুয়ে দয়াময়ীর থানের চেয়ে বেশি সাদা হয়ে গেছে। টাকার বান্ডিল আগের মত রয়েছে। ভাঁজে ভাঁজে জল ঢুকলেও মুদ্রিত হরফে আঁচড় পড়েনি। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আমার মনে হয়েছিল, আজ এখনই যেন আমার মাতৃবিয়োগ হল। শোকোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে দিল আমাকে। মা মারা যাওয়ার একমাস পরে উথলে উঠল মাতৃশোক। মাতৃহীন হওয়ার কষ্ট সেই প্রথম অনুভব করলাম। ঘরের দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে বন্ধ করে দিলাম। মাঝবয়সী একজন লোককে ফাঁকা ঘরে বসে বাড়ির কেউ কাঁদতে দেখলে পাগল ভাবতে পারত। ভাবতে পারত নেশা করে এসেছে। ভাবলে কিছু করার ছিল না। কুড়ি বছর আগে চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর সংসারে আমি ভাঙন ধরিয়েছিলাম। বিষিয়ে দিয়েছিলাম দুজনের সম্পর্ককে। দয়াময়ীর কাছে স্বীকারোক্তি না করে আমি পালিয়ে থেকেছি। সেখানে শেষ হয়নি আমার অপরাধ। কেউ না জানলেও পনের হাজার টাকার জন্যে মাতৃনিধন চেয়েছিলাম। বিছানায় সাজানো বালিশের স্তূপে মুখ গুঁজে বললাম, মা আমাকে ক্ষমা কর। হাত রাখ আমার মাথায়।

একুশ

বৃষ্টি থেমে গেলেও শেষ বিকেলে অন্ধকার হচ্চিল চারপাশ। সন্ধে হচ্ছিল। তুমুল বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে আকাশে স্থির হয়েছিল কালো মেঘ। জলে-হাওয়ায় স্যাঁতসেঁতে হয়েছিল চারপাশ। পিছল রাস্তায় সাবধানে পা ফেলছিলাম। দোকানপাট খোলা থাকলেও রাস্তায় মানুষজন বিশেষ ছিল না। রাস্তার আলো জ্বলেনি। অথচ রাস্তাতে আলোর অভাব ছিল। লেবুতলার বাড়ি থেকে ভিজে ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে বৌবাজারের দিকে কিছুটা যেতে আমার সামনে আচমকা দুজন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিল। বলার ভুল হল। আমার সামনে তারা দাঁড়ায়নি। রাস্তার ধারে দোকান থেকে সিগারেট কিনে, দাম দিয়ে আমি ঘুরে দাঁড়াতেই তাদের মুখোমুখি হয়েছিলাম। দোকানিকে তাদের একজন চন্দ্রনাথ সেনের বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে পথের হদিস করেছিল। চন্দ্রনাথ সেনের নাম শুনে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। অচেনা দুজনের মধ্যে কমবয়সী ছেলেটার মুখ দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। দুজন সমান অচেনা নয়। মাঝবয়সী লোকটা অচেনা হলেও কিশোরটিকে মনে হল ভীষণ চেনা মুখ। অনেক বছর ধরে মুখটা দেখছি। তাদের পোশাক, রকমসকম দেখে বুঝে গিয়েছিলাম দুজনই গ্রামের মানুষ। খোঁচাখোঁচা দাড়ি, শেকড়ের মত কালচে শরীর, মাঝবয়সী পরেছিল আধময়লা শার্ট। পনের ষোলর রোগা ছেলেটার গায়ে ঝুলছিল লাটখাওয়া ফুলপ্যান্ট-শার্ট। দুজনকে বাবা-ছেলে মনে হলেও তাদের মুখের আদল ছিল আলাদা। পুরনো পাড়া। চারপাশে অনেক চেনাজানা মানুষ। তাদের কারও মুখোমুখি হয়ে যেতে পারি ভেবে, আমার বুক ধড়ফড় করছিল। সিগারেট দোকানির কাছ থেকে চন্দ্রনাথ সেনের বাড়ির হদিস না পেয়ে তারা আর কাউকে জিজ্ঞেস করার আগে দুজনকে আমি ডেকে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, চন্দ্রনাথ সেনের বাড়ি আমি চিনি। আমার সঙ্গে আসুন।

মাঝবয়সী লোকটা অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল। হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে তার অক্লান্ত মুখে খুশি ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজছিল। প্রথম নজরে অল্পবয়সী ছেলেটাকে দেখে আমি যা বুঝেছিলাম, আমাকে দেখে মাঝবয়সী মানুষটা সেরকম কিছু বুঝলেও মাথায় নিতে পারছিল না। আমাকে কোথায় দেখেছে, ঠাহর করতে না পেরে সে ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। তাদের নিয়ে কোলেবাজারের হিজিবিজি ভিড়ের দিকে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। বৃষ্টি ভেজা সন্ধেতে কোলেবাজারের রাস্তাতেও বিশেষ ভিড় ছিল না। দুজনকে নিয়ে গয়নার দোকানের চড়া আলোর পরিধির বাইরে থাকতে চাইছিলাম। উইলিয়ামস্ লেনের মুখে ঝুপড়ি চা দোকানের ফাঁকা বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। দুই সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম, চা-বিস্কুট খাবেন?

আমার শরীরের স্নায়ুগুচ্ছ তারসানাই-এর মত একটানা তিরতির করে কাঁপতে থাকলেও আমি শান্ত থাকতে চাইছিলাম। স্বাভাবিক গলায় কথা বলছিলাম। আমার চা খাওয়ার ডাকে তারা সাড়া দিল। তিনজনের জন্যে চা-বিস্কুট দিতে বলে ফুটপাতে পেতে রাখা কাঠের একটা খালি বেঞ্চিতে পাশাপাশি আমরা বসলাম। তিনজন বসার পরে বেঞ্চিতে আর জায়গা থাকল না দেখে খুশি হলাম। ছেলেটার মুখের দিকে আমি বারবার কখনও আড়চোখে, কখনও সরাসরি তাকাচ্ছিলাম। আমাদের পরিবারে মুখের

গঠনে যে বংশানুক্রমিক ছাপ আছে, এ সেই মুখ। চৌকো চোয়াল, চোখা নাক, নরুনচেরা চোখ, লম্বা চিবুক, আর্য অস্ট্রিক, মোঙ্গল রক্তের মিশেল বুঝতে অসুবিধে হয় না। আমার ঠাকুর্দা রাজনারায়ণ সেন, তার ছেলে, আমার বাবা চন্দ্রনাথ সেন আর তাদের পরিবারের অধস্তনরা যে ভারতীয় মহামানবের সাগরতীরের সন্তান, এক নজরে চেনা যেত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অজ পাড়াগাঁ থেকে সেরকম মুখায়বের এক কিশোর দুর্যোগের সন্ধেতে জুটে গেলে হৃদযন্ত্রে কাঁপুনি জাগা স্বাভাবিক। তাকে আবার পাশে ডেকে বসাতে হয়েছে। তার নাম কী, বয়স কত, চন্দ্রনাথ সেন আর তার ছেলে চন্দন সেনের সঙ্গে এই তরুণের মুখের এত মিল কীভাবে ঘটল, প্রশ্নের খোঁচায় আমি জর্জরিত হলেও প্রমীলা কয়ালের স্বামী নিবারণ কয়াল আর সেন পরিবারের মুখশ্রী মেলানো, তাদের ছেলে ভবদেব কয়ালের সঙ্গে মেপে কথা বলছিলাম। সামান্য বেতাল হলে চলবে না। মেঘ ডাকছিল আকাশে। থেকে থেকে বিদ্যুতের আলো ছিটকে উঠছিল। গ্লাসভর্তি চায়ের সঙ্গে ছ'টা করে সুজির বিস্কুট খেয়ে দুজন সরল মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল আমাকে। পাঁচ বছর আগে লেবুতলার বাড়ির কর্তা চন্দ্রনাথ সেন মারা গেছে শুনে নিবারণ যতটা হায় হায় করে উঠেছিল, তিন হপ্তা আগে পৃথিবী ছেড়ে গিন্নিমা দয়াময়ীর চলে যাওয়ার খবরে তার দশগুণ ভেঙে পড়েছিল। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল চন্দ্রনাথ-দয়াময়ীর মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তারা আমার সমান শোক পেয়েছে। প্রমীলার স্বামী নিবারণ অভিনয় করছে কিনা, আমি বুঝতে পারছিলাম না। পনের বছরের বেশি আগে আমাদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ ছেড়ে প্রমীলা কুলপিতে তার গ্রামে চলে যাওয়ার পরে আমার মনে যতরকম দুশ্চিন্তা জেগেছিল, সেই সন্ধেতে সব তেঁড়েফুঁড়ে ফিরে এল। আমি ভাবছিলাম, ভবদেব কে? তার বয়স কত? ভবদেবের বীজ কি প্রমীলার গর্ভে আমাদের বাড়ি থেকে পোঁতা হয়েছিল? চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ে প্রমীলা কি গর্ভবতী ছিল? অন্তঃসত্ত্বা বৌকে কি নিবারণ শনাক্ত করতে পারেনি? সে কি ভেবেছিল প্রমীলা ঘরে ফেরার পরে তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে? চা দোকানের বেঞ্চে বসে পনের মিনিটের মধ্যে নিবারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, যে, সেনবাড়ির হালচাল আগের মত নেই। পনের বছরে পুরো বদলে গেছে। সেখানে গিয়ে কোনও সুফল মিলবে না। কেউ চিনবে না তাদের।

হতাশায় নিবারণের ঘাড় যখন ঝুলে পড়েছে, তার সংসারের খবর জানতে চেয়েছিলাম। মুখে না বললেও প্রমীলার খবরাখবরে আগ্রহ ছিল বেশি। বিশেষ করে একটা খবরই শুনতে চাইছিলাম। গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে দশ মাসের মধ্যে প্রমীলা কি কোনও সন্তানের জন্ম দিয়েছিল? আমার পাশের ছেলেটা যার নাম ভবদেব, সে কে? ভবদেবই কি সেই সন্তান? সেন-পরিবারের আদলে গড়া মুখের ছেলেটাকে কি লেবুতলার বাড়িতে আমাকে ভয় দেখাতে প্রমীলা পাঠাল? প্রমীলা কি আমাকে ব্ল্যাক্‌মেল করে টাকা আদায় করতে চায়? আমি টের পাচ্ছিলাম, দয়াময়ীকে ঠকানোর মাসুল কড়ায়-গন্ডায় আমাকে শোধ করতে হবে। নবনীতা-চুমকিকে নিয়ে সাজিয়ে তোলা আমার সংসারে অশান্তির ঝড় উঠতে দেরি নেই।

নিবারণের সঙ্গে রফা করতে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, চন্দ্রনাথ সেনের বাড়ি

তোমরা খুঁজছ কেন? তোমরা কী চাও?

আমার প্রশ্ন শুনে শার্টের বুক পকেট থেকে হাসপাতালের একটা আউটডোর টিকিট বার করে নিবারণ বলল, বুকে ব্যথা নিয়ে শ্যালদার হাসপাতালে আমার বৌ প্রমীলা বেহুঁশের মত পড়ে আছে। কুলপির স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রথমে তাকে নিয়ে গেছলাম। সেখানকার ডাক্তারবাবু একদিন রেখে কলকাতার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। বড় হাসপাতালে বড় ব্যাপার। এখানকার ডাক্তারবাবু যে ওষুধের ফর্দ নিকে দ্যাচেন, তা কেনার সামত্থ আর নেই। সেনকর্তার ঠিকানা ইস্তিরির মুখে একশোবার শুনে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। ভাবলাম, দেখি ওষুধের টাকা যদি জোগাড় হয়!

নিবারণের কথা শুনে আমার মাথায় দপদপানি কিছুটা কমেছিল। নিবারণ ফের বলল, রাত দশটার মধ্যে রুগীর শরীরে ছুঁচ ফুঁড়ে একটা ওষুধ না ঢোকালে, তাকে বাঁচানো যাবে না। তার হাত থেকে ওষুধের নাম লেখা হাসপাতালের কাগজটা নিয়ে সেটার ওপরে চোখ বোলালাম। রুগির নাম, প্রমীলা কয়াল, বাড়ি কুলপি, বয়স চুয়াল্লিশ। রোগের নাম পড়তে না পারলেও ওষুধের ফর্দ পড়তে অসুবিধে হলনা। ফর্দের প্রথম নাম সেই জীবনদায়ী ইঞ্জেকশন, স্ট্রেপটোকিনেস, দাম সাড়ে তিন হাজার টাকা। ইঞ্জেকশনের দাম, ঘটনাচক্রে দুটোই জানা ছিল। বাকি তিনটে ওষুধের দাম কত হতে পারে? যাই হোক, টাকার অভাব হবে না। কাঁধের ঝোলায় আঠারো হাজার সাতশ বাহাত্তর টাকার বান্ডিল থাকতে টাকা নিয়ে কেন দুশ্চিন্তা করব? টাকা নিয়ে ভাবছিলাম না, অন্য খাতে বইছিল আমার চিন্তা। ভবদেবকে যত দেখছিলাম আমার বুকের ভেতরে স্নেহের জোয়ার তত উদ্বেলিত হচ্ছিল। চুমকির চেয়ে দু-তিন বছরের বড় চুমকির দাদা মনে হচ্ছিল তাকে। নিবারণকে বললাম, চলুন ওষুধ আমি কিনে দেব। আমার কথা শুনলেও সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবিশ্বাস করার শক্তিও তার ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, চন্দ্রনাথ সেনের বাড়ি খুঁজছিলেন কেন?

আমার বৌ ওনাদের বাড়ি কাজ করত।

তারপর?

এক বছরের বেশি কাজ করতে পারল না।

আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলেও প্রশ্ন করলাম, কেন?

ঘরের জন্যে মন কাঁদছিল। দুটো বাচ্চা ছিল ঘরে। বড় মেয়ে, ছোটটা ছেলে। সেই ছেলে এই ভবদেব। পেটের ছেলেমেয়েকে ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে কোন মা কাজ করতে চায়? কাঁচা টাকা রোজগারের জন্যে আমি পাঠিয়েছিলাম। বৌ থাকতে পারল না। যাদের বাড়িতে ছিল, তারা খুব ভালমানুষ। প্রমীলা চাকরি ছেড়ে আসার পরে দু'বছর কর্তাবাবু টাকা পাঠিয়েছিল। কর্তাবাবুর হয়ে টাকা দিয়ে যেত তেনার নায়েব কুণ্ডুবাবু। আমাদের পাশের গ্রামে কুণ্ডুবাবু থাকত। সে-ও মরে গেছে।

নিবারণের সব কথা আমার কানে ঢুকছিল না। সিগারেট দোকানের সামনে যে ছেলেটার মুখের গঠন অবিকল আমার মুখের মত মনে হয়েছিল, সেনবংশের রাজনারায়ণ চন্দ্রনাথের অধস্তনের মুখ ভেবেছিলাম, তার জন্মপরিচয় জেনে পাখির পালকের মত আমি হালকা হয়ে গেলাম। শিয়ালদার ওষুধ-দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম, ভবদেবের মুখ, চারপাশের সব মুখ, আমার মুখের মত।

লক্ষ, কোটি মুখের সঙ্গে আমার মিল রয়েছে। নিবারণের মুখের আদলও আমার মত। লেবুতলার বাড়ির সেই দুঃস্বপ্নের রাত হঠাৎ দেওয়ালির রাত হয়ে গেল। চারপাশে আলো-বাজির ফোয়ারা ছুটেছে। কোথাও একবিন্দু অন্ধকার নেই। নিবারণের একটা কথায় আমার মাথা থেকে পাহাড় নেমে গেল। কে নামাল? বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। আলোর ঝলকে দেখলাম, আকাশ জুড়ে দয়াময়ীর হাসি। দিগন্তের রুপোলি ফ্রেমে আটকানো রয়েছে তেলরঙে আঁকা চন্দ্রনাথের ছবি। তার মুখে ছড়িয়ে রয়েছে অনাবিল প্রসন্নতা। ভিজে ঝোলার ভেতর থেকে নোটের বান্ডিল খুলে ওযুধের দাম, সাত হাজার তিনশ একুশ টাকা মিটিয়ে দিলাম। ওযুধের রসিদ নিয়ে দেখলাম স্ট্রেপটোকিনেসের মত টারগোসিড নামে একটা দামি ইঞ্জেকশন রয়েছে। দুটো ইঞ্জেকশনের দাম বাইশ'শ পঞ্চাশ টাকা।

দোকানের বাইরে এসে রুগির টিকিটে লেখা হাসপাতালের ওয়ার্ডের নাম, বেড নম্বর দেখে নিয়ে নিবারণকে বললাম, ওযুধ নিয়ে হাসপাতালে চলে যান। কাল বিকেলে আমি রুগিকে দেখতে যাব।

নিবারণ অভিভূত। কী বলবে ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, আসবেন তো?

নিশ্চয় যাব।

ভবদেবের মুখে বিস্ময় মাখামাখি। সে দেখছিল আমাকে। তার মুখে আমি দেখছিলাম আমার কৈশোর। পৃথিবী যখন কিশোর ছিল, তখনকার সরলতাও হয়ত নজরে পড়ছিল। ফ্লাইওভারের কাছে এসে নিবারণকে বললাম, দাঁড়ান।

চাপা আলোয় ধূসর হয়ে ছিল ব্রিজের মুখ। ঝোলা থেকে নোটের বান্ডিল বার করে চারশ একান্ন টাকা নিজের কাছে রেখে, দশ হাজার টাকা নিবারণের হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, আপনার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে দশ হাজার টাকা রাখুন। সাবধানে রাখবেন।

টাকার বান্ডিলটা তাড়াতাড়ি তাকে হাতের থলিতে ঢোকাতে বললাম। নিবারণ তাই করল। ফ্যালফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ভবদেবের হাত ধরে হাসপাতালের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার হাঁটার ধরন দেখে মনে হল, ভয় পেয়ে সে দৌড়চ্ছে। ভয় যে সে পেয়েছিল, সন্দেহ নেই। টাকার বান্ডিলটা আমি ফেরত চাইলে তার কিছু করার ছিল না। সে সুযোগ আমাকে সে দিতে চায়নি।

হাসপাতালের ভেতরে ভবদেবকে নিয়ে নিবারণ ঢুকে যেতে বাসে উঠে আমি চেতলায় ফিরেছিলাম। বলা বাহুল্য, পরের দিন বিকেলে হাসপাতালে যাইনি। প্রমীলা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছিল কিনা, জানি না। নিশ্চয় ফিরেছিল। আমার হাত দিয়ে দয়াময়ীর আশীর্বাদ, তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার উপায় তার ছিল না। আমার বিশ্বাস, সে নতুন জীবন পেয়েছে। লেবুতলার বাড়িতে গত পাঁচ বছর নিবারণ আসেনি।

পিতৃপক্ষের দুপুর শেষ হওয়ার আগে বৃষ্টি ধরে এলেও কুঁচো কালো মেঘের আড়ালে মুখ ভার করে আছে আকাশ। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে একনাগাড়ে। তর্পণের ঘাট যে কখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, খেয়াল করিনি। আমি যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে জেগেছিলাম, না জেগে ঘুমোচ্ছিলাম, বুঝতে পারলাম না।

ঘড়িতে নতুন ব্যাটারি ঢুকিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। আমি কেমন ধাঁধা খেয়ে গেলাম! দুপুর বারোটা অনেকক্ষণ পেরিয়ে এসেছি, অনুমান করতে অসুবিধে হলো না। তারপর আরো কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। মনে হচ্ছে অনন্তকাল কেটে গেছে। সময়ের উল্টোদিকে আমি বসে আছি। তর্পণ সেরে বিকাশ কি বাড়ি ফিরে গেল? তা সম্ভব নয়। যতো বৃষ্টিই হোক, বৃষ্টির জলে পৃথিবী ভেসে গেলেও আমাকে না নিয়ে বিকাশ বাড়ি ফিরবে না। হাজার দুর্যোগেও কংক্রিকেটর এই ছাতার তলায় আমাকে খুঁজতে আসবে। বিকাশ আসেনি। তাহলে সে গেল কোথায়? ভরা গঙ্গা এখনো কি সে সাঁতার কাটছে?

গাছপালার মধ্যে দিয়ে ভিজে বাতাস বইছে। গঙ্গা থেকে ভেসে আসছে ছলাৎছল জলের আওয়াজ। মানুষের গলা শুনতে স্নানের ঘাটের দিকে কাল পেতে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকলাম। সেদিকে কোনো শব্দ নেই। একটা কথা শানে এলো না। চারপাশ হঠাৎ যেন ভারি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সিমেন্টের ছাতার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। গাছের ডালপাতা থেকে টুপটুপ করে জল পড়ছে। ঝিরঝির বৃষ্টির সঙ্গে বইছে জোলো বাতাস। ঘাটের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কয়েকজন পড়তে দেখলাম, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কয়েজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা কিছু দেখছে। জোয়ার সরে গিয়ে ভাটা শুরু হলেও বর্ষার গঙ্গায় ফুলে-ফেঁপে উঠছে জলের স্রোত। অচেনা মানুষগুলোর সঙ্গে নজর মিলিয়ে দেখলাম, মাঝগঙ্গায় দুটো সাদা লঞ্চ উল্টোমুখো জল কেটে ছুটে যাচ্ছে। কিছুটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে গতি কমিয়ে লঞ্চ দুটো মুখোমুখি হলো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। সারা দুপুর বৃষ্টির জলে ধুয়েছে পিচের রাস্তা। কালো রাস্তা চকচক করছে। রাস্তার ইতস্তত জমে থাকা ছিটেফোঁটা গুঁড়ো বৃষ্টি নকশা কাটছে। বৃষ্টিতে ভিজজে আমার মাথা, আধভেজা পোশাক। ফোর্ট উইলিয়ামের সবুজ ঘাস জলে সপসপ করছে। রাস্তার জল ছিটিয়ে উত্তর, দক্ষিণে ছুটে চলে দু'একটা গাড়ি। গঙ্গার ধারে এমন থমথমে বিকেলে আগে কোনদিন দেখিনি। ফোর্ট উইলিয়ামের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা তিন, চারটে গাড়ির মধ্যে কোনটা বিকোশের, দূর থেকে বুঝতে পারলাম না। ক্রিম রং-এর দুটো গাড়ির একটা হতে পারে। নম্বর না দেখে চেনার উপায় নেই। বিকাশ চলে গিয়ে নাা দেখে চেনার উপায় নেই। বিকাশ চলে গিয়ে থাকলে তার গাড়ি এখানে থাকার কথা নয়।

বিকাশ বাড়ি ফিরে গেছে ভেবেও তা মেনে নিতে পারছিলাম না। তেমন হওয়ার কথা নয়। আত্মীয় বন্ধুদের সম্পর্কে একজন মানুষের মনে আস্থার নানা স্তর থাকে। সর্বোচ্চ স্তরে বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে থাকে সম্ভ্রম, নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। আমার বিশ্বাসের সেই স্তরে রয়েছে বিকাশ। মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে আমাকে একা ফেলে চলে যাওয়ার মানুষ সে নয়। বিকাশ এখানে আছে। গঙ্গায় সে হয়তো সাঁতার কাটছে। সাঁতার কেটে সে আনন্দ পায়। আরাম পায়। তর্পণের অজুহাতে গঙ্গায় নেমে সত্যি কি মৃত প্রিয়জনদের সান্নিধ্য পায়? হয়তো পায়। জল ছেড়ে তাই তাড়াতাড়ি উঠতে পারে না। গঙ্গার মাঝ বরাবর জল কেটে দু'দিকে ছুটে চলেছে দুটো সাদা লঞ্চ। স্রোতের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে লঞ্চজোড়া কি খুঁজছে, বুঝতে পারলাম না। গুটি গুটি পায়ে ঘাটে

গিয়ে দাঁড়ালাম। ছাতার তলা থেকে ঘাটে যে দু'তিন জন মানুষকে দেখছিলাম, কাছে গিয়ে টের পেলাম, তারা পুলিশ। স্থল পুলিশের সঙ্গে সাদা উর্দিপরা দু'জন জলপুলিশও রয়েছে। মাঝ-গঙ্গায় আবার দাঁড়িয়ে গেছে একটা লঞ্চ। লঞ্চ থেকে ডুবরির পোশাক পরা একজন মানুষ টুপ করে জলের তলায় চলে যেতে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

থেমে যাওয়া লঞ্চটার চারপাশে দ্বিতীয় লঞ্চটা আঁতিপাঁতি করে কিছু খুঁজছে। ওয়াকিটকিতে জল পুলিশের অফিসার বলল, হ্যালো, কিছু দেখতে পাচ্ছো? না! ব্যাস। এবার থামো। অপারেশন্ ইজ্ ওভার। আটচল্লিশ ঘণ্টা না গেলে 'বডি' ভেসে উঠবে না। তুমি জল থেকে উঠে এসো। বিকাশবাবুর বাড়ির লোকদের যা বলার আমি বলে দিচ্ছি।

অফিসার চাপা গলায় কথা বললেও প্রত্যেকটা শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। বিকাশের নাম কানে আসতে ঝিমঝিম করতে থাকল আমার মাথা। সুইচ্ টিপে ওয়াকিটকি বন্ধ করে পাশের পুলিশ অফিসারকে জলপুলিশের লোকটা বলল, আর খুঁজে লাভ নেই। মানুষটা জলে ভেসে গিয়ে না থাকলে গঙ্গায় তার 'লাস্' আসবে কোথা৷ থেকে? সাঁতার জানা লোক চট করে ভেসে যায় না। 'বডি' পাওয়ার কোনো 'চান্স্' নেই। বিকাশবাবুর ঠিক কি ঘটেছে আগে জানা দরকার। জল থেকে ওঠার পরেও অ্যাক্সিডেন্ট্ ঘটতে পারে।

জলপুলিশের অফিসারের কথাগুলো বুঝতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। গঙ্গায় তর্পণ করতে এসে বিকাশ নিখোঁজ। দুর্যোগের দুপুরে গঙ্গায় সে ভেসে গেছে। গেছে কি? জল পুলিশের কথায় আমার মনে হলো, তারা অন্যরকম ভাবছে। পাকা সাঁতারু বিকাশের গঙ্গায় ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। বিকাশ কোথায় গেল? বিকাশকে খোঁজাখুঁজি নিশ্চয় কয়েক ঘণ্টা আগে শুরু হয়েছে। বিকাশের বাড়ির লোকেরা তার নিখোঁজ হওয়ার খবর জানার পরে থানা, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বিকাশের সঙ্গে সকালে আমিও যে এসেছিলাম এতোক্ষণে সে ঘটনাও জানাজানি হয়ে গেছে। বিকাশের গাড়ির চালক বাদল, খবরটা সকলকে জানিয়ে দিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। বিকাশের খোঁজে তার পরিবারের মানুষের মতো আমার বাড়িতে নবনীতা, চুমকি, অন্য সবাই, আমাকে খুঁজতে শুরু করেছে। আমার এখনই বাড়ি ফেরা দরকার। বাড়ির লোকদের উদ্বেগ কাটানোর জন্যে ফেরা জরুরি। বিকাশকে খুঁজতে আমারো কিছু করার আছে। কিন্তু বিকাশ গেল কোথায়? জলে ভেসে যাওয়ার মতো বেআক্কেলে মানুষ সে নয়। বিকাশের জন্যে মনে উদ্বেগ জমাট বাঁধলেও আমি ব্যস্ত হলাম না। আবহের গভীরে যে নিরন্তর সংলাপে সকাল থেকে শেষ বিকেল পর্যন্ত আমি মগ্ন ছিলাম, তা আমাকে শান্ত রাখল। জল, মাটি, বাতাস ছুঁয়ে মহাসময় আর হারানো প্রিয়জনকে স্পর্শ করার যে ব্যাখ্যা বিকাশ আমাকে শুনিয়েছে, তা আমাকে সুস্থির রাখলেও কিছুদিন ধরে আড্ডায় বসে, হালকা চালে বলা বিকাশের কিছু কথা হঠাৎ আগুনের রেখার মতো আমার মনে জেগে গেল। বিকাশ এতো নিচু গলায় কথা যে আমার মনে দাগ কাটে না। একাধিকবার বললেও সামান্য কৌতূহলী করেনি আমাকে। বিকাশ বলেছিল,

সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে আমার সুনাম আছে। ব্যবসাতে ছল চাতুরি আমি কখনো করিনি। আজো করিনা।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলত, তবু সব মানুষই কিছু অপরাধ আড়াল করে রাখে। নিজের একটা অংশ গোপনে রেখে দেয়। হয়তো তা ঠিক অপরাধ নয়, মামুলি কিছু ভুলভ্রান্তি। আড়াল করে রাখা কৃতকর্ম, কারো চোখে অপরাধের চেয়েও বেশি মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, পাপ। গোপন কথাটা বেশির ভাগ মানুষ ভুলে যায়। দু'একজন বলার জন্যে হাঁসফাঁস করে। কাকে বলবে? ধর্মযাজকের সামনে খৃস্টানরা স্বীকারোক্তি করে। আমরা কোথায় যাবো? আমরা আসি গঙ্গার কাছে। স্বীকারোক্তির বদলে ঋণ শোধ করি। কবে যে আমার এই ঋণ শোধ হবে কে জানে?

কথাগুলো বিকাশ এক বৈঠকে বা একদিনে বলেনি। নানা সময়ে এমন কিছু কথা বলেছিল, যা জুড়লে এরকম এক বাচন তৈরি করা যেত। তার টুকরো কথা শুনে সম্পূর্ণ বাচন তৈরিতে আগ্রহ জাগেনি। বাচন তৈরির মতো গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো শুনিনি। নিছক কথা হিসেবে নিয়েছি। গঙ্গার ধারে মেঘলা বিকেলে দাঁড়িয়ে টের পেলাম, বিকাশের একটা গোপন কথা ছিল। চেপে রাখা কোনো অপরাধের স্বীকারোক্তি করতে চাইছিল সে। হয়তো সেটা বড়ো কোনো অপরাধ নয়, মামুলি ভুলভ্রান্তি। পাপ হতে পারে। আমাকে হয়তো শোনাতে চেয়েছিল সে। ভুল বুঝেছি। আমার বোধে যে খামতি থেকে গেছে, অনুভব করে আমি কুঁকড়ে গেলাম। বিকাশ কি শোনাতে চেয়েছিল, আমি জানিনা। গঙ্গার স্রোতে সে হয়তো তার গোপন কথাটা রেখে গেছে। লুকিয়ে রাখা কোনো ঘটনা গঙ্গাকে শোনাতে সে সম্ভবত প্রতি বছর তর্পণের নাম করে গঙ্গায় আসতো। আজই কি শেষ হলো তার স্বীকারোক্তি। স্বীকারোক্তি শেষ করে সে কি নিজের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে বাতাসে মিলিয়ে গেল?

এক জোড়া সাদা লঞ্চ জেটিতে এসে পরপর দাঁড়ালো। তিনজন পুলিশ অফিসার জেটির মাথায় পৌঁছে গেছে।

গঙ্গার ঘাটে একা দাঁড়িয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজলেও আমার মনে হলো, গায়ে জল লাগছে না। অক্ষয় এক মহীরুহের নিচে আমি দাঁড়িয়ে আছি। মহীরুহের একটা ডাল অথবা পাতা হয়ে গেছি। গাছের আর একটা পাতা বিকাশ। একসময়ে সোনালি আভা মাখানো একসময়ে সবুজ পাতাটা দেখতে পেলাম। গঙ্গার স্রোতে চোখ রাখলাম। দয়াময়ী, চন্দ্রনাথের মায়া, জড় অসাড় পৃথিবীর প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে। বিকাশের না বলা স্বীকারোক্তি শোনার জন্যেই তাকে খুঁজে বার করতে হবে। আমার গোপনীয়তা আত্মসাৎ করে সে আমাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আমাকে ঋণী করে রেখে গেছে। তার ঋণ শোধ করতে হবে আমাকে। দু ঠোঁট দিয়ে তার ক্ষতের জ্বালাযন্ত্রণা আমি শুষে নিতে চাই। আরাম দিতে চাই তাকে। তার সঙ্গে নিশ্চয় ফের দেখা হবে।

বাড়ির ফেরার জন্যে ইডেন গার্ডেন্সের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো আমি পা বাড়ালাম। বিকাশের সঙ্গে পথে কোথও দেখা হয়ে গেলে আমি অবাক হবো না।